ভারতের সাধক

গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড সম্বন্ধে অভিমত

যুগান্তর—বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের দাবী নিয়েই এসেছে। ...ভারত সাধনার বিরাট রূপের পরিচয় কেউ দিতে পারেন নি, বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই বিরাট কাজের ভূমিকা পত্তন করেছে।

আনন্দবাজার—সিদ্ধ যোগী-পুরুষদের কঠোর তপশ্চর্য্যা ও অলৌকিক যোগবিভূতির পরিচয় দান করিয়াছেন যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাহা লেখকের রচনাকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ...পাঠকচিত্ত আনন্দঘন রসসাগরে মুক্তিস্নান সারিয়া নেয়।

AMRITA BAZAR PATRIKA—Like some men, some books come to stay; they even outlive their authors. These volumes undoubtedly bear that stamp of greatness.

দেশ—ভারতের সাধক বাংলার চিন্তাশীল সমাজে লেখকের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় তিনি এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার মনীষায় তিনি সাধকগণের অনুভূতিকে রসোত্তীর্ণ রূপ দিয়াছেন।



ভারতের সাধক

১৩৭০ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার জয়ী মহান জীবনী গ্রন্থ

ভারতের সাধক

চতুর্থ খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়

প্রাচী পাবলিকেশনস

চতুর্থ সংস্করণ
১৯৬৮

প্রকাশনা

এইচ, রায় চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩ বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাকশাড়া
হাওড়া

পরিবেশনা

প্রাচী ৩, এবং ৪, হেয়ার স্ট্রীট, (তেতলা)
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট

সুপ্রকাশ সেন

মুদ্রণ

সুধীর কুমার দে
বাণীরেখা প্রিন্টার্স
৪৫/১বি/এইচ/৫, মুরারি পুকুর রোড,
কলিকাতা-৫৪

বাঁধাই

সেঞ্চুরী বাইণ্ডিং কোং
৪৫, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ আট টাকা

2536

প্রকাশকের নিবেদন

'ভারতের সাধক'-এর চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল। এই মহান গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডই বাংলার বিশিষ্ট সমালোচকদের ও সংবাদপত্র-সমূহের আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছে। পাঠকগণও তাঁদের সমর্থন দানে কার্পণ্য করেননি। বিভিন্ন খণ্ডে রচিত আর কোন বাংলা গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালে এমন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে বলে আমরা জানিনে।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণরস যুগিয়ে আসছেন আমাদের সাধকেরা—অধ্যাত্মজীবনের মহাশিল্পীরা। এঁদের ভেতর রয়েছেন যোগী, বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও মরমীয়া সাধকগোষ্ঠী, বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে যাঁরা গড়ে তুলেছেন মানব-ধর্ম্মের ঐকতান। এই সাধকদেরই পরম রম্য জীবনী গ্রন্থকার রচনা করেছেন, আর সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারত-সাধনার দুরবগাহ পরম তত্ত্ব। এই গ্রন্থের ভেতর দিয়ে তাই উদ্ঘাটিত হয়েছে ভারত ও ভারতবাসীর অপূর্ব্ব আত্মপরিচয়।

মনীষা, আত্মিক বিশ্লেষণ ও সাহিত্যিক প্রতিভার দীপ্তিতে এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা হ'য়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, লোকোত্তর মহাপুরুষেরা একের পর এক এসে ধরা দিয়েছেন আমাদের সম্মুখে। ফলে 'ভারতের সাধক' হয়ে উঠেছে অনন্যসাধারণ, আর বাংলা সাহিত্যের আসরে অধিকার করেছে স্থায়ী আসন।

—প্রকাশক

BHARATER SADHAK Vol. [IV]

by

Sankar Nath Roy

Price Rs. 8·00

পরম সুহৃদ্ ৺অমলেন্দু দাশগুপ্তের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

—শঙ্করনাথ

সূচীপত্র

গৌতম বুদ্ধ

প্রায় ছাব্বিশ শত বৎসর আগেকার কথা। ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনের সেদিন বড় দুর্দ্দিন। বেদ উপনিষদের পরম তত্ত্ব মানুষ প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে, জ্ঞান সাধনার ধারাটি ক্রমে হইয়া আসিয়াছে ক্ষীণতর। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আগেকার সে সমৃদ্ধি, সে মহিমা আর নাই, ধর্ম্মাচরণ হইয়া উঠিয়াছে বাহ্যিক অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব, একেবারে প্রাণহীন।

সমাজের দুই প্রান্তে দেখা যায় দুইটি বিপরীত দৃশ্য। উচ্চস্তরের মানুষ ভোগ লালসা নিয়া মত্ত. যাগযজ্ঞ ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া তাহারা ইহলোক ও স্বর্গলোকের সুখ সমৃদ্ধি খুঁজিয়া ফিরে। আর শিক্ষাদীক্ষাহীন নিম্নস্তরের মানুষ আত্মসমর্পণ করিয়া আছে ভয় ও কুসংস্কারের কাছে। দেশের সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত ব্যভিচার, লোভ ও হিংসা দ্বেষের কলুষ।

এই সঙ্কটের দিনে আত্মপ্রকাশ করে এক ধর্ম্মবিপ্লব, আর সেই বিপ্লবেরই তরঙ্গশীর্ষে আবির্ভূত হন মহামানব গৌতম বুদ্ধ।

মৈত্রী ও সম্বোধির পূর্ণকুম্ভহস্তে, মানবত্রাতারূপে জনচৈতন্যের সম্মুখে তিনি আসিয়া দাঁড়ান। যে ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের দুঃখ একদিন তাঁহাকে গৃহত্যাগী করে তাহারই দ্বারে আবার ভিক্ষাপাত্র হস্তে ফিরিয়া আসেন। সেদিনকার ধর্ম্মবিপ্লবের পুরোভাগে স্থাপন করেন তিনি নিজেকে, তাঁহার অপরূপ ব্যক্তিসত্তাকে।

সেদিন তাঁহার ত্যাগপূত জীবন, শুচিশুভ্র চরিত্র, দিব্যোজ্জ্বল রূপ আর অমোঘ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দেশব্যাপী এক ইন্দ্রজালের।

লক্ষ লক্ষ নরনারী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখে তাঁহার এই করুণাঘন মহাপ্রকাশ! পরিত্রাতারূপে তাহারা গ্রহণ করে প্রভু বুদ্ধকে।

জনজীবনের স্তরে স্তরে বুদ্ধ ছড়াইয়া দিয়া যান তাঁহার ভিক্ষুদল। ভিক্ষাজীবি কাষায়পরিহিত এ পরিকরগোষ্ঠী সমাজ-জীবনে জাগাইয়া তোলে ত্যাগদীপ্ত জীবনের মহিমা।

শুধু ভারতেরই দিগ্‌বিদিকে নয়, বিশ্বের দূর-দূরান্তরে তাহারা বহন করিয়া নেয় বুদ্ধের বাণী। তিব্বত-চীন-জাপান হইতে শুরু করিয়া সিংহল ব্রহ্ম-যবদ্বীপে প্রোথিত করে তাঁহার ধর্ম্মপতাকা। এই ঐতিহাসিক ধর্ম্মবিজয়ের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারত অর্জ্জন করে বিশ্বজয়ের গৌরব।

সর্ব্ব মানবের জন্য বুদ্ধ রাখিয়া যান তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান—তাঁহার ধর্ম্ম। অহিংসা, শুচিতা ও কামনাহীন সাধনার ধারা নূতন করিয়া তিনি বহাইয়া দেন। অষ্টাঙ্গ সাধনের মধ্য দিয়া যে নির্ব্বাণ, যে পরাশান্তি লাভ হয়, জনমানসের সম্মুখে তাহা তিনি তুলিয়া ধরেন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য সাধনা ও সিদ্ধির দ্বার করেন অর্গলমুক্ত।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম বেদের আনুগত্য একেবারেই স্বীকার করে নাই, ঈশ্বরের প্রসঙ্গে সাংখ্যবাদীর মত রহিয়াছে নীরব। তবুও এই বেদধৃত, ঈশ্বরমুখীন দেশের মানুষ করজোড়ে সেদিন দাঁড়াইয়াছে এই মহাপুরুষের নবতর ধর্ম্মদেসনার সম্মুখে।

বুদ্ধের ব্যক্তিসত্তা, তাঁহার সঙ্ঘ, তাঁহার ধর্ম্ম—এই ত্রয়ী অবদানের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার সার্থকতম রূপ। আর এই রূপেরই আলোকচ্ছটা তাঁহাকে করিয়াছে বিশ্ববন্দিত। তিনি কীর্ত্তিত হইয়াছেন মানবেতিহাসের অন্যতম ভাগ্যনিয়ন্তারূপে, এক যুগপুরুষরূপে।

হিমাচলের সানুদেশে, আধুনিক নেপালের দক্ষিণে ছিল কপিলবাস্তু নগর। শাক্যবংশের গৌতম গোত্রীয় ক্ষত্রিয়েরা এখানে বাস করিতেন। রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন ইঁহাদেরই গোষ্ঠীপতি।

শাক্যদের এই ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যটি বৈশালী রাজ্যের অধীন* হইলেও কার্য্যতঃ ছিল স্বাধীন। রাজ্যের আয়তন তেমন বড় নয়, অধিবাসীদের সংখ্যাও দশলক্ষের বেশী হইবে না। কিন্তু সুখ, শান্তি ও প্রাচুর্য্যের যেন এখানে সীমা নাই। শাল সেগুনের বনানী বেষ্টিত এই রাজ্যের সমতল ভূমি বড় উর্ব্বরা। তখনকার দিনে শস্য-শ্যামল কপিলবাস্তু রাজ্যের সমৃদ্ধি ছিল প্রতিবেশী অঞ্চলের ঈর্ষার বস্তু।

ধর্ম্মাত্মা ও ন্যায়বান বলিয়া রাজা শুদ্ধোদনের খ্যাতি ছিল, আর স্ববংশীয়দের মধ্যে তাঁহার মান মর্য্যাদাও ছিল অসামান্য। এই শুদ্ধোদনেরই পুত্ররূপে গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন।

৫৬৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা। শুদ্ধোদনের রাণী মায়া দেবী সেদিন সহচারীগণসহ লুম্বিনী কাননে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সঙ্গিনীদের নৃত্যে-গানে ও কলগুঞ্জনে আকাশ বাতাস মুখরিত। স্রোতস্বিনী রোহিণী কুলুকুলু নাদে সম্মুখ দিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, বৈশাখীপূর্ণিমার জ্যোৎস্না তাঁহার বুকেও বুঝি জাগাইয়া তুলিয়াছে পুলকোচ্ছ্বাস।

* আধুনিক গবেষণার ফলে নির্ণীত হইয়াছে, শুদ্ধোদনের খণ্ডরাজ্যটি ছিল সার্ব্বভৌম রাজা কোশলপতির অধীন। রাজা বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ একসময়ে নিজে বলিয়াছেন, "হে রাজন্, হিমবন্তের কাছে কোশলবাসী ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন এক জাতি রয়েছে, তাঁরা আদিত্য গোত্রীয় এবং শাক্য জাতীয়। ভোগ বাসনা ত্যাগ ক'রে আমি সেই কুল হ'তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি।" দীঘনিকায় সুত্ত, ৪২২-২৩। শাক্যের' যে কোশল রাজ্যের অধীন ছিলেন একথায় তাহা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া, বসিষ্ঠনামে এক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, "হে বসিষ্ঠ, শাক্যেরা রাজা প্রসেনজিৎ কোশলের অনুযুক্ত (অধীন)। তাঁরা রাজা প্রসেনজিৎ কোশলের অধীনতা স্বীকার করেন, তাঁকে অভিবাদন করেন, তাঁকে দেখে প্রত্যুত্থান করেন, করজোড়ে নমস্কার করেন এবং স্তুতি বন্দনাদি করেন।" দীঘ-নিকায়, অগ্‌গঞ্ঞ সুত্তন্ত (৮)।

রাণী ছিলেন অংন্তস্বত্বা। সেদিন এই পুর্ণিমারই রাতে শুভলগ্নে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন।

দিব্যকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর এই নবজাত শিশু। এ শিশুর আবির্ভাব সেদিন শুধু পুরনারীদের মধ্যেই নয়, সারা কপিলবাস্তুতে আনন্দের বান ডাকাইয়া তোলে।

শাক্য শুদ্ধোদন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল অন্তরে তাঁহার খেদ ছিল—তুই রাণী, মায়া ও মহাপ্রজাবতী কাহারো কোন সন্তান হয় নাই। এই পুত্র সন্তানের আগমনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। সর্ব্ব অভীষ্ট এবার তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, তাই নবজাত শিশুর নাম রাখা হইল, সিদ্ধার্থ। রাজকুমার গৌতম গোত্রজ, এজন্য উত্তরকালে গৌতম নামেও তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজার আদেশে মৌহুর্ত্তিকগণ লুম্বিনী উদ্যানে সমবেত হইলেন, নবজাতকের ভাগ্য তাঁহাদের নির্ণয় করিতে হইবে।

গণনার পর সকলে কহিলেন, "শাক্যকুলপতি, আপনার কুমার হবে এক অসামান্য পুরুষ। সংসারত্যাগের যোগ এর রয়েছে। যদি কখনো গৃহ ছেড়ে চলে যায়, তবে একে দেখা যাবে এক শক্তিমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ভূমিকায়। আর সংসারজীবনে আবদ্ধ থাকলে এ শিশু কীর্ত্তিত হবে রাজচক্রবর্ত্তীরূপে।"

আনন্দমুখর কপিলবাস্তুতে শীঘ্রই কিন্তু এক তুর্দ্দৈব নামিয়া আসিল। জননী মায়াদেবী সপ্তম দিবসে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

শোকার্ত্ত রাজা প্রমাদ গণিলেন। কে এই নবজাত শিশুকে পালন করিবে, কে-ই বা তাহার ভার গ্রহণ করিবে?

রাজমহিষী গৌতমী সেদিন সানন্দে আগাইয়া আসিলেন। শিশুকে কোলে তুলিয়া নিয়া কহিলেন, মহারাজ, আপনার কোন ভাবনা নেই। সিদ্ধার্থকে আজ থেকে আমিই লালন ক'রবো, আমিই আজ থেকে হবো তার মা।"

পিতার হৃদয় হইতে এক গুরুভার নামিয়া গেল। বিমাতার আন্তরিক স্নেহে ও যত্নে সিদ্ধার্থ মানুষ হইতে লাগিলেন।

শিশুকে কোলে করিয়া শুদ্ধোদন সেদিন রাজপুরীতে বসিয়া আছেন। এমন সময় জটাজুটসমন্বিত এক সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। হিমালয়ের এক নির্জ্জন গুহায় ইনি তপস্যারত থাকেন। অসিতমুনি বলিয়া সবাই ইঁহাকে জানে, শক্তিধর যোগী বলিয়াও জন সমাজে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি।

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সসম্মানে রাজা মুনিবরকে নিকটে বসাইলেন। মুনি কিন্তু তাঁহার আগমনের পর হইতেই সিদ্ধার্থের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। একি অপরূপ শিশু তাঁহার নয়ন সমক্ষে? এমন দিব্য লক্ষণ তো মানবদেহে বেশী দেখা যায়না! নীরব নিশ্চল সন্ন্যাসীর কপোল বাহিয়া কেবল ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আপনি সত্যই বড় ভাগ্যবান। আপনার এই পুত্রের দেহে রয়েছে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের দুর্লভ লক্ষণ। বিরাট ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন ক'রে উত্তরকালে এ চিরস্মরণীয় হবে।"

অসিতমুনি প্রাসাদ হইতে বিদায় নিলেন। কিন্তু একি ভবিষ্যৎ-বাণী মহাপুরুষ আজ রাজা শুদ্ধোদনকে শুনাইয়া গেলেন? তাঁহার সিদ্ধার্থ, তাঁহার নয়নের মণি, তবে কি একদিন সত্য সত্যই ঘর সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? শিশুকে বুকের ভিতর তিনি চাপিয়া ধরেন, অজানা শঙ্কায় হৃদয় বারবার কাঁপিয়া উঠিতে থাকে।

কুমারের শিক্ষার ভার পড়ে অভিজ্ঞ আচার্য্য বিশ্বামিত্রের উপর। পাঠকার্য্য চলিতে থাকে আর অদ্ভুত দ্রুততার সহিত বহুতর বিদ্যা এ বালককে আয়ত্ত করিতে ও তাহার প্রতিভা ও মেধা দেখিয়া আচার্যের বিস্ময়ের সীমা থাকেনা।

কিশোর সিদ্ধার্থ কিন্তু আর পাঁচজনের মত মোটেই নন। আপন ঔদাসীন্যের আড়ালে এক স্বতন্ত্র গণ্ডি তিনি গড়িয়া নিতে চান, রাজপুরীর আমোদপ্রমোদ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলে খুসী হন। রাজ সংসারের এ পরিবেশের সহিত জীবনের সুরটি তিনি মিলাইতে পারিতেছেন না?

এ ক্ষাত্রধর্ম্মী পরিবারে সিদ্ধার্থ যেন এক ব্যতিক্রম। ভাবুকতা আর কোমলতায় ভরা তাঁহার বুক। মানুষের দুঃখে, যে কোন বন্য পশু-পাখীরও দুঃখে, এ বুক যেন সমবেদনায় ও করুণায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

সেদিন একলাটি তিনি উপবনে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া পতিত হয় এক শরবিদ্ধ পাখী। অসহায়ভাবে কতক্ষণ ডানা ঝাপটাইয়া পাখীটা নিঃসাড় হইয়া পড়িল। আহত স্থান হইতে কেবলি রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

কুমারের হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। আহা! কে এই অসহায় জীবটিকে এমন নির্ম্মমভাবে বাণবিদ্ধ করিয়াছে? ছুটিয়া গিয়া তখনি এটিকে বুকে তুলিয়া নিলেন, সতর্ক হস্তে বিদ্ধ বাণটি উৎপাটিত করিলেন। ঝরণার জলের ধারায় রক্তপাত বন্ধ হইল, ক্ষত স্থানে মাখাইয়া দেওয়া হইল স্নিগ্ধ প্রলেপ।

পাখীটি এবার চোখ মেলিয়া চাহিল। সিদ্ধার্থের চোখে-মুখে তাই তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাক্ আর ভয় নাই, দুর্ভাগা জীবটি তবে বাঁচিয়া উঠিবে।

এমন সময় মূর্ত্তিমান ছন্দপতনের মত তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী দেবদত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পাখীটি তাহার শরে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে, তাই এটির উপর দাবী যে তাহারই। কিন্তু সিদ্ধার্থ প্রাণ থাকিতে এ পাখী ছাড়িতে রাজী নন। কেনই বা ছাড়িবেন? এ জীবটিকে যে তিনিই বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন।

দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন, "না দেবদত্ত, এ পাখী তোমায় দেওয়া

হবেনা। তাছাড়া, সত্যি ক'রে তুমি বলতো, এর ওপর প্রকৃত অধিকার কার? যে শরাঘাতে প্রাণনাশ করে তার, না যে বুকে তুলে নিয়ে বাঁচায় তার?"

দেবদত্ত যেমনি দুর্দ্দান্ত, তেমনি উদ্ধত। সে কিছুতেই তাহার দাবী ছাড়িয়া দিবেনা।

ন্যায়তঃ এ পাখীর উপর অধিকার কাহার তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাই বিচারের জন্য উভয়ে সেদিন রাজপুরোহিতের কাছে গিয়া উপস্থিত হন।

বলাবাহুল্য, প্রাণদাতার দাবীই সেদিন জয়যুক্ত হইয়াছিল।

কপিলাবস্তুতে সেদিন হল-কর্ষণ উৎসব চলিতেছে। ধান্যের প্রাচুর্য্যই শাক্যদের যত কিছু সমৃদ্ধির মূলে। গোষ্ঠীপতি শুদ্ধোদনের নামে যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাহাও এ শস্যের সহিতই যুক্ত—শুদ্ধ ওদন বা পবিত্র ধান্য তিনি গ্রহণ করেন তাই তাঁহার নাম শুদ্ধোদন। এ হলোৎসবের দিনে শাক্যবংশীয়েরা সবাই শস্যক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

রাজা শুদ্ধোদন স্বয়ং হল চালনা করিয়া অনুষ্ঠান শুরু করিলেন। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সকলে পান ভোজন ও আনন্দ রঙ্গে মত্ত। কিন্তু এ সময়ে কুমার সিদ্ধার্থ কোথায়? উৎসব-ক্ষেত্রে তো তাঁহাকে দেখা যাইতেছেনা!

অনেক খোঁজাখুজির পর কুমারকে কোনমতে আবিষ্কার করা গেল। নিকটেই এক গভীর অরণ্য, ইহারই এক প্রান্তে ধ্যানতন্ময় হইয়া তিনি বসিয়া আছেন।

উৎসবের ভীড় এড়াইয়া আসিয়া এক জামগাছের নীচে ভাবুক কিশোর বসিয়া পড়েন। তারপর কোন্ সময়ে মন তাঁহার চিন্ময় লোকের দিকে উধাও হইয়া গিয়াছে, কোন হুঁস নাই। সকলের ডাকো-ডাকির ফলে এবার ধ্যানাবস্থা টুটিয়া যায়, বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে।

কিন্তু একি পরম আশ্চর্য্য কাণ্ড! যে বৃক্ষটির নীচে বসিয়া কুমার ধ্যানাবিষ্ট তাহার ছায়া তাঁহার ধ্যানস্থ দেহ ছাড়িয়া দূরে অপসৃত হইতেছে না। সবিস্ময়ে অমাত্যেরা বলাবলি করিতে থাকেন—

“ব্যাবৃত্তে তিমিরনুদস্য মণ্ডলেঽপি
ব্যোমাভং শুভবরাগ্রলক্ষণধরম্।
ধ্যায়ন্তং গিরিমিব নিশ্চলং নরেন্দ্রপুত্রং
সিদ্ধার্থ ন জহাতি সৈব বৃক্ষচ্ছায়া॥

(ললিতবিস্তর—১১ অ)

অর্থাৎ, তোমরা কি দেখ্‌ছো বলতো? নরেন্দ্রপুত্র সিদ্ধার্থ অচল অটল ও ধ্যানস্থ হয়ে এখানে বসে আছেন। সূর্য্য অস্তমিত হলে আকাশের যে শোভা হয়, এঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েছে সেই শোভা, সেই জ্যোতি। পরম শুভ লক্ষণ ছড়ানো এঁর সর্ব্ব দেহে। আর দেখেছো? এত বেলা হয়েছে কিন্তু বৃক্ষের ছায়া এখনো এঁর দেহ পরিত্যাগ ক'রে দূরে সরে যায়নি, রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

সিদ্ধার্থের কিশোর জীবনের বাতায়নপথে এমনি করিয়া এক একদিন ঝলকিয়া উঠে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়-লোকের আলোকচ্ছটা। মর্ম্মতলে কাহার হাতছানিটি হঠাৎ জাগিয়া উঠে—আর উদগত হয় জন্মজন্মান্তরের অধ্যাত্ম-সংস্কার।

কুমার এবার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু সব কিছুই তাঁহার যে খাপছাড়া! প্রাসাদের আনন্দ উৎসব তিনি এড়াইয়া চলেন, নিজেকে ডুবাইয়া রাখেন আপন সত্তার গভীরে। সংসার-বিতৃষ্ণা তাঁহার দিন দিন কেবলি বাড়িয়া চলে।

অন্তরাত্মার তলদেশ হইতে মঝে মাঝে কাহার অস্ফুট সঙ্কেত এক এক সময় ভাসিয়া উঠে। বৈরাগ্যের দমকা হাওয়া তাঁহাকে করিয়া তোলে উন্মন, অধীর।

রাজবৈভব ও বিলাস ব্যসনের কোথাও তিনি তৃপ্তি খুঁজিয়া

পাননা। চারি দকে কেবলি চোখে পড়ে দুঃখ শোকের কালো ছায়া আর জটিল মোহ-বন্ধনের জাল!

শুদ্ধোদন শঙ্কিত ও চিন্তাকুল হইয়া উঠেন। পুত্রের একি অদ্ভুত মনোভাব! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, তাহার জন্মের পর জ্যোতিষীদের গণনার কথা, আর মহাত্মা অসিতমুনির ভবিষ্যৎ-বাণী।

অগৌণে এ উদাসীন তরুণকে সংসারে জড়াইয়া না ফেলিলে বিপদ এড়ানো যাইবে না। শুদ্ধোদন পুত্রকে তাই জানাইয়া দিলেন, এবার তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

বিষয়বিরক্ত কুমারের মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠে। ঐহিক জীবনের ভোগে, কামনার চরিতার্থতার মধ্যে কোথায় সে পরম শান্তি যাহার জন্য চিত্ত তাঁহার চির-উন্মুখ? সে শান্তির সন্ধানে না গিয়া কেন এই মিথ্যা মায়ার বন্ধন তিনি অঙ্গীকার করিবেন?

আবার ভাবিতে বসেন, 'কমল তো পঙ্কেই বেড়ে ওঠে। রসে রঙে ভরে তোলে সে নিজেকে। জলের ওপর ছড়িয়ে পড়ে তার দলের পর দল, আর মানুষ তৃপ্ত হয় তার সৌরভে, সৌন্দর্যে। তেমনি সংসারপঙ্কে থেকে যদি বোধিসত্ত্ব হতে পারি, তবে সমাজ পরিবেশে থেকেই তো মানুষকে টেনে আনা যায় অমৃতের পথে। পূর্ব্বগামী সাধকের দল তো নিজেদের জীবনে এ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। ভার্য্যা, পুত্র কন্যা নিয়ে সংসারে তাঁরা বাস ক'রে গিয়েছেন অথচ আসক্তি কখনো তাঁদের আসেনি, পথভ্রষ্ট তাঁরা হন নি। তাঁদের অনুসরণ ক'রে ভার্যা গ্রহণই আমি ক'রবো। তা'হলে পিতা তুষ্ট হবেন, সংসারের কল্যাণও কিছুটা হয়তো ক'রতে সক্ষম হবো।'

(ললিত বিস্তর—১২ অ)

সিদ্ধার্থ বিবাহে রাজী হইলেন, মনোমত পাত্রী জুটিতেও দেরী হইলনা। কোল বংশীয় বিশিষ্ট নাগরিক দণ্ডপাণির কন্যা যশোধরা পরম সুলক্ষণা, পরম রূপলাবণ্যবতী। এ কন্যারত্নকে পরম সমাদরে বরণ করিয়া বধূরূপে ঘরে আনা হইল।

এই বিবাহের আনন্দস্মৃতি কপিলবাস্তুর নরনারী দীর্ঘদিন ভুলিতে পারে নাই।

রূপলাবণ্যের দিক দিয়া যশোধরা শাক্যরমণীদের মধ্যে অতুলনীয়া, সর্ব্বগুণের আধার। পতি সিদ্ধার্থের জীবনে প্রেমের প্রস্রবণ তিনি বহাইয়া দিলেন।

দাম্পত্য জীবনের আনন্দ, রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য ও বিলাস ব্যসনের মধ্যদিয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল।

উত্তরজীবনে বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষু শিষ্যদের কাছে এ সময়কার স্মৃতিকথা বর্ণনা করিতেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার নানা উল্লেখ রহিয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ, ছোট বেলায় আমি পরম সুকুমার ছিলাম। আমার জন্য পিতৃগৃহে বহু সরোবর খনিত হয়েছিল। নানা রকমের পদ্মে সুশোভিত ছিল এসব সরোবরের জল, আর এসব পুষ্প সযত্নে ফোটানো হ'তো আমারই জন্য।

হে ভিক্ষুগণ, কাশীর চন্দন ছাড়া আর কোন চন্দন আমি ব্যবহার করতুম না। আমার বেষ্টন, কঞ্চুক, নিবাসক, উত্তরসঙ্গ প্রভৃতি সব কিছু বিলাসবস্ত্র ছিল কাশীরই তৈরী। শীত বা গ্রীষ্ম, ধূলা বা তৃণ বা হিম কিছুই আমাকে স্পর্শ ক'রতে পারতো না।"

হে ভিক্ষুগণ, আমার জন্য এ সময়ে তৈরী হয়েছিল তিনটি হর্ম্ম্য—একটি হেমন্তের, একটি গ্রীষ্মের আর একটি বর্ষার। হে ভিক্ষুগণ, বর্ষা-প্রাসাদে বর্ষাঋতুর চারমাস তূর্য্যবাদিনী তরুণীরা আমায় বেষ্টন ক'রে থাকতো। তখন আর আমি প্রাসাদ থেকে নীচে নেমে আসতাম না। অপর লোকদের গৃহে যখন ভৃত্যদের সাধারণতঃ বিড়ঙ্গ মিশ্রিত কণাজক (অর্থাৎ খুদের ভাত) দেওয়া হ'ত তখন আমার পিতার গৃহে দাসদাসীরা সানন্দে ভোজন ক'রতো শালিমাংসোদন (অর্থাৎ, মাংস মিশ্রিত শালি ধান্যের অন্ন)।"

—অঙ্গুত্তর-নিকায়, দেবদূতবগ্‌গ, ৩।৩৮।১, মঝ্‌ঝিম্‌ ৭৫।

কিন্তু সংসার জীবনের এ প্রচুর্য্য, ভোগ বিলাসের এত কিছু

উপকরণ সিদ্ধার্থের কাছে হইয়া উঠে তুচ্ছ, নিরর্থক। অন্তরসত্তায় বারবার আসে চিন্তার তরঙ্গাভিঘাত। এ যৌবন, এ ধনমানের গৌরব তো শুধু দু'দিনের জন্য। চিরন্তন শান্তি তো কখনো ইহার মধ্য দিয়া আসিবে না!

প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যের ধারাটি মাঝে মাঝে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, জাগিয়া উঠে জন্মান্তরের সাত্ত্বিক ধৃতি।

দিনের পর দিন সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করিয়াছেন মনুষ্য শরীরের পরিণাম। জরা, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি ও মৃত্যুর আঘাত জীবন-পাত্রকে গুঁড়াইয়া ফেলে নির্ম্মমভাবে। তাহা হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? এ দুঃখ এ অশান্তি মোচনের উপায় কি? কোথায় জীবনের অমৃত-পথ?

তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তিনি দেখিতে পান আলোক-সঙ্কেত, পরম পথের সন্ধান দেখা দেয়। এ সময়কার মানসিক অবস্থা নিজমুখেই তিনি বলিয়াছেন, "জাতি ধর্ম্মের (অর্থাৎ জন্মাদির) অধীন হয়ে যখন জাতিধর্ম্মের দুর্গতি বুঝতে পারছি তখন অজাত অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে খুঁজতে হবে। জরাধর্ম্মের অধীন হয়ে যখন জরাধর্ম্মের পরিণাম বুঝতে পারছি, তখন অজর অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে লাভ ক'রতে হবে। ব্যাধি ধর্ম্মের অধীন হয়ে যখন ব্যাধি ধর্ম্মের ক্লেশ বুঝতে পারছি তখন অ-ব্যাধি অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে সন্ধান ক'রতে হবে। যখন মরণধর্ম্মের অধীন হয়ে মরণ-ধর্ম্মের পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, তখন অমৃত অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে সন্ধান করতে হবে। যখন মরণধর্ম্মের অধীন হয়ে মরণধর্ম্মের পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, তখন অমৃত অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে অন্বেষণ ক'রতে হবে।"—মঝ ঝিম্-নিকায়, অরিয় পরিয়েসনা সুত্ত।

এ চিত্ত-ভাবনা শুধু জাগরণেই নয়, নিদ্রায়ও তরঙ্গিত হয়। গভীর রাত্রিতে নিদ্রা টুটিয়া যায়, শয্যায় জাগিয়া উঠিয়া বসেন। কাণে ভাসিয়া আসে দূরশ্রুত অস্ফুট আহ্বান। অতীন্দ্রিয় লোকের পর্দা সরাইয়া কে যেন হাতছানি দিয়া চকিতে আবার সরিয়া পড়ে।

দাম্পত্যজীবনের তখন দশম বৎসর। এসময়ে একদিন ভূমিষ্ঠ হয় তাঁহার পুত্রসন্তান —রাহুল। রাজঅন্তঃপুরে, আর সারা কপিলবাস্তুতে তাই আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল।

সিদ্ধার্থের মনে কিন্তু স্বস্তি নাই। জীবনের বৃহত্তম প্রশ্নের আজ তিনি সম্মুখীন। ত্যাগ বৈরাগ্যের যে আহ্বান অন্তরের অন্তস্থলে বারবার আসিয়া পৌঁছিতেছে এবার তাহা হইয়া উঠিতেছে স্পষ্টতর। নবজাত পুত্র নূতনতর এক বন্ধন রূপে তাঁহার জীবনে উপস্থিত। এ বন্ধন মানিয়া নিলে মুক্তির সন্ধানে কি করিয়া বাহির হইবেন ?

স্থির করিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। জরা-ব্যাধি মৃত্যুর ওপারে রহিয়াছে যে পরম অমৃতের পথ তাহারই আবিষ্কারে তিনি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যদি এ অভিযান তাঁহার সার্থক হয়, অমৃত ও নির্ব্বাণ অধিগত হয় তবে সেই অর্জ্জিত পরম ধনকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবেন বিশ্বমানবের কল্যাণে।

সহজাত সরল্য ও সত্যের ধৃতি নিয়া সিদ্ধার্থ জন্মিয়াছেন, তাই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পটি লুকানো সেদিন তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই*। নিরালায় বসিয়া পত্নিকে সেদিন মনের কথা বলিলেন।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ? প্রাণপ্রিয় পতির বিহনে কি করিয়া যশোধারা বাঁচিবেন ? তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া নামিয়া আসিল কান্নার বন্যা।

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে সিদ্ধার্থের যে বৈরাগী মনটি মুক্তি-উন্মুখ

---

* বুদ্ধ কাহাকেও জানাইয়া গোপনে কপিলবাস্তুর রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন এ কাহিনীর ভিত্তি নাই। মঝঝিম-নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ভিক্ষু-শিষ্যদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন, "মাতাপিতা যদিও বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁরা অশ্রুসিক্ত হয়ে ক্রন্দন ক'রছিলেন, তবুও আমি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন ক'রে, কষায় বস্ত্রদ্বারা দেহ আচ্ছাদন ক'রে গৃহত্যাগ ক'রে অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন ক'রেছিলাম।"

হইয়া রহিয়াছে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর চোখে তাহা এড়ায় নাই। যে সন্দেহ তাঁহার জাগিয়াছিল, আজ কি তাহা সত্য হইতে চলিল ?

নিজ সঙ্কল্পের কথা পিতাকে নিবেদন করিতেও সিদ্ধার্থ সেদিন পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ললিতবিস্তর গ্রন্থে ইহার এক মর্ম্মস্পৃর্শী বিবরণ রহিয়াছে। কুমারের মতিগতির কথা শুদ্ধোদনের জানা আছে। তাই সংসার বন্ধনে তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে তিনি এতকাল চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আজ বুঝিলেন, ভাগ্য সত্যই বিরূপ।

অশ্রুসজল চোখে পুত্রের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ রাজা কহিলেন, "বৎস, ধনজনপূর্ণ আমার এ সংসারে দুঃখ ব'লে কিছু নেই। আর তোমার আনন্দ বিধানের জন্য কোন চেষ্টারই আমি ত্রুটি এ যাবৎ করিনি। তবে কেন তুমি এমন ক'রে আমার হৃদয় ভেঙে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছো। বলো, তুমি আর কি চাও, তাই আমি তোমায় দেব।"

প্রশান্তকণ্ঠে, করজোড়ে সিদ্ধার্থ কহিলেন, "বাবা, মানুষের দুঃখ আর অশান্তি আমার জীবনে এনে দিয়েছে নির্ব্বেদ। সে দুঃখ মোচন ক'রবো, এই আমার ব্রত। আপনি কি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে অতিক্রম করার পথ আমায় বলে দিতে পারেন ? যদি পারেন, আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে আজীবন আমি কপিলবাস্তুতে বাস ক'রবো।"

বুঝা গেল, পুত্রের গতিরোধ করা আর সম্ভব নয়। অঝোর ধারে শুদ্ধোদনের দুই নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ নিবেদন করিলেন, "বাবা, তা যদি না পারেন, তবে আমায় গৃহত্যাগে বাধা দেবেন না। আজ আপনি বর দিন, মানবের দুঃখ যেন আপনার পুত্র ঘোচাতে সক্ষম হয়।"

বহু চেষ্টায়ও কুমারকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। কাতর অনুনয়ে বাধ্য হইয়া পিতাকে সেদিন তাঁহার অভীষ্ট লাভের জন্য আশীর্ব্বাণী জানাইতে হইয়াছিল।

গৃহত্যাগ করা স্থির হইয়াছে। তাছাড়া, আত্মপরিজনদের একথা

জানানোও হইয়াছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনটির কথা সিদ্ধার্থ গোপন করিয়া রাখিলেন। কারণ, বিদায়ক্ষণের শোকাশ্রু আর মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদের দৃশ্যটি তিনি এড়াইতে চান।

নীরব নিশীথ রাত্রি। সারা আকাশ ভুবন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-চাঁদের আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। উৎসব-আনন্দের শেষে রাজ-প্রাসাদ যেন ঘুমন্ত। সংসার ত্যাগের পরম লগ্নটি আজ উপস্থিত, আর তো বিলম্ব করা যায় না। সিদ্ধার্থ জাগিয়াই ছিলেন, এবার পত্নীর পালঙ্কের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলেন।

প্রেয়সী যশোধরা নিদ্রিতা। বুকের কাছে তাঁহার শায়িত নবজাত পুত্র রাহুল। বাতায়ন পথে চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশের জ্যোৎস্নার সাথে ধরণীর সৌন্দর্য্যের মাখামাখি। কিন্তু সিদ্ধার্থের যে আর সময় নাই! এবার মর্ত্ত্যের মোহ চিরতরে ছাড়ার পালা। যাওয়ার আগে শুধু একটিবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে চান।

যশোধরার শুভ্র সুডৌল বাহুটি শিশুর মুখের একাংশ আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন, অতি সন্তর্পণে বাহুটি এক-পাশে সরাইয়া রাখিয়া রাহুলকে শেষবারের মত ভাল করিয়া একবার দেখিয়া নিবেন। কিন্তু ভয় হইল, স্ত্রী যদি হঠাৎ জাগিয়া উঠে? মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

বিশ্বস্ত ভৃত্য ছন্দককে আগেই বলা ছিল, পূর্ব্ব সঙ্কেত মত প্রিয় অশ্ব কণ্টককে সে সজ্জিত করিয়া আনিল। সিদ্ধার্থ চিরতরে কপিলবাস্তু ত্যাগ করিলেন।

সারারাত্রি চলিয়া উভয়ে অনোমা নদীর তীরে উপনীত হইয়াছেন। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজকের বেশে, চির অজানার পথে এইবার সিদ্ধার্থের অভিযাত্রা শুরু হইবে।

অনুপ্রিয় নামক স্থান হইতে ছন্দককে তিনি বিদায় দিলেন। প্রিয় ভৃত্যের অশ্রুজলে এখানকার ভূমি সিক্ত হইয়া উঠে, শোকাকুল

চিত্তে সে কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া আসে। আজিও ঐ অশ্রুধৌত স্থান বৌদ্ধ শাস্ত্রে ছন্দক-নিবর্ত্তন নামে চিহ্নিত হইয়া আছে।

সিদ্ধার্থের লক্ষ্য আপাততঃ বৈশালী। লিচ্ছবী ক্ষত্রিয়দের শাসিত এই নগরীর সমৃদ্ধির খ্যাতি তখন চারিদিকে। ধর্ম্মপ্রচার বা জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা, সব কিছুরই প্রধান কেন্দ্র তখন এই নগরী সকল ধর্ম্মাচার্য্য ও দার্শনিককেই এখানে আনাগোনা করিতে হয় সিদ্ধার্থ প্রথমে এখানেই উপস্থিত হইলেন।

কালাম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আচার্য্য আলাড় বৈশালীর এক বিশিষ্ট ধর্ম্মনেতা। শত শত শিষ্য পরিবৃত এই প্রবীণ সাধকের তখন খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা নাই।

কিছুদিন ইঁহার নিকট থাকিয়া সিদ্ধার্থ সাধন প্রণালী শিক্ষা করিতে থাকেন। ধ্যানের প্রক্রিয়াগুলি একে একে আয়ত্তও হইল। কিন্তু মুমুক্ষু জীবনের তীব্র পিপাসা নিবারিত হয় কই? কোথায় সেই পরম মুক্তির পথ যে জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে তাঁহার বাধে নাই? বুঝিলেন, এখানে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাই আচার্য্য আলাড়ের কাছে বিদায় নিয়া মগধের পথে তিনি পা বাড়াইলেন।

রাজগৃহ তখন নৃপতি বিম্বিসারের রাজধানী। এ মহানগরীর উপকণ্ঠে, পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায় সিদ্ধার্থ তাঁহার সাধনা আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে নগরে আসিতে হয়, দিব্যকান্তি তরুণ শ্রমণকে দেখিয়া রাজপথে ভীড় জমিয়া উঠে।

সেদিন সম্রাট বিম্বিসার ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ চোখের পড়িল সিদ্ধার্থের দেবদুর্লভ রূপ। কনকোজ্জ্বল দেহের বর্ণ, দীর্ঘায়ত তনু, সুবিস্তৃত বক্ষতল। কুঞ্চিত কেশদামে তৈল নিষিক্ত হয় না, তবুও কি অপরূপ শোভা। যুগ্ম ভুরু আর আয়ত নয়নে রহিয়াছে অদ্ভুত আকর্ষণ, সম্রাট চমকিয়া উঠিলেন। কে এ তেজঃপুঞ্জ কলেবর নবীন সন্ন্যাসী? সমাদরের সহিত তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন।

কহিলেন, "ভদন্ত, এই সুকুমার দেহে কেন কঠোর সন্ন্যাসের ব্রত আর কৃচ্ছ্র সাধন আপনি নিয়েছেন? দয়া ক'রে আসুন, আচার্য্যরূপে আমার প্রাসাদে বাস করুন। সেখানে থেকে আপনার সাধনভজন চলতে পারবে, আমরাও সেবা-পরিচর্য্যার সুযোগ পাবো।"

সিদ্ধার্থ স্মিত হাস্যে উত্তর দিলেন, "সম্রাট, যে পরম বস্তু পাবার জন্য রাজ্য ও ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছি, তা লাভ না করা অবধি কি ক'রে নিরস্ত হই? তবে আপনার এ স্নেহপূর্ণ আহ্বান আমি বিস্মৃত হবো না। আমার মনে হচ্ছে, নির্ব্বাণ লাভের পর আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।"

সাধন জীবনে সিদ্ধার্থের ধ্যানপরতা ছিল অসামান্য। এক একদিন কি গভীর ধ্যানে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন, মহাপরিনিব্বান সুত্তে তাহার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

বুদ্ধ তখন আতুমা নগরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন ধ্যানাবিষ্ট থাকার সময় অনেক কিছু সেখানে সংঘটিত হয়। কিন্তু সেদিকে তাঁহার কোন হুঁসই নাই। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া দেখিলেন, তাঁহার চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভীড়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন—

"এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলাম, 'এখানে এমন জনতা কেন?'

"লোকটি উত্তর দিল, 'কিছুক্ষণ আগে প্রবল বারি বর্ষণ হয়েছে, বজ্রপাতও কম হয়নি। এর ফলে এই খামারের দুইটি কৃষক ভ্রাতা ও চারটি বলদ বিনষ্ট হয়েছে। এদের দেখবার জন্য লোক জমেছে, তাই এখানে এত লোক।'

"সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, 'হে ভদন্ত, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

"উত্তরে বললাম, 'হে আয়ুষ্মান, আমি এসব কিছুই দেখতে পাইনি।'

"আপনি কি সুপ্ত ছিলেন?'

"না, আমি তো সুপ্ত ছিলাম না।"

"আপনার সংজ্ঞা ছিল তো?"

"হাঁ, আমার সংজ্ঞা ঠিকই ছিল।"

"হে ভদন্ত, তা'হলে আপনি সংজ্ঞাবান ও জাগ্রত ছিলেন, অথচ এই প্রবল বারিধারা, বজ্রপাত, মানুষ ও বলীবর্দের মৃত্যু, কোন কিছুই আপনি দেখেননি, শোনেনওনি!"

"হে আয়ুষ্মান, তুমি ঠিকই বলেছো।"

শক্তিমান আচার্য রুদ্রকের খ্যাতি তখন চারিদিকে। নানা তীর্থ ও জনপদ ভ্রমণ করিয়া এ সময়ে তিনি রাজগৃহে আগমন করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ শ্রদ্ধাভরে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

অপূর্ব্বদর্শন এই নবীন শিক্ষার্থী। আচার্য্য নির্ণিমেষে তাঁহার দিব্যকান্তির দিকে চাহিয়া থাকেন। বুঝিতে দেরী হয় না, এই মুক্ত-কামী সাধকের জীবনে যুক্ত হইয়াছে সুদৃঢ় সঙ্কল্প আর তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্য। চরম লক্ষ্যে না পৌঁছিয়া সে ছাড়িবে না। অকৃপণভাবে তিনি তাঁহাকে শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের নির্দ্দেশ দান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গৌতমের উদ্দেশ্য তো এ পথে সিদ্ধ হইতেছে না! নির্ব্বাণের যে পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি পথে বাহির হইয়াছেন, দুষ্কর তপস্যা করিয়া চলিয়াছেন, আজও তাহার সন্ধান মিলে নাই। রুদ্রকের আশ্রয়ও অবশেষে তিনি ত্যাগ করিলেন।

এবার পাণ্ডব পাহাড়ের নিভৃত কন্দরে চলে কঠোরতর তপশ্চর্য্যা। সিদ্ধিলাভের পরম আগ্রহে তাঁহার সমগ্র সত্তা একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। একনিষ্ঠ সাধনা ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আপন গতিবেগে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

আচার্য রুদ্রকের পাঁচটি শিষ্য এই সময়ে সিদ্ধার্থের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সবিস্ময়ে তাঁহারা লক্ষ্য করেন, নবীন শিক্ষার্থী বেশীদিন হয় আসেন নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে রুদ্রকের শিক্ষা ও

সাধন আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রতিভাধর সাধক ইহাতেও তৃপ্ত নন, অপূর্ব্ব আত্মপ্রত্যয় নিয়া নিজেই এবার সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক অজানা আকর্ষণে ইঁহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর তপস্যার জন্য সিদ্ধার্থ গয়া অঞ্চলে উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি অনুগামী সাধক। পবিত্র নৈরঞ্জনার তটে নিভৃত উরুবিল্ব বন, অপূর্ব্ব প্রশান্তি সেখানকার আকাশে-বাতাসে বিরাজিত। সঙ্গীগণসহ মুমুক্ষু সাধক এখানে আসন পাতিলেন। সম্বোধিলাভের পথে এবার চলিল তাঁহার চরম প্রয়াস।

কিছুদিন যাবৎ কেবলই তিনি ভাবিতেছেন, 'শুক্‌নো কাঠের ঘর্ষণ ছাড়া তো আগুন কখনো জ্বলে না। তবে কৃচ্ছ্রসাধন ও শরীর নিগ্রহের মধ্য দিয়ে এই দেহকে শুদ্ধ না ক'রলে তো উপায় নেই? এ ধরণের সাধন ছাড়া দেহভাণ্ডে জ্ঞানাগ্নি কি ক'রে জ্বলে উঠবে?

বৈরাগ্যবান সাধক এবার হইতে তাই কৃচ্ছ্রসাধনের পথই বাছিয়া নিলেন।

তীব্র সাধনার মধ্য দিয়া প্রায় ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইল। শীত গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা তাঁহার অনাবৃত দেহের উপর দিয়া চলিয়া যায়। অর্দ্ধাশন ও অনশনে দেহ অস্থিচর্ম্মসার ও বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। গোচারণরত বালকেরা তাঁহাকে মনে করে এক অদ্ভুত বনচর জীব। দূর হইতে তাঁহার দেহ লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে ইটপাথর নিক্ষেপ করিতেও তাহারা ছাড়ে না।

এ সময়কার তপস্যাজীবনের কথা উল্লেখ করিয়া উত্তরকালে বুদ্ধ শিষ্যদের কহিতেন, "এ সময়ে আমি অতি অল্পই আহার করতাম। শেষের দিকে সারা দিনে একটি মাত্র বদরি বা কিছুটা তিল বা তণ্ডুল মুখে দিতাম। ক্রমে শরীর এমন শুষ্ক হয়ে গেল যে, আমার বসবার স্থানে উটের পদচিহ্নের মত ছাপ দেখা যেতো। চক্ষু দু'টি তখন এমন কোটরগত যে, কূপের তলদেশস্থ জলের সঙ্গে তাদের তুলনা চলতো।

উদর স্পর্শ করলে মেরুদণ্ড হাতে ঠেক্‌তো, শরীরে হাত দিলে দেখা যেত—রোম ঝরে পড়ছে।"

তপস্যাজীবনের কম বাধাবিঘ্নও তাঁহাকে এ সময়ে অতিক্রম করিতে হয় নাই। ঐহিক প্রলোভন, সংস্কার ও কামাধিপতি 'মার'-এর উপদ্রব সমস্ত কিছু ঠেলিয়া বীর সাধক অমিতবিক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন। এ সময়কার সাধনকালে শরীর নিগ্রহের কোন পন্থাই সিদ্ধার্থ অপরীক্ষিত রাখেন নাই, ক্রমাগত নিষ্পেষণের ফলে দেহটি অবশেষে ভগ্নাবস্থায় আসিয়া পৌঁছে।

চরম দুর্ব্বলতার ফলে একদিন হঠাৎ তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়, মৃতকল্প অবস্থায় বনমধ্যে তিনি পড়িয়া থাকেন। এই সময়ে দৈবানুগ্রহে কোথা হইতে এক রাখাল বালক আসিয়া উপস্থিত হয়। সিদ্ধার্থকে কিছুটা দুগ্ধ পান করাইয়া ও সেবা যত্ন করিয়া কোনক্রমে সে তাঁহাকে বাঁচাইয়া তোলে।

এবার গভীরভাবে সিদ্ধার্থ ভাবিতে বসিলেন। ছয় বৎসর ব্যাপিয়া চরম কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন, কিন্তু প্রার্থিত পরম বস্তু, নির্ব্বাণ তো এখনো তাঁহার লাভ হয় নাই!

তপস্যার কঠোরতা ত্যাগ করিয়া এবার হইতে নিলেন মধ্যপথ। দেহ ধারণের জন্য যে ন্যূনতম আহার্য্য ও পানীয় প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করা শুরু করেন, সাধনা চলিতে থাকে অব্যাহতভাবে।

কঠোর তপশ্চর্য্যা সঙ্গী সাধকদের কাছে এতকাল তাঁহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছিল। এবার হইতে তাহাদের চোখে সে মর্য্যাদা আর রহিল না, পূর্ব্বেকার আস্থা একবারে চলিয়া গেল। তাহাদের ধারণা হইল, গৌতমের সে দৃঢ় সঙ্কল্প ও ত্যাগ বৈরাগ্য আর নাই, তিনি ভোগলিপ্সু হইয়া উঠিয়াছেন!

সঙ্গীরা সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

সেদিন নৈরঞ্জনায় স্নান সমাপন করিয়া সিদ্ধার্থ এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। পল্লীবধূ সুজাতা এ সময়ে সেখানে আসিয়া

উপস্থিত। হাতে তাহার পূজার উপচার ও পরমান্নের থালা। নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ায় বনদেবতার পূজা দিতে সে আসিয়াছে।

নীরব নিস্পন্দ হইয়া বুদ্ধ ধ্যান করিতেছেন, কোন রকম বাহ্য-জ্ঞান তাঁহার নাই।

এই দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে সুজাতা থমকিয়া দাঁড়াইল। তপস্যায় কৃশ-তনু এ শ্রমণ যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। মনে হইল, যে বনদেবতার পূজা দিতে সে আসিয়াছে এ তাঁহারই মূর্ত্ত বিগ্রহ।

পূজার পুষ্প চন্দন ও পরমান্নের থালা সিদ্ধার্থের সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিভরে সে নিবেদন করিল। সাধ্বী পল্লীবালার উপর সেদিন ঝরিয়া পড়িল মহাসাধকের আশীর্ব্বাদ।

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের আগে ও পরে নিয়মিতভাবে তাঁহার আহার্য্য জোগানো ছিল সুজাতার এক পবিত্র ব্রত। তাঁহার পায়সান্ন কঠোরতপা শ্রমণের ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারে এসময়ে সাহায্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাই ভক্তিমতী সুজাতার প্রশস্তির অন্ত নাই।

সুস্থ দেহে প্রশান্তচিত্তে বনমধ্যে বসিয়া সিদ্ধার্থ এবার ধ্যান ও সমাধির এক একটি স্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তারপর এই বনতলের আসনে বসিয়া লাভ করিলেন চিরপ্রার্থিত তত্ত্বজ্ঞান।

বলিয়া উঠিলেন,—"অনুত্তরং যোগক্ষেমং নিব্বানং অজ্ঝগমং" অর্থাৎ, অনুত্তর কামাদি যোগের অতীত নির্ব্বাণ আমি লাভ ক'রেছি।

সম্বোধির উদয়ে সমগ্র সত্তা তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে। সাধক হইয়াছেন তথাগত—অর্থাৎ, যে পথে গমন করিলে নির্ব্বাণের পরম অবস্থা লাভ হয় সেই পথেরই তিনি পথিক। তিনি তখন বুদ্ধ, অর্থাৎ সেই আপ্তকাম মহা তাপস—বোধি বা পরম জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে করায়ত্ত।

একলা সেদিন তিনি বনমধ্যে পদচারণায় রত। দুইটি বণিক এই সময়ে দক্ষিণাঞ্চল হইতে এ দুর্গম অরণ্যপথ দিয়া দেশে ফিরিতেছিল। ইহাদের নাম তপুসস্ ও ভল্লিক, সঙ্গে পণ্য বোঝাই গাড়ী ও

অনুচরদল। হঠাৎ এসময়ে বণিকদের গাড়ীর চাকা মাটিতে আট-কাইয়া যায়, গহন অরণ্যে সকলে বিপন্ন হইয়া পড়ে। বুদ্ধের নির্দ্দেশে ও সাহায্যে তাহাদের অচল গাড়ী সেদিন সচল হইয়া উঠিয়াছিল।

বণিকদের মনে বড় বিস্ময় জাগিয়া উঠে। এ গহন বনের মধ্যে সুন্দর-সুঠাম-বপু কে এই কল্যাণকামী তাপস? শ্রদ্ধাভরে উভয়ে তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিল।

ইহাদের নিবেদিত আহার্য্য গ্রহণ করার পর বুদ্ধ এসময়ে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই দুই বণিকের সৌভাগ্যের প্রশংসা রহিয়াছে। কারণ, সম্বোধিপ্রাপ্ত মহাসাধকের প্রথম উপদেশ ইহারাই লাভ করে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হয়।

বোধিদ্রুমতলে বসিয়া সিদ্ধার্থ এবার ভাবিতে বসিলেন। সত্যের যে আলোক তাঁহার জীবনসত্তায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কি আজ জনকল্যাণে বিতরণ করিবেন? মানবের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কি ইহা নিয়োজিত করিবেন?

কিন্তু একাজে বাধাও বড় কম নয়। অধঃপতিত সমাজ কি তাঁহার এ নবতর জীবন-দর্শন গ্রহণ করিবে? নব-উদ্ভাবিত সাধন প্রণালী সহজে নিতে চাহিবে?

আবার বিপরীত চিন্তা মনে আসে। কেন শুধু শুধু তিনি এই জনকল্যাণের পিছনে ছুটিয়া বেড়াইবেন? বরং নির্ব্বাণের শান্তি ও আনন্দের রসে ডুবিয়া থাকার মধ্যেই যে তাঁহার নিজের সার্থকতা।

কিন্তু এটাই বা কি রকম কথা? নিজের জন্য তো এ জীবনে বেশী ভাবেন নাই! জরা–ব্যাধি-মৃত্যু-কবলিত মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যই তিনি গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। আজ যে নূতন গৃহ খুঁজিয়া পাইলেন, যে শাশ্বত শান্তি আবিষ্কার করিলেন তাহা হইতে ত্রিতাপক্লিষ্ট মানুষকে

তো তিনি বঞ্চিত করিতে পারেন না। সঙ্কল্প তখনি স্থির হইয়া গেল, উপলব্ধ সত্যের প্রচার সর্ব্বত্র তিনি করিবেন।

বারাণসী তখন ভারতের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র। বুদ্ধ ঠিক করিলেন, এখান হইতেই তাঁহার প্রচারকার্য্য শুরু করা হইবে। নগরীর অনতিদূরে ঋষিপত্তন, বহু সাধুসন্ন্যাসী সেখানে থাকিয়া সাধন ভজন করেন। ইহারই অন্যতম বন, মৃগদাব-এ তিনি আসন পাতিয়া বসিলেন। এ স্থানই উত্তরকালে সারনাথ নামে পরিচিত হইয়া উঠে।

উরুবিল্ব বনের যে সাধক কয়টি বুদ্ধের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাঁহাকে ভোগলিপ্সু মনে করিয়া ছাড়িয়া আসে, তাহারা তখন এখানে বসিয়া সাধনা করিতেছে। কৃপালু বুদ্ধ তাঁহার সাধনৈশ্বর্য্য নিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইহাদেরই সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার সমগ্র সত্তায় তখন এক আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা, চোখে মুখে সম্বোধিপ্রাপ্ত সাধকের স্বর্গীয় দীপ্তি আর প্রশান্তি। দর্শনমাত্র সঙ্গ-ত্যাগী সাধকদের ভ্রান্তি টুটিয়া গেল। তাহাদের বুঝিতে দেরী হইল না, সাধক সিদ্ধার্থ আজ সত্যই আপ্তকাম। সকলে মিলিয়া তখনি তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিল।

নূতন সাধনতত্ত্বের প্রথম ধারক ও বাহক এই শ্রমণদের নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্রাজিৎ, বপ্পা, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

বুদ্ধ তাঁহাদের ডাকিয়া কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, পরিব্রাজকদের উচিত সাধনার দুই অন্ত পরিত্যাগ ক'রে চলা। সে দুইটি অন্ত কি? প্রথম, হীন গ্রাম্য ইতরজন-ভোগ্য অনার্য, অনর্থ-সংযুক্ত ইপ্সিত বস্তুর উপভোগ। দ্বিতীয়, দুঃখময়, অনার্য, অনর্থ-সংযুক্ত দেহ-নির্য্যাতন। এই দুই অন্ত অতিক্রম ক'রে তথাগত মধ্যম পথ আবিষ্কার করেছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়—অভিজ্ঞা, সম্বোধ ও নির্ব্বাণ লাভ করা যায়।

"হে ভিক্ষুগণ ! তথাগত যে মধ্যম পথ আবিষ্কার করেছেন তা কোন্ পথ ? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।"

মৃগদাব-কে কেন্দ্র করিয়া প্রচারকার্য্য শুরু হইয়া গেল।

বারাণসীর এক প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র—যশ। বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হইলে কি হয়, ত্যাগ বৈরাগ্যের এক সহজাত ধৃতি নিয়াই তাঁহার জন্ম। ধনী গৃহের সমস্ত কিছু বিত্ত-বিভব ও আকর্ষণ দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সেদিন তিনি বুদ্ধ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার আত্মপরিজন ও বন্ধু-বান্ধবেরাও ক্রমে আসিয়া জুটিল এই মহান আচার্য্যের পাশে।

ইহার পর বুদ্ধ উরুবিল্ব ও রাজগৃহে পদার্পণ করিলেন। তরুণ আচার্য্যের নয়নে সম্বোধির দ্যুতি, কণ্ঠে পরম আশ্বাসের বাণী। অনেকের সঙ্গে সম্রাট বিম্বিসারও সেদিন তাঁহার চরণে নতি জানান।

সম্রাটের আনুগত্য ও সহযোগিতা বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারে সেদিন শক্তি সঞ্চার করে, প্রচারকে ব্যাপকতর করিয়া তোলে।

বেণুবনে এক বৎসর কাল যাপন করিয়া বুদ্ধ এ সময়ে বহু মুমুক্ষুকে উপদেশ দান করেন।

কাশ্যপ ছিলেন মগধের এক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। বুদ্ধের ধর্ম্মদেসনা ও বাণী তাঁহার হৃদয়ে এক অলৌকিক স্পর্শ বুলাইয়া দেয়, এই মহাপুরুষের ছত্রছায়াতলে তিনি আসিয়া দাঁড়ান। তাছাড়া, আচার্য্য সঞ্জয়ের শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নও এই সময়ে বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবধর্ম্মের বিস্তারে ইঁহাদের দুজনের অবদান হইয়া উঠে অবিস্মরণীয়।

প্রচার ও পরিব্রাজনের পথে জন্মস্থান কপিলবাস্তুও সেদিন বাদ

যায় নাই। মুণ্ডিতকেশ, চীবর পরিহিত 'শ্রমণ গৌতম' ভিক্ষাপাত্র হাতে রাজপথে চলিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচরদল।

রাজপুরীতে সংবাদ পৌঁছিল, শুদ্ধোদন ত্রস্তব্যস্তে পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, শাক্যকুলের যুবরাজ তুমি। কিন্তু একি অদ্ভুত আচরণ তোমার! রাজপুত্রের হস্তে কেন এই ভিক্ষাপাত্র ?"

বুদ্ধ প্রশান্তস্বরে উত্তর দিলেন, "পিতা, এতো নূতন কিছু নয়। এ যে আমার কুলধর্ম্ম।"

"কপিলবাস্তুর কোন্ রাজকুমার এ ভিক্ষাবৃত্তিকে কুলধর্ম্ম ব'লে মনে করে, তা আমায় বলতে পারো ?"

"পূর্ব্বগামী বুদ্ধের দলই যে আমার পূর্ব্বপুরুষ, পিতা। আমি তাঁদের অনুসৃত সন্ন্যাস ও ভিক্ষাগ্রহণের পথ অবলম্বন করেছি। এই আমার সত্যকার কুলাচার।"

প্রসন্নমধুর হাস্যে পুত্র এ উত্তর দিলেন, কিন্তু পিতা একথা শুনিয়া উদ্গত নয়নাশ্রু রোধ করিতে পারেন নাই।

সিদ্ধার্থ আবার তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ফিরিয়াছেন কঠোর তপস্যার অন্তে সিদ্ধমনোরথ হইয়া। শুদ্ধোদনের অন্তঃপুরে আনন্দ-কলরব পড়িয়া গেল।

রাজমহিষী গৌতমীর আজ উৎসাহের সীমা নাই! পরম স্নেহে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যদের তিনি ভোজন করাইতে বসিলেন। অন্তঃপুরিকারা চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এসময়ে, মিলনের এ আনন্দক্ষণে যশোধরা কোথায় ?

নীরবে একাকিনী নিজের কক্ষে তিনি বসিয়া আছেন। পুরনারীরা ছুটিয়া গিয়া কহিলেন, "ওগো, শিগ্‌গীর যাও, তাঁকে দর্শন ক'রে, প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো।"

যশোধরা নড়িলেন না। আজ তাঁহার বুকে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে অভিমানের পাথার। নয়নের অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "স্বামীর কাছে

যদি কিছু মূল্য আমার থাকে, তবে নিজেই তিনি আমার কাছে আস্‌বেন। এলে, তখন আমার প্রণাম জানাবো।"

বুদ্ধকে এ কথা জানানো হইল। উত্তরে তিনি কহিলেন, "একথা বলায় রাহুল-মাতার কোন দোষ হয়নি। তিনি প্রণাম নিবেদন কর্‌বেন তাঁর নিজের ইচ্ছেমত।"

আহারান্তে ধীর পদক্ষেপে তিনি যশোধরার কাছে চলিলেন। দুই পাশে তাঁহার রহিয়াছেন পিতা শুদ্ধোদন, আর দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য —সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়ন।

স্বামী—প্রাণেশ্বর আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কক্ষের দ্বারে। সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষুর বেশ তাঁহার দিব্য আনন্দের জ্যোতিতে আননখানি উদ্ভাসিত। কিন্তু যশোধরার আগেকার সে মানুষটি কোথায়? স্বামী তাঁহার কাছে আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন দেব-মানবরূপে। লৌকিক জীবনের সুখদুঃখে ভরা সে মানুষটি, প্রেম-মমতায় ভরা সে মানুষটি কই? এযে এক নিস্তরঙ্গ দুরবগাহ ব্যক্তিসত্তা!

আর ধৈর্য্য রাখা চলিল না। এবার উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া যশোধরা স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। অবিরাম ধারে দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে লাগিল অশ্রুর ধারা।

কিছুটা আত্মসম্বরণ করার পর দেখিলেন—শুদ্ধোদন, সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কক্ষের একপাশে তিনি সরিয়া গেলেন।

পুত্রের গৃহত্যাগের পর পুত্রবধূকে নিয়াও শুদ্ধোদনকে কম দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। সখেদে তিনি জানাইলেন, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পর যশোধরা কেশকলাপ মুণ্ডন করিয়াছেন, গ্রহণ করিয়াছেন দীন বেশ ও ভূমিশয্যা।

বুদ্ধ প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, এতে তো বিস্ময়ের কিছু নেই, রাহুল-মাতা তাঁর উপযুক্ত আচরণই ক'রেছেন।"

মানবপ্রেমিক বুদ্ধ সেদিন বিরহ-বিধুরা পত্নীকে উপেক্ষা করেন নাই। সস্নেহে আপন উপলব্ধ সত্যের মহিমা তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, অমৃতজীবন লাভের জন্য আহ্বান জানান।

এ আহ্বান তাঁহার ব্যর্থ হয় নাই। উত্তরকালে এক সার্থকনাম্নী ভিক্ষুণীরূপে যশোধরাকে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছিল।

বালক রাহুলের সেদিন কৌতূহলের অন্ত নাই, নয়ন বিস্ফারিত করিয়া এই নবাগত শ্রমণকে সে কেবলি দেখিতেছে। অশ্রু মুছিয়া যশোধরা পুত্রকে কাছে ডাকিলেন। কহিলেন, "বৎস, এই দিব্যকান্তি শ্রমণ হচ্ছেন তোমার পিতা। অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে এঁর কাছে। সেই পিতৃধন তুমি আজ চেয়ে নাও।"

বিস্মিত রাহুল ধীর পদক্ষেপে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধ সস্নেহে কহিলেন, "বৎস! অর্থ, মণিমাণিক্য তো আমার কিছু নেই। কিন্তু আমার কাছে রয়েছে সত্যব্রত। আজ সেই পৈত্রিক ধনই তুমি আমার কাছ থেকে পাবে।"

সারিপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ এখনি এ বালককে দীক্ষিত ক'রে নাও।"

রাহুলের কমনীয় দেহে তুলিয়া দেওয়া হইল ভিক্ষুর চীবর, হাতে দেওয়া হইল ভিক্ষাপাত্র। বৌদ্ধসঙ্ঘে স্থান দিবার পর, তাহাকে রাখা হইল সারিপুত্রের শিক্ষাধীনে।

শুধু পুত্র রাহুল নয়, ভ্রাতা নন্দকেও বুদ্ধ এ সময়ে আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই। বিমাতা গৌতমীর পুত্র নন্দ সংসারাশ্রমে থাকা-কালে তাঁহার বড় প্রিয়পাত্র ছিল। নন্দ বয়সে তরুণ, একটি আত্মীয়ের মেয়েকে সে খুব ভালবাসে। সম্প্রতি তাহাদের বিবাহের কথা পাকাপাকিভাবে স্থিরও হইয়াছে। মেয়েটির নাম জনপদ-কল্যাণী। বিবাহের জন্য উভয়েই উন্মুখ হইয়া আছে।

বুদ্ধ সেদিন রাজপুরীতে আসিয়াছেন, নানা কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

হঠাৎ এক সময়ে নিজের ভিক্ষাপাত্রটি তিনি নন্দের হাতে দিয়া দিলেন। বুদ্ধ স্বেচ্ছামত এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করিতেছেন, আর নন্দও চলিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ভিক্ষাপাত্রটি সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না, সেটি ফেরৎ নিবার কোন লক্ষণও নাই। ভ্রাতা নন্দ অগত্যা বশংবদের মত তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন।

কাজ শেষ হইলে বুদ্ধ ন্যগ্রোধ-আরামের দিকে রওনা হইলেন, এই উদ্যানেই শুদ্ধোদন পুত্র ও তাঁহার ভিক্ষুদের বাস করিতে দিয়াছেন। শিষ্যগণ-সহ বুদ্ধ রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন ! পিছনে ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজকুমার নন্দ।

নন্দের প্রেমিকা জনপদকল্যাণী এসময়ে বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছে। এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি নন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে যাইতেছে ?

"ওগো তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো। একটিবার শুনে যাও"— বলিয়া চীৎকার করিয়া সে ডাকিতেছে।

প্রণয়িনীর এ মিনতি, এ আর্ত্তস্বর নন্দের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। মন তাহার উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, এখনি তাহার কাছে ছুটিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সম্মুখে চলমান বুদ্ধের সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তিটির দিকে তাকাইতেই সে থম্‌কিয়া গেল। একটি বারের জন্য তাহার দিকে ফিরিয়া বুদ্ধ আবার আগাইয়া চলিলেন।

নন্দ যেন ইন্দ্রজালমুগ্ধ। ভিক্ষাপাত্রটি বহনের ভার তাহার উপর, কিন্তু বুদ্ধ ইহা ফিরাইয়া না নিলে কোথায়ই বা সে রাখিবে? নীরবে নতমস্তকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে চলিতে লাগিল।

ন্যগ্রোধ-আরামে পৌঁছিয়াই সমবেত ভিক্ষুদের সম্মুখে ভ্রাতাকে বুদ্ধ সেদিন দীক্ষা দিয়া ফেলিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধার্থের পর অপর পুত্র নন্দ ও রাহুল সন্ন্যাস নিল। বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। বংশ রক্ষারই যে

আর উপায় রহিল না। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা তখনি ছুটিয়া গিয়া বুদ্ধকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধের নব ধর্ম্মমাহাত্ম্য তাঁহার বিমাতা গৌতমী, স্ত্রী যশোধরা ও আরো বহু শাক্য নারীদের উত্তরকালে প্রভাবিত করিয়াছিল।

তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, ত্যাগ বৈরাগ্য ও ঋদ্ধিসিদ্ধির কাহিনী সেদিনকার শাক্য যুবকদের মনে আলোড়ন তুলিয়া দেয়। কয়েকটি বিশিষ্ট যুবক এ সময়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতৃব্য-পুত্র দেবদত্ত ও আনন্দ ইঁহাদের অন্যতম।

ক্ষৌরকার-পুত্র উপালী ছিল এই যুবকদের সঙ্গীয় পরিচারক, বুদ্ধকে দর্শন করিয়া সেও সেদিন মুগ্ধ হয়, ছুটিয়া গিয়া তখনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করে।

ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার জন্য শাক্য তরুণেরা সেদিন যুক্তকরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিন্তু দীক্ষাদানের জন্য বুদ্ধ সকলের আগে আহ্বান করিয়া বসিলেন ক্ষৌরকারতনয় উপালীকে। বলা বাহুল্য, সেদিনকার এ আচরণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়া দেন, তাঁহার ধর্ম্মে জাতিবর্ণের কথা অবান্তর। তাছাড়া, শাক্য যুবকদের আভিজাত্য বোধের মূলেও সেদিন তিনি এক আঘাত হানিতে চাহিয়াছিলেন।

ভিক্ষু উপালী উত্তরকালে বুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে খ্যাত হন। বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক ছিলেন এই ক্ষৌরকারপুত্র উপালী। বুদ্ধ সঙ্গীতিগুলিতে 'বিনয়ধর' নামে তিনি মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহের নিকটে শীতবনে বুদ্ধ সে-বার বাস করিতেন। এ সময়ে শ্রাবস্তীর স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠী সুদত্ত কি এক বৈষয়িক কাজে এ অঞ্চলে আসিয়াছেন।

এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের গৃহে তিনি অতিথি। সে গৃহে প্রভু বুদ্ধেরও সেদিন ছিল নিমন্ত্রণ। বুদ্ধের দর্শন সুদত্ত এখানে পান, আর জীবনে

তাঁহার ঘটিয়া যায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন। পরদিনই শীতবনে গিয়া তিনি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন।

পরম কারুণিক বুদ্ধের দিব্য স্পর্শে এই শ্রেষ্ঠী এক নূতন মানুষে পরিণত হন—পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের জন্য অকৃপণ করে তিনি অর্থ দান করেন। বহু দরিদ্রকে তিনি অন্ন ও আশ্রয় যোগান, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাই তাঁহার নাম দেওয়া হয় অনাথপিণ্ডদ।

অনাথপিণ্ডদের বড় ইচ্ছা প্রভু শ্রাবস্তীতে অসিয়া কিছুদিন থাকুন। নিমন্ত্রণ তো তিনি জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থানের উপযুক্ত উপবন কোথায়? নগরের উপকণ্ঠস্থিত জেতবন বড় রমণীয়। শ্রেষ্ঠী মনস্থ করিলেন, এ উদ্যানই তিনি প্রভুর জন্য ক্রয় করিবেন।

কিন্তু একাজ বড় সহজ নয়। উপবনটি রাজকুমার জেতের সম্পত্তি, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এটিকে তিনি পরিণত করিয়াছেন এক ভূস্বর্গে। হস্তান্তর করিবেন বলিয়া তো মনে হয় না!

জেত সেদিন এ উপবনের জন্য এক অসম্ভব মূল্য চাহিয়া বসিলেন। কহিলেন, "শ্রেষ্ঠী, যদি আমার এ রম্য উদ্যান কেন্‌বার ইচ্ছা তোমার হয়েই থাকে, তবে এর ওপর স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দাও। যে পরিমাণ মুদ্রা দিয়া সবটা ভূমি ঢাকা পড়বে, তাই হবে এর প্রকৃত দাম।"

অনাথপিণ্ডদের কাছে তখন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদই তুচ্ছ, প্রভুর প্রসন্নতার জন্য সব কিছুই যে তিনি বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত। এই মূল্য দিতেই তিনি রাজী হইলেন।

শকটপূর্ণ রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা জেতবনে জড়ো করা হইতেছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সারা শ্রাবস্তীর লোক সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাজকুমার জেতের বিস্ময় কিন্তু চরমে উঠিল। কে এই প্রভু বুদ্ধ? একি অলৌকিক আকর্ষণী-শক্তি তাঁহার? অর্থলুব্ধ এই শ্রেষ্ঠীকে কোন্ মায়াদণ্ডের স্পর্শে তিনি এমন সর্ব্বত্যাগী করিয়া তুলিয়াছেন?

যাঁহার জন্য অনাথপিণ্ডদ জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এমন উজাড় করিয়া

ঢালিতে চান, সেই প্রভু বুদ্ধ অজানিতভাবে সেদিন রাজকুমার জেত-এর হৃদয়ও জুড়িয়া বসিলেন !

শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "অনাথপিণ্ডদ, তোমার এ অদ্ভুত রূপান্তর দেখে আমি প্রভু বুদ্ধের মহিমা আজ কিছুটা বুঝতে পাচ্ছি। স্বর্ণমুদ্রা তোমায় আর এখানে ঢাল্‌তে হবে না। এ জেতবন আমি নিজেই প্রভুর চরণে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হতে চাই।"

অতঃপর জেতবন অনাথপিণ্ডদের অর্থে ভিক্ষুদের জন্য এক বিরাট বিহার ও ধর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। 'অনাথপিণ্ডদ আরাম' নামে এ উপবন সুপরিচিত হইয়া ওঠে। বুদ্ধ এখানে উনিশটি বর্ষা যাপন করিয়াছিলেন, শ্রাবস্তী ও নিকটস্থ অঞ্চলের মুমুক্ষু নরনারী এসময়ে তাঁহার সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত।

শ্রাবস্তীর অপর এক সঙ্ঘারাম ভক্ত-শিষ্যা বিশাখা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বুদ্ধ এখানে প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। তাঁহার গৃহী স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে বিশাখা ছিলেন প্রধানা, শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্র পুণ্যবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই পুণ্যবতী মহিলার বহুতর দানকীর্ত্তির কথা বৌদ্ধ সাহিত্যে রহিয়াছে।

সম্বোধি লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল বুদ্ধ তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। শুধু শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ, কুশীনগর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরেই তিনি তাঁহার ধর্ম্মদেসনা দান করেন নাই, দেশের দূর দূরান্তে, গ্রামাঞ্চলে এ নবধর্ম্মের বার্ত্তা ও উদ্দীপনা তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন।

নিজে তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী, রোজই পদব্রজে বাহির হইতেন প্রচার-পরিক্রমায়। মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, আননে দিব্য লাবণ্যশ্রী। রাজকান্তি দেহে ভিক্ষুর বেশ। এই বেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে জনগণের মধ্যে তিনি বিচরণ করিতেন। সেদিনকার অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিপীড়িত মানুষের সম্মুখে বুদ্ধ ছিলেন এক করুণাঘন

বিগ্রহস্বরূপ। যেখানেই যখন তিনি উপস্থিত হইতেন তাঁহার বাণী ও ব্যক্তিত্ব এক অপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার করিত।

বুদ্ধের এই নিজস্ব কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত মিলিত হয় তাঁহার সঙ্ঘের শক্তি। ত্যাগব্রতী শত সহস্র ভিক্ষুর পরিক্রমা ও প্রচারের মধ্য দিয়া নবধর্ম্ম প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। প্রচার ও সংগঠনের এই প্রতিভা ও কর্ম্মনিষ্ঠা শুধু ভারতেরই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও সংগঠনকর্ম্মের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট ধারাকে আমরা সমন্বিত হইতে দেখি। ইহার একটি ব্রাহ্মণের, অপরটি ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণের ত্যাগ তিতিক্ষা ও পবিত্রতার সহিত তাঁহার কর্ম্মসাধনায় মিলিত হয় ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, কৌশল ও কর্ম্মনৈপুণ্য।

নবধর্ম্মকে জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য বুদ্ধ পালি-ভাষায় ইহার প্রচার করেন। সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্বজনবেদ্য ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মদেসনার পরিবেশন ছিল সত্যই বড় অভিনব। তাছাড়া, নিজের উপদেশগুলি অনেক সময় তিনি গাথার আকারে গ্রথিত করিয়া দিতেন। লোকের মুখে মুখে এগুলি প্রচারিত হইত, প্রবেশ করিত সমাজ-জীবনের সর্ব্ব স্তরে। পরবর্ত্তীকালে এই গাথা-সংগ্রহই প্রসিদ্ধ 'ধর্ম্মপদ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রচারনিষ্ঠা ও জনসংযোগের ফল দূরপ্রসারী না হইয়া পারে নাই। দেশমধ্যে সেদিন ইহা নূতন উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, নূতনতর ভাবনা ও কর্ম্মধারার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া তোলে।

বুদ্ধের জীবনবার্ত্তা ও তাঁহার ভিক্ষুশিষ্যদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মহিমাটি স্বপ্রকাশ, সাধারণ মানুষকে এ বস্তু বুঝানোর প্রয়োজন হয়না। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শ কি, উহার দার্শনিক ভিত্তি কি, এ প্রশ্ন বারবারই উঠিয়াছে।

মানবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণ ছিল বুদ্ধ-জীবনের প্রধান ব্রত,

তাই তত্ত্বদর্শনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বরাবরই এই মহাপুরুষের নিকট হইয়া উঠিয়াছে গৌণ।

সাধকদের নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করার কাজকে তিনি বড় মনে করেন নাই। দীঘনিকায়-এর পোট্‌ঠপাদ সুত্তে বুদ্ধ তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "জেনে রেখো, তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রকৃত কল্যাণ নিহিত নেই, বরং অষ্টাঙ্গ মার্গের সাধনাই এনে দেবে তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ।"

তাই দেখা যায়, বুদ্ধের দৃষ্টিতে ধর্ম্মের স্থান ছিল দর্শনের উপরে। তর্ক-বিতর্ক অপেক্ষা অভ্যাস-যোগের উপর তিনি গুরুত্ব দিতেন বেশী। তাঁহার নব-ধর্ম্মের সব চাইতে বড় কথা—'এহিপস্‌সিকো ধর্ম্মো,' অর্থাৎ,—এগিয়ে এসো এবং স্বচক্ষে দেখে যাও।

প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসরণ ক'রে সাধক যাতে হাতে হাতে ফল পায়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তাহার হয়, তাহাই ছিল তাঁহার কাম্য।

ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধের নীরবতা বড় রহস্যময়। এ নীরবতার উত্তর তাঁহার নিজের কথা ও আচরণ হইতে কিছুটা মিলে।

কৌশাম্বির উপকণ্ঠস্থিত এক শিংশপা-বনে সে-বার তিনি বাস করিতেছেন। একদিন হাতে কয়েকটি শিশুগাছের পাতা নিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোন্‌টা তোমাদের মতে বেশি সংখ্যক বলে মনে হয়? আমার হাতের এ কয়টি পত্র—না, বনের সবগুলি বৃক্ষের পত্র?"

"ভদন্ত, অবশ্যই সারা বনের পত্রের সংখ্যা অনেক বেশী।"

"তা হ'লেই ছাখো, আমি তোমাদের যা কিছু বলি তার চাইতে আমার জানা কিন্তু না-বলা তত্ত্ব অনেক বেশী রয়েছে। সব কিছু তত্ত্ব তোমাদের না বল্‌বার কারণ, এতে তোমাদের প্রকৃত বাসনা-মুক্তি ঘটবে না, বোধি লাভও হবে না। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি তোমাদের দুঃখের স্বরূপ, তার উৎপত্তির কারণ, তার নিরোধের পথ—সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে ত্রুটি করিনি।"

বুদ্ধের সাধনার মূল লক্ষ্য মানবীয় দুঃখের নিবৃত্তি, তাঁহার পদ্ধতিটিও হইতেছে মানবীয়—সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক।

সোন নামক এক তরুণ ভিক্ষু বহু কৃচ্ছ্র সাধনের পরও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিতেছেন না। তাই সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া এবার তিনি সংসারের ভোগসুখের পথেই ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিলেন।

ভক্তের মানসিক সঙ্কটের কথা বুদ্ধের কাছে অজানা রহে নাই। তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "সোন, তুমি তো বীণা বাজাতে পারো। তোমার বীণার তারগুলো যদি খুব বেশী আঁট ক'রে বাঁধা থাকে, তবে কি তা থেকে সুর বের হবে?"

"না ভদন্ত।"

"আচ্ছা এ তারগুলি যদি বেশী ঢিল্ করা থাকে তবে কি হবে?"

"সে ক্ষেত্রেও সুর বের হবে না।"

"আচ্ছা যদি তোমার বীণার তার বেশী আঁট বা বেশী ঢিল না রেখে ঠিকমত টেনে বাঁধো, তবে?"

"হ্যাঁ ভদন্ত, তখনই প্রকৃত সুর বেজে উঠ্‌বে।"

"তবে শোন ভিক্ষু, অত্যধিক কৃচ্ছ্র সাধনার একটা ঝুঁকি আছে তাতে অহং জন্মে, আবার অত্যল্প সাধনায় সাধক হয়ে পড়ে অলস। এই দুটির কোন পন্থায়ই সাধকের প্রাণের বীণায় আসল সুর বেজে ওঠেনা।"

এজন্যই হয় তো তথাগতের সাধনা সে যুগে অগণিত সাধারণ মানুষের বুকের তারে অপরূপ ঝঙ্কার তুলিতে পারিয়াছিল।

মালুঙ্ক্যপুত্র নামক বুদ্ধের এক শিষ্য একবার তাঁহাকে অনুযোগ জানায়। তথাগত বহু উপদেশই তাহাদের দেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কতকগুলি গভীর তাত্ত্বিক প্রশ্ন, দর্শনের প্রশ্ন তিনি এড়াইয়া যান। এগুলো অমীমাংসিত থাকায় শিষ্য মনে শান্তি পান না।

বুদ্ধ এ সম্পর্কে যে উত্তর তাহাকে দেন, মজ্ঝিম-নিকায়ে তাহা রক্ষিত আছে। উভয়ের এ কথোপকথন বড় গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম্মের তাত্ত্বিক

দিক সম্পর্কে বুদ্ধের মনোভাব কি ছিল, এ সংলাপ তাহারই এক চাবিকাঠি বিশেষ।

বুদ্ধ কহিলেন' "ত্যাখো মালুঙ্ক্যপুত্র, একজন লোক বিষাক্ত বাণ দ্বারা আহত হয়েছে। আত্মীয়স্বজনেরা ছুটে গিয়ে এক দক্ষ চিকিৎসককে ডেকে আন্‌লো। এখন যদি ঐ আহত লোকটি ব'লে বসে—'যতক্ষণ অবধি আমি না জান্‌ছি আমার আততায়ী কে, অভিজাত, না সাধারণ বংশের, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য না শূদ্র, ততক্ষণ আমি ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করাবো না।' অথবা সে যদি বল্‌তে থাকে, 'যতক্ষণ আমি না জান্‌ছি এই বাণ নিক্ষেপকারীর নাম কি, সে কোন্ গোত্রীয়, দীর্ঘাকার না খর্ব্বাকৃতি, যে শর আমায় বিদ্ধ করেছে তা কি দিয়ে নির্ম্মিত, ততক্ষণ আমি আহত স্থানের কোন চিকিৎসা করাবো না।'—তা'হলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায় বলতো ?

"এ জগৎ অনন্ত না শান্ত, শাশ্বত না নশ্বর, প্রাণ ও দেহের স্বরূপ কি, মৃত্যুর পর নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের অস্তিত্ব থাকে, না—থাকেনা, এ সব সম্বন্ধে কোন শিক্ষা আমি তোমাদের দিইনি। কেন তা বলতো ? কারণ, নিছক তত্ত্বালোচনায় তো মানুষ শুদ্ধ বুদ্ধ হতে পারেনা, পরা শান্তিও সে লাভ করেনা। যাতে সত্যকার শান্তি পাওয়া যায়, জ্ঞান লাভ হয়, সে সম্বন্ধে তো আমি আমার শিক্ষা ঠিকই দিয়েছি। দুঃখের মূলে কি আছে, দুঃখের উদয় কিসের থেকে হয়, দুঃখের নিবৃত্তি কোথায়, দুঃখ নিবৃত্তির পথের মূল সত্য কি—এসব তো আমি নির্দ্দেশিত করেছি। শোন মালুঙ্ক্যপুত্র, আমি যা স্পষ্টভাবে বলিনি তা অপ্রকাশিত থাকুক, যা আমি সবিস্তারে বলেছি তাই শুধু হোক প্রকাশিত।"

অধ্যাত্ম-সমস্যার ব্যবহারিক দিক—মানুষের তন্‌হা বা তৃষ্ণানিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির দিকেই এই মহাপুরুষের দৃষ্টি ছিল বেশী নিবদ্ধ। দার্শনিক বিশ্লেষণ ও ঔপপত্তিক আলোচনা তাঁহার কাছে ছিল গৌণ। দুঃখবাণ-বিদ্ধ মানুষের চিকিৎসার কাজটাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন।

জ্ঞানী সাধিকা বলিয়া ভিক্ষুণী ক্ষেমার প্রসিদ্ধি ছিল। সে-বার কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ তাঁহার সৈন্যসামন্তসহ শ্রাবস্তী নগরের দিকে চলিয়াছেন। পথে এই বিশিষ্টা ভিক্ষুণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। বুদ্ধের নির্ব্বাণ-তত্ত্ব কি, মৃত্যুর পর নির্ব্বাণীর অস্তিত্ব থাকে কিনা, এসব নানা প্রশ্ন রাজার মনে কিছুদিন যাবৎ আলোড়িত হইতেছিল। পথিমধ্যে ক্ষেমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তথাগত কেন এ এসব তত্ত্বের অর্থ উদ্ঘাটিত করেন নাই ?"

ভিক্ষুণী হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এর উত্তরে আমি আপনাকে একটা প্রতিপ্রশ্ন ক'রবো। আচ্ছা, আপনার কি এমন কোন সুদক্ষ হিসাবরক্ষক আছে, যে গুণে বলতে পারে গঙ্গাতটের বালুকার সংখ্যা কত, বা মেপে বলতে পারে সাগরের জলরাশির পরিমাণ কি ?"

"না, ভদ্রে এমন শক্তি কারো নেই।"

"কেন এসব বলা যায়না, মহারাজ ? কারণ বালুকা অগণিত, সাগরের জল অগাধ, অপরিমেয়। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগতের অস্তিত্বও ঠিক এমনিতর। এ অস্তিত্ব একেবারে অতল, অগাধ, অচিন্ত্য। অস্তি ও নাস্তি দুই-এরই মিলন সেখানে।"

বুদ্ধের ধর্ম্মকে বলা হইত, 'ধর্ম্ম অনিতিহ'—অর্থাৎ সাধকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে ইহার পরম তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, অনুভূতির মাধ্যমে ইহা ধরা পড়ে। তর্কযুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা এ ধর্ম্ম লাভ করা যায় না, ইহা করায়ত্ত হয় একান্ত ধ্যান ও লোকোত্তর সমাধির মধ্য দিয়া।

এই স্বানুভববেদ্য ধর্ম্মের কথা প্রসঙ্গে একবার তিনি অন্তরঙ্গ প্রিয় ভিক্ষুদের বলিতেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ তা'হলে তোমরা যে তত্ত্বের কথা বল্ছো তা তোমরা নিজেরাই চিনতে পেরেছো, নিজেরা আয়ত্তে এসেছো, উপলব্ধিও করেছো নিজেরাই। তাই নয় কি ?"

উত্তর হইল, "হাঁ ভদন্ত, তাই বটে।"

"উত্তম কথা, ভিক্ষুগণ।"

বুদ্ধ বলিতেন, "ধর্ম্মসাধনায় বিশ্বাস অতি প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখতে হবে প্রত্যক্ষ দর্শনের ওপর। কারণ, যে পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষের সাধনা, তার উপলব্ধি ঘটে তার নিজেরই ভেতরে।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নীরব, শাশ্বত জ্ঞানময় সত্তা সম্বন্ধেও কোন ব্যাখ্যা তিনি দিয়া যান নাই। তাছাড়া, তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে বেদ ও বেদজ্ঞদের বিরোধিতা ছিল প্রবল।* ফলে, বিনাশবাদী ও নাস্তিক বলিয়া তাঁহাকে নানা অভিযোগ শুনিতে হইয়াছে।

এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, একথা বুদ্ধের নিজমুখের কথা হইতে বুঝা যায়। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মহাজ্ঞানী সাধকের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত—কোন দেবতাই তাঁহার বিজ্ঞান বা পরম চৈতন্যসত্তার সন্ধান পান না। কেন? যেহেতু সেই তথাগত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত সাধক এখানে এবং এখনি অনুবেদ্য নয়।

"ভিক্ষুগণ! এইরূপ কথার জন্য কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেরা মিথ্যাভাবে, অদ্ভুতভাবে, তাচ্ছিল্যের সহিত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ

---

*বুদ্ধের বৈপ্লবিক কর্ম্মের গতি ছিল প্রধানতঃ দ্বিমুখী। একদিকে সমসাময়িক ভারতের ধর্ম্মজীবনকে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া ইহাকে তিনি করিতে চাহিয়াছেন ত্যাগ-বৈরাগ্য-ও-জ্ঞান-ধর্ম্মী। আর একদিকে তিনি করিয়াছেন বেদ পরিত্যাগ। শাস্ত্রের নিয়ম শৃঙ্খল হইতে সে যুগের মানুষ যাহাতে মুক্ত হয় তাহাই ছিল তাঁহার কাম্য।

কিন্তু প্রকাশ্যে বেদ পরিত্যাগ করিয়াই বুদ্ধ নিজের চারিদিকে এক পার্থক্যের গণ্ডী টানিয়া দেন। নূতন যে ধর্ম্মমত তিনি প্রচার করেন, সেজন্য তাঁহার ধর্ম্মকে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে নিজদেশে এমন পরদেশী হইতে হইত না সাংখ্যবাদও বৌদ্ধবাদের মতই পরিষ্কারভাবে ঈশ্বর মানে নাই, তবুও বেদানুগত্য উহার ছিল। ফলে সাংখ্যবাদকে নাস্তিকতার অপবাদ সহ্য করিতে হয় নাই।

করেন, 'এই শ্রমণ গৌতম বৈনাশিক, ইনি সৎ বস্তুর উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রচার করেন।' হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা নই, আমি যাহা বলিনা, এই সকল ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে তাহারই অভিযোগ করেন।" —মঝ্ঝিম-নিকায়, ২২ সুত্ত।

প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির উপর জোর দিলেও বুদ্ধ শাশ্বত নিত্য-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এক অজাত, অভূত, অসংখত, পরম সত্তার কথা তাঁহার মুখে বার বার শোনা গিয়াছে।

বুদ্ধের উপদেশের মূল সূত্র অনিত্যবাদ। তাঁহার মতে—সব্বং অনিচ্চং, সব্বং দুঃখং, সব্বং অনাত্মং, অর্থাৎ সবই অনিত্য, সবই দুঃখ, সবই অনাত্ম। এই প্রপঞ্চ, এই নাম রূপ বা যত কিছু সূক্ষ্ম সত্তা সব কিছুরই যেমন উৎপত্তি আছে তেমনি বিনাশ আছে, স্বভাবতঃই এসব নশ্বর।

কিন্তু কোথায় সেই শাশ্বত পরম বস্তু? কোথায় সেই অজর অমৃত 'মহান্ ধ্রুবঃ'? কি করিয়া তাহা লাভ করা যায়?

বুদ্ধের দেসনা সাধককে উদ্বোধিত করে তন্‌হা বা তৃষ্ণা ও বিষয়-বাসনার নিবৃত্তির পথে, ধ্যান ও সমাধির স্তরে স্তরে তাহাকে আগাইয়া দেয়। দুঃখময় জগৎপথের অন্তে প্রকাশিত হয় অমেয় অনির্ব্বচনীয় পরম সত্য—নির্ব্বাণ।

বুদ্ধ কথিত এই নির্ব্বাণের স্বরূপ কি, তাহা লইয়া বৌদ্ধতত্ত্বের গবেষকদের মধ্যে মতভেদ বড় কম নাই। একদল বলেন, ইহা অস্তি মূলক এক অমৃতময় সত্তা, আবার কাহারো মতে ইহা হইতেছে মহাবিনাশ। মাক্স্‌মূলের, রীস্ ডেভিড্‌স্ প্রভৃতি নির্ব্বাণকে ঐকান্তিক বিনাশ অর্থে গ্রহণ করিতে রাজী নন। আবার ওলডেনবের্গ, ডাহ্‌লক, বিগানগেট প্রভৃতি গবেষকদের মতে, নির্ব্বাণ প্রকৃতপক্ষে অভাবাত্মক বিনাশের অতল পাথার—স্বর্গীয় আনন্দ ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

বৌদ্ধশাস্ত্রে রক্ষিত বুদ্ধের বাণীতে, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভিক্ষুশিষ্যদের

ব্যাখ্যানে এই নির্ব্বাণের নিহিতার্থ কিছুটা ধরা যায়। সর্ব্বাব্যাপী এক পরম সত্তাকে বুদ্ধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—এই সত্তার বিনাশ নাই, ইহা নিত্য, চৈতন্যময়। আমিত্বের বিনাশের ফলে এই পরম জ্ঞানের অবস্থাটি সাধক লাভ করে।

বুদ্ধের বর্ণিত ধ্যান ও সমাধিতত্ত্বের অনুধাবন করিলে এই জ্ঞানময় সত্তার স্বরূপটি স্পষ্টতর হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে তাঁহার এই সমাধির মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাই বুদ্ধের প্রচারিত প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

সুত্তনিপাতে বলা হইয়াছে, "নিব্বন্তি ধীরা যথায়াং পদীপঃ"—অর্থাৎ এই প্রদীপ যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি ধীরগণ নির্ব্বাপিত হন। কিন্তু এই নির্ব্বাপণ বা বিনাশ কিন্তু সত্তার বিনাশ নয়। বুদ্ধ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা, এই দুটির পার্থক্য করিয়া গিয়াছেন। নির্ব্বাণের অর্থে তাই বুঝানো হইয়াছে ব্যবহারিক সত্তার নির্ব্বাণ বা উপাধির নির্ব্বাণ। ইহাই হইতেছে নিরুপাধি অবস্থা—নিত্যাবস্থা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের একটি দিকও ইহাতে আছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকাশটি হইতেছে পারমার্থিক সত্তার।

এই দীপ নির্ব্বাণের অবস্থাটি আসলে কি? ইহা বুঝাইতে গিয়া বুদ্ধ অন্তরঙ্গ শিষ্য সারিপুত্তকে বলিতেছেন—"লোকে বলে—নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ। কিন্তু, হে বন্ধু সারিপুত্র, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি বলতো? এ নির্ব্বাণ হচ্ছে রাগ, দ্বেষ ও মায়ামোহের অন্তর্দ্ধান।"

আরো পরিষ্কার করিয়া কহিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, তেল ও বর্ত্তি দিয়ে জ্বালানো প্রদীপে যদি কেউ আর তেল ও বর্ত্তি সংযোগ না করে, তবে প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সেই রকম যিনি সমস্ত সংযোজনের (জীবন সত্তার উপাদানসমূহের)

নশ্বরতা উপলব্ধি ক'রে অনাহারে বিহার করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয় এবং সর্ব্ব দুঃখের মূল যে পঞ্চস্কন্দ তার হয় নিরোধ।" —সংযুক্তনিকায়।

এই নির্ব্বাণ যে অস্তীধর্ম্মী, পরা শান্তি ও ভূমানন্দের অবস্থা—ইহাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ—'জীতি সুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্ঞ্এং চা তাতো সন্ততরং'—অর্থাৎ, নির্ব্বাণ শুধু আনন্দই নয়। ইহা এক আনন্দোত্তর অবস্থা।

নির্ব্বাণকে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও তুরীয় অবস্থার কোঠায় টানিয়া লইয়া এক স্থানে বুদ্ধ বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, এমন এক আয়তন আছে, যাহাতে পৃথিবী নাই, জল নাই। যাহাতে আকাশের অনন্ত আয়তন নাই, বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন নাই, আকিঞ্চন্যের (অর্থাৎ, কিছুই নাই এই অবস্থার) আয়তন নাই, সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞার আয়তন নাই, ইহ-লোক নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র সূর্য্যও নাই। হে ভিক্ষুগণ, আমি ইহাকে আগমনও বলিনা, গমনও বলিনা, স্থিতিও বলিনা, চ্যুতিও বলিনা এবং উপপত্তিও বলিনা। ইহা প্রতিষ্ঠা-বিহীন, প্রবর্ত্তন-বিহীন ও নিরলম্ব, এবং ইহাই দুঃখের অন্ত।"—উদান ৮।১।

প্রেম ও সত্যনিষ্ঠাই ছিল বুদ্ধের প্রচারকদের প্রধান অস্ত্র। একবার সুরাপরন্ত নামক স্থানের এক ভক্ত বণিক স্বীয় অঞ্চলে তথাগতের ধর্ম্ম প্রচার করিতে উৎসাহী হন। কিন্তু দুরন্ত ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সেখানকার অধিবাসীরা কুখ্যাত। তাই প্রচারের প্রতিক্রিয়া কি হইবে বলা কঠিন। বুদ্ধের সহিত এ সময়ে এই প্রচারেচ্ছু ভক্তের এক চমৎকার কথোপকথন হয়। আধুনিক যুগের সত্যাগ্রহের বীজটি যেন এ সংলাপের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

ভক্তটিকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, উদ্ধত প্রতিবেশীরা তোমার নিন্দা ক'রলে তুমি কি ক'রবে বলতো?"

"ভদন্ত, আমি চুপ ক'রে থাক্‌বো।"

"তোমায় তারা প্রহার ক'রলে তখন কি ক'রবে?"

"আমি একটি হাতও তাদের বিরুদ্ধে উত্তোলন ক'রবো না।"

"যদি তারা তোমায় বধ ক'রে ফেলে?"

"মৃত্যুকে এড়াতে পারে কে? তাই আমি তাকে ডেকেও আনবো না, এড়াতেও ব্যাকুল হবো না।"

বণিক-ভক্তের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ সানন্দে সেদিন তাঁহাকে প্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন।

স্বপ্রচারিত অহিংসার মূল নীতিটি নিজের জীবনে প্রয়োগ করিয়া দেখাইতে বুদ্ধ কখনো পশ্চাদ্‌পদ হন নাই।

কোশল রাজ্যে সে সময়ে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর উৎপাত চলিয়াছে। হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। প্রজারা তাহার অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিয়াছে। রাজা প্রসেনজিৎও তাহাকে লইয়া কম বিব্রত নন, রাজসৈন্যগণ কোন মতেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছে না।

এই ভয়ঙ্কর দস্যুর নাম অঙ্গুলিমাল। নিহত ব্যক্তিদের অঙ্গুলির মালা সে গলায় পরিত, এইজন্যই তাহার এ অদ্ভুত নাম।

প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধকে তখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। একবার তিনি স্থির করিলেন, গন্তব্যস্থলে যাইবার পথে অঙ্গুলিমালের বনেরই এক রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইবেন। শিষ্যেরা বার বার নিষেধ জানাইলেন। কিন্তু বুদ্ধ অকুতোভয়। তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করাইবে এমন সাধ্যও কাহারো নাই।

রাত্রির অন্ধকারে দুর্গম বনমধ্য দিয়া তিনি চলিতেছেন। হঠাৎ চারিদিক কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল গম্ভীর কণ্ঠের এক আদেশ—"থামো"। চলিতে চলিতেই বুদ্ধ উত্তর দিলেন—"আমি তো বাবা থেমেই রয়েছি, বরং তুমিই এবার থামো।"

বলা বাহুল্য, বুদ্ধের কথার নিহিতার্থ—কামনা-বাসনার মূল বিনষ্ট

ক'রে আমি সম্বোধির মধ্যে স্থিতিলাভ ক'রেছি, আমি একেবারে থেমে গিয়েছি—কিন্তু তোমার চলা তো এখনও সমাপ্ত হয়নি।

অঙ্গুলিমাল ততক্ষণে বুদ্ধের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দস্যু আজ সত্যই বড় বিস্মিত। এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধ নরনারীর কাছে তাহার নাম ত্রাস জাগায়, রাজবাহিনী আজো তাহাকে দমন করিতে পারে নাই। অথচ এই প্রৌঢ় নিরস্ত্র সন্ন্যাসী তাহাকে মোটে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না।

বুদ্ধ ও এই দস্যুর মধ্যে সেদিন যে কথোপকথন হয়, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু দুরন্ত অঙ্গুলিমাল সেদিন এই চীবর পরিহিত প্রেমিক সন্ন্যাসীর পদে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে নাই। মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাপাত্র হাতে অঙ্গুলিমাল এই সময়ে প্রভু বুদ্ধের সাথে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।

কিছুদিন পরের কথা। এই নবলব্ধ শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজা প্রসেনজিৎ এ সময়ে প্রভুকে একদিন প্রণাম করিতে আসিলেন।

কথা প্রসঙ্গে দস্যু অঙ্গুলিমালের কথা উঠিল। কিছুদিন যাবৎ ইহাকে ধরিবার জন্য রাজা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবাহিনী এ কাজে সফলকাম হয় নাই। দস্যু অমিত বিক্রমে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছে।

বুদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই মুহূর্ত্তে যদি আমি সমবেত ভিক্ষুদের ভেতর অঙ্গুলিমালকে দেখাতে পারি, তবে আপনি তাকে নিয়ে কি করবেন ?"

প্রসেনজিৎ-এর বিস্ময় চরমে উঠিল। কহিলেন, "ভদন্ত, আমি অবশ্যই তাকে শ্রমণের প্রাপ্য সম্মান দেখাবো।"

ভিক্ষুবেশধারী প্রাক্তন দস্যু নিকটে উপবিষ্ট। বুদ্ধ নীরবে তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজা প্রসেনজিৎ তো দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর এই রূপান্তর দেখিয়া অবাক !

এ সময়ে অঙ্গুলিমালকে তিনি মূল্যবান পরিচ্ছদ ও একটি সুন্দর ভবন দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল যে আজ সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্ব মোহ হইতে সে মুক্ত। পরম পাথারের ইন্দ্রজাল স্পর্শে আজ যে সে সোনা হইয়া গিয়াছে!

অঙ্গুলিমাল তাঁহার পরিধানের ছিন্ন চীবরটি দেখাইয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এই দেখুন, আমার যা কিছু প্রয়োজন তা ঠিকই আছে, এর বেশী আর কিছুই তো আমার লাগছে না।"

নব ধর্ম্ম প্রচারের পথে বুদ্ধকে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। রক্ষণশীল আচার্য্যদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যেমন তাঁহাকে যুঝিতে হইয়াছে, তেমনই প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মনেতাদের মতবাদ খণ্ডনেও কম প্রয়াস করিতে হয় নাই।

সংস্কারবিমুখ সনাতনপন্থীর দল এবং নগ্ন শ্রমণদের বিরোধিতা তাঁহাকে বহুদিন সহ্য করিতে হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বর্ণিত আছে।

বুদ্ধের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। মাগন্দিয়া নাম্নী এক পরমা রূপসী ব্রাহ্মণ কন্যা এ সময়ে তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হন। কন্যার পিতা বিবাহের এক প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, বুদ্ধ সহাস্যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

এই তরুণীর রূপলাবণ্যের খ্যাতি ছিল অসামান্য। কিছুদিনের মধ্যে ইহার রূপে মোহিত হইয়া কৌশাম্বীরাজ উদয়ন ইঁহাকে বিবাহ করেন। মাগন্দিয়া কিন্তু বুদ্ধের সেদিনকার প্রত্যাখ্যানের অপমান কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই।

বুদ্ধ কৌশাম্বীতে আসিলেই রাণীর নিয়োজিত চরগণ তাঁহাকে নানা ভাবে অপমান ও লাঞ্ছনা করিত।

শেষকালে উত্যক্ত হইয়া শিষ্য আনন্দ একদিন বলেন, "ভদন্ত, চলুন আমরা এ দুর্ব্বৃত্তদের স্থান ত্যাগ ক'রে যাই।"

"কিন্তু আনন্দ, এর পর যেখানে আমরা যাবো, সেখানেও যদি এরকম নির্য্যাতনই শুরু হয়, তবে?"

"সে স্থানও আমরা ত্যাগ ক'রবো।"

"আবার যদি নূতন স্থানে অত্যাচার হয়?"

"অবশ্যই সে স্থানও পরিত্যাগ ক'রে আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে।"

"আনন্দ, তবেই দেখ, আমাদের এ স্থান পরিবর্ত্তন ও ঘোরাঘুরির শেষ আর হবে না। যা অন্যত্র মিলবে ভাবছো, তা' হয়তো আমরা এখানেই পাবো। জেনো, নবধর্ম্মের প্রচারে আমাদের সবাইকে যুদ্ধহস্তীর মত অবিচল না থাকলে চলবে না।"

বুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষার মহিমা ও সত্যাগ্রহের এই আদর্শ তাঁহাকে সর্ব্বত্র সেদিন জয়যুক্ত করিয়াছিল।

তাঁহার ভিক্ষু শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্থবির কাশ্যপ, সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, আনন্দ, উপালী প্রভৃতি। সাধনা ও পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া স্থবির কাশ্যপ ছিলেন অতুলনীয়, বুদ্ধ নিজে তাঁহাকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়া গিয়াছেন।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নাম ছিল উপতিষ্য ও কোলিত। উপতিষ্যের মাতার নাম রূপসারী, উত্তরকালে তাই তিনি সারিপুত্র নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন। কোলিতের গোত্র মৌদগল্য, এই গোত্র অনুসারেই তাঁহার বিশ্বখ্যাত নামকরণ সাধিত হয়।

নালন্দা গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠে, আর প্রসিদ্ধ আচার্য্য সঞ্জয়ের প্রধান শিষ্যরূপেও উভয়ে ছিলেন সুপরিচিত।

বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিৎ সেদিন রাজগৃহে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। চোখে মুখে তাঁহার এক দিব্য আনন্দের বিভা। দর্শন মাত্র উপতিষ্য চমকিয়া উঠিলেন। শুনিলেন, এই শ্রমণ বুদ্ধ তথাগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অধ্যাত্ম-জীবনে তাঁহার মিলিয়াছে অপার শান্তি।

সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন তখনি ছুটিলেন বুদ্ধের দর্শনে। চিরতরে বুদ্ধচরণে মিলিল পরম আশ্রয়।

প্রচার ও সঙ্ঘশাসনের কাজে মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু ধীরতা, বিচক্ষণতা ও তর্কনৈপুণ্যে তখনকার বৌদ্ধমণ্ডলীতে সারিপুত্রের জুড়ি ছিলনা। স্বয়ং বুদ্ধকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, "সারিপুত্রের মত ব্যক্তির পক্ষে কারো প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষ পোষণ করা সম্ভব নয়। তাঁর অন্তর এই বিপুল পৃথিবী, নগর-তোরণের সম্মুখস্থ স্তম্ভ বা হ্রদের মত ধীর, কোন আঘাতই তাঁকে কখনো বিচলিত ক'রতে পারে না।"

ভিক্ষু অশ্বজিৎকে দেখিয়া, তাঁহার মুখে বুদ্ধ-মহিমা শুনিয়া সারিপুত্র আত্মসমর্পণ করেন। এজন্য অশ্বজিতের প্রতি চিরকাল তাঁহার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না, যখন যে অঞ্চলে তিনি পরিব্রাজন করিতেন সেইদিকে সারিপুত্রকে প্রতিদিন মাথা নোয়াইতে দেখা যাইত।

প্রায়ই তাঁহাকে এভাবে কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য বস্তুর উদ্দেশে মাথা নোয়াইতে দেখা যায়। একদল জ্ঞানাভিমানী ভিক্ষু ভাবিলেন, ইহা সারিপুত্রের এক কুসংস্কার, তিনি এভাবে দিক্ দেবতার পূজা করেন। বুদ্ধের নিকট অভিযোগ করা হইল। সারিপুত্রের হৃদয়ের ভাব ও কৃতজ্ঞতার কথা বুঝিয়া নিতে বুদ্ধের ভুল হয় নাই। প্রকৃত তথ্যটি তিনি প্রকাশ করিয়া দিলে অভিযোগকারীদের লজ্জার সীমা রহিল না।

বিচারবুদ্ধিহীন ভাবাবেগ বা আতিশয্য বুদ্ধ কখনো পছন্দ করিতেন না। এজন্য একবার প্রিয় পার্ষদ সারিপুত্রকেও তিনি ভর্ৎসনা করিতে ছাড়েন নাই।

সারিপুত্র শ্রদ্ধাভরে বলিতেছিলেন, "ভদন্ত, আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রমণ কখনো এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি—মনে হয়, আর হবেনও না।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বুদ্ধ কহিয়া উঠিলেন, "সারিপুত্র, তোমার মুখে অনর্থক বড় বড় কথা বের হচ্ছে। সমস্ত বিষয়টি ভালভাবে না জেনে তুমি এমন আস্ফালন ক'রছো কেন ? তুমি কি পূর্ব্বগামী সকল অর্হতের তত্ত্ব জেনে ফেলেছো ? আগামী দিনের তথাগতদের সম্বন্ধেও কি তোমার সম্যক জ্ঞান হয়েছে ? তাছাড়া, আমার অন্তর্নিহিত তত্ত্বও কি সবই তোমার জানা ?"

সারিপুত্র লজ্জায় নতশির। উত্তর দিলেন, "তিনি এ সমস্ত কিছুই জানেন না"।

এক ভক্তের বড় বিচিত্র ভাবাতিশয্য ছিল। বুদ্ধের আননে তিনি কি এক পরম বস্তু দেখিতেন, তাহা তিনিই জানেন। একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়াই দিনের পর দিন তিনি কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহার ভাবতন্ময়তার প্রশ্রয় দেন নাই, অচিরে তাঁহাকে অপর এক সঙ্ঘারামে তিনি সরাইয়া দেন।

বিদায়কালে বিমর্ষ ভক্তটিকে বলেন, "সর্ব্বদা মনে রেখো, যে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই পায় আমার প্রকৃত দর্শন।"

মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ। তাঁহার তেজোদৃপ্ত বাণী ভিক্ষুদলের মধ্যে প্রেরণা যোগাইত, ঋদ্ধি সিদ্ধির খ্যাতিও তাঁহার কম ছিলনা। অনেক সময় নিজের অর্জ্জিত অলৌকিক শক্তি সামর্থ্য দেখাইতে তিনি ভালোও বাসিতেন।

বুদ্ধের অন্তরঙ্গ ভিক্ষু শিষ্য আনন্দ ছিলেন প্রেম, নিরভিমানতা ও আনন্দেরই এক প্রতিমূর্ত্তি। অপার নিষ্ঠা লইয়া তিনি তথাগতের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। আনন্দ একাধারে ছিলেন বুদ্ধের সেবক, আজীবন সঙ্গী ও একান্ত সাধক। প্রধানতঃ তাঁহারই মাধ্যমে বুদ্ধের নানা ধর্ম্ম-উপদেশ ও নির্দ্দেশ ভক্তদের মধ্যে অথবা বিভিন্ন বৌদ্ধমণ্ডলীতে প্রচারিত হইত। বুদ্ধ ও সঙ্ঘ, এই দুইয়ের মধ্যে আনন্দ ছিলেন এক পরমসহায়ক সেতু।

অধ্যাত্ম-সাধনার উচ্চ চূড়ায় বুদ্ধ থাকিতেন উপবিষ্ট। ত্যাগ-তিতিক্ষা

ও অনাসক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মানবিকতার ঐশ্বর্য্যে তিনি ছিলেন সদা ভরপুর।

রাজগৃহের উপকণ্ঠে দরিদ্রা পুণ্যাদাসীর বাস। সারা দিন ধান ভানিয়া সামান্য যা উপার্জ্জন হয় তা দিয়াই এ অনাথা নারীর দিন চলে। গভীর রাতে ক্লান্ত দেহে নিদ্রা যাইবার আগে রোজ তাহার চোখে পড়ে গৃধ্রকূটের বৌদ্ধাবাস। ভিক্ষুদের প্রজ্বলিত দীপশিখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে কত কি সে ভাবিতে থাকে, আর ভক্তিভরে তাহার প্রণতি জানায়।

সে দিন বুদ্ধ তাঁহার নিয়মিত ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। রাজপথের উপর পুণ্যাদাসী তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। প্রভুকে ভিক্ষা দিল নিজেরই একখণ্ড পোড়া রুটি।

রুটিখণ্ড ভিক্ষাপাত্রে পুরিয়া, আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বুদ্ধ আবার তখনি পথ চলিতে লাগিলেন। পুণ্যা বড় মুষড়িয়া পড়িল। তাইতো। রাজরাজড়া আর শ্রেষ্ঠীদের শির যাঁহার চরণে লুটায়, নির্ব্বোধের মত তাঁহাকেই সে অর্দ্ধদগ্ধ একখণ্ড রুটি ভোজন করিতে দিয়াছে!

লজ্জার তাহার সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ পরে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, নিশ্চয়ই প্রভু এ রুটি মুখে দেবেন না, পথের কাক বা কুকুরকে খাওয়াইয়া তারপর কোন ধনী ভক্তের গৃহে গিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিবেন।

অদূরে এই রাস্তার উপর রহিয়াছে এক বিরাট বৃক্ষ, ইহার নীচে গিয়া বুদ্ধ আনন্দকে তাঁহার চীবর বিছাইতে বলিলেন। এখানে বসিয়া ঐ শুষ্ক রুটিটি দিয়া তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হইল।

পুণ্যাদাসী দূরে দাঁড়াইয়া প্রভুর এ ভোজন দেখিয়াছে। এবার আর তাহার কোন খেদ নাই। মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আত্মতৃপ্তির হাসি, আর নয়নে ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

বিস্মিত ভক্তদের কাছে বুদ্ধকে সেদিন বলিতে শোনা গিয়াছিল,

"তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রেখো, দানের মূল্য ও মর্য্যাদা নিরূপিত হয় দাতার মনোভাব দিয়ে।"

বুদ্ধ সেবার এক গ্রামাঞ্চলে পরিক্রমা করিতেছেন। এখানে একটি ভক্ত দরিদ্র গৃহস্থ রোজই তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসে। সেদিন যথেষ্ট বেলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার দেখা নাই। বহুক্ষণ পরে হন্তদন্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লোকটি আসিয়া উপস্থিত। গোয়ালের গরুটি হঠাৎ হারাইয়া যাওয়ায় সে বড় বিপদে পড়ে। পথে-প্রান্তরে এই সন্ধানেই সে এতক্ষণ ঘুরিতেছিল। সেটিকে পাইবার পরই সে প্রভুর ধর্ম্মসভায় ছুটিয়া আসিয়াছে।

ভক্তটির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ দেওয়া বন্ধ করিলেন। কহিলেন, "ওহে, তোমরা তাড়াতাড়ি ওকে কিছু খেতে দাও। বড় ক্ষুধার্ত্ত হয়ে এসেছে।"

ভোজন করিয়া লোকটি কিছুটা সুস্থ হইলে বুদ্ধ আবার তাঁহার ধর্ম্মদেসনা শুরু করিলেন।

পাদপরিক্রমা হইতে ফিরিবার পথে কয়েকটি শিষ্য এই ঘটনাটি লইয়া আলোচনা করিতেছিল। কেহ কেহ এ সময়ে বিরূপ সমালোচনা করিতেও ছাড়েন নাই।

বুদ্ধের কাণে তাহাদের কথাবার্ত্তা পৌঁছে। তিনি বলিয়া উঠেন, "ভিক্ষুগণ ক্ষুধার তুল্য যন্ত্রণা কিন্তু খুব কমই আছে। তাই তো আমি ঐ ভক্তটিকে আগে খেয়েদেয়ে সুস্থ হতে দিলাম, আমার ভাষণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখলাম। ও ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত থাকলে উপদেশ শ্রবণ হতো একেবারে নিরর্থক। এতে তার মন বস্‌তো না, সে বুঝতেও পারতো না কিছু।"

ভিক্ষুদের আবাসের কাছ দিয়া বুদ্ধ সেদিন কোথায় চলিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় সেবক ভক্ত আনন্দ। হঠাৎ উভয়ের চোখে পড়িল, একটি

ভিক্ষু মৃতকল্প হইয়া গৃহ কোণে পড়িয়া আছে। সারা দেহ তাহার মলমূত্রে লিপ্ত। দুর্গন্ধে সম্মুখে দাঁড়ানো যায়না।

রোগীকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল এক দুশ্চিকিৎস্য উদরাময় রোগে সে ভুগিতেছে। বহুদিন যাবৎ এই ব্যাধির প্রকোপ চলিয়াছে, সেবাকারী ভিক্ষুগণ ক্লান্ত হইয়া আজকাল আর তাহার দিকে তেমন দৃষ্টি দেয়না।

বুদ্ধের আদেশ পাইয়া আনন্দ তখনি ভাঁড়ে করিয়া জল আনয়ন করিলেন। স্বহস্তে রোগীর মলমূত্র প্রক্ষালন করিয়া বুদ্ধ তাহাকে সযত্নে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা হইতেও দেরী হইল না।

অতঃপর সব ভিক্ষুদের ডাকিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "দ্যাখো, তোমরা সবাই ঘরসংসার ছেড়ে সঙ্ঘে প্রবেশ ক'রেছো। অসুস্থ হলে যাঁরা সেবা-শুশ্রূষা করেন, সেই জনক-জননী বা আত্মপরিজন এখানে কেউ নেই। কাজেই তোমরা যদি পরস্পরের সেবা-শুশ্রূষা না করো তবে পীড়িত অবস্থায় কি ক'রে তোমাদের চলবে ?"

সন্ন্যাসী বুদ্ধের এই মানবিকতা বোধটি তাঁহার জনক শুদ্ধোদনের মৃত্যুর দিনেও দেখিতে পাই। অন্তিম সময়ে বুদ্ধ তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে উপস্থিত হন, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সংসারের অনিত্যতার কথা পিতাকে বার-বার বলিতে থাকেন। মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া তবে তিনি কপিলাবাস্তু ত্যাগ করেন।

নবীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারকার্য্য বড় সহজে হয় নাই। প্রাচীনপন্থী সমাজনেতাদের অনেক আঘাত বুদ্ধকে সহ্য করিতে হইয়াছে, বার বার অনেক বাধার সম্মুখীন তিনি হইয়াছেন।

বুদ্ধের আচার্য্য জীবনের দশ বার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এ সময়ে খ্যাতি-প্রতিপত্তির তাঁহার সীমা নাই। চারিদিকে সর্ব্বদা ভক্ত ও মুমুক্ষুর ভীড়। ঈর্ষার বশে একদল কুচক্রী এসময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র গড়িয়া তোলে। তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক দিবার জন্য

চেষ্টিত হয়। চিঞ্চা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী ভ্রষ্টা নারীকে একাজে তাহারা নিয়োজিত করে।

বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছেন। চিঞ্চা রোজই সন্ধ্যাকালে মনোরম বেশভূষা করিয়া জেতবনে যায়, সকলে কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া থাকে। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শেষ হইয়া যায়, রাত গভীর হয়, কিন্তু এই নারীর উঠিবার নামটি নাই। ইহার পর ধীরে ধীরে নিকটস্থ এক পরিচিত গৃহে গিয়া সে রাত কাটায়, প্রভাত হইলে জেতবনের রাস্তা ধরিয়াই ঘরে ফিরিয়া আসে।

ভক্তেরা দলে দলে বুদ্ধের প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসভায় যোগ দিতে আসে, চিঞ্চার সাথে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। পরিচিত কেহ কেহ হয়তো প্রশ্ন করিয়া বসে, "কিগো, এমন ভোরবেলায় এদিকে রোজ কোথা থেকে আস? সারা রাত থাকোই বা কোথায়?"

চিঞ্চা রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া সংক্ষেপে শুধু বলে, "সে সব কথায় তোমাদের কাজ কি বাপু?"

ক্রমে একদল লোক বেশ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, বেশ কানাকানিও শুরু হইয়া যায়।

কয়েক মাস পরের কথা। বুদ্ধ সেদিন বহু দর্শনার্থীর সম্মুখে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন। চিঞ্চা হঠাৎ ঝড়ের মত সভাগৃহে ঢুকিয়া পড়িল। উত্তেজিত স্বরে কহিতে লাগিল, "শ্রমণ, তুমি তো পরমানন্দে বসে বসে বেশ উপদেশ দিচ্ছো। এদিকে আমি তো মরতে বসেছি। যে ঘরে তোমার সঙ্গে এতকাল রাত কাটিয়েছি, তা বড় ছোট, সন্তান প্রসবের উপযোগী মোটেই নয়। আমি গরীব মানুষ, টাকাকড়ি পাবো কোথায়? ঘর ভাড়া করার সামর্থ্যই বা আমার কই? তোমার ভক্তদের মধ্যে তো কত বড় বড় শ্রেষ্ঠী রয়েছে। তাদের কাউকে ব'লে আমার থাকবার একটা ভালো ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

সারা ঘর নিস্তব্ধ। কাহারো মুখে একটি কথাও সরিতেছে না, শুধু এ উহার মুখের দিকে চাহিতেছে।

চিঞ্চার এ নাটকীয় আগমন, এ হীন কলঙ্কের অভিযোগ বুদ্ধের অন্তরে কিন্তু কোন চাঞ্চল্যই আনিল না। শান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভগ্নি, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যে, তা বেশ ভালো ক'রে তুমি নিজেই জানো, আমারো জানা আছে"

এ কথায় সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, উত্তেজিতভাবে নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া বুদ্ধকে গালিগালাজ করিতে থাকে।

ক্ষণকাল পরেই হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠে। চিঞ্চার উদরে আবদ্ধ একটি কাঠের হাঁড়ি এ সময়ে মেঝের উপর সশব্দে পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে একরাশ জীর্ণ বস্ত্র ও দড়িদড়া। এইগুলি জড়াইয়া বাঁধিয়া এক আসন্নপ্রসবা নারীর অভিনয় সে এতক্ষণ করিতেছিল।

বিরুদ্ধবাদীদের হীন ষড়যন্ত্রের কথা সেদিন এইভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

আর একবারও বুদ্ধকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তৎপর হয়।

সুন্দরী নামে এক তরুণী পরিব্রাজিকা সে সময়ে শ্রাবস্তীতে আসিয়া বাস করিতেছিল। দুষ্টের দল এই নারীকে হাত করে, বুদ্ধের চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক রটানোর জন্য তাহাকে প্ররোচনা দেয়।

সুন্দরী জেতবনে যাতায়াত করিতে থাকে। স্বেচ্ছামত লোকের কাছে সে বলিয়া বেড়ায়—বুদ্ধ তাহাকে বড় ভালবাসেন, আর তাঁহার সঙ্গে গন্ধকুটিতে রোজই সে মহা আনন্দে রাত্রি যাপন করে।

সুন্দরীর এই মিথ্যা উক্তির সাথে মিলিত হয় দুষ্টদের নানা জঘন্য অপপ্রচার। অতঃপর কুচক্রীর দল আরো এক ধাপ আগাইয়া যায়। তাহারা নিজেরাই সুন্দরীর প্রাণনাশ করে, তারপর রটাইয়া দেয়—গোপন কলঙ্কের কথা প্রকাশ পাইবে এই ভয়ে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যেরা এই যুবতীকে হত্যা করিয়াছে।

পূর্ব্ব পরিকল্পনামত মৃতদেহটি জেতবনের প্রান্তে, এক আবর্জ্জনা-স্তূপের নীচে তাহার লুকাইয়া রাখে। তারপর কিছুটা খোঁজাখুঁজির অভিনয়ের পর টানিয়া বাহির করে।

বুদ্ধের প্রতিপত্তিশালী ভক্তেরা এবার এই দুষ্টদের দমন ও মুখোস খোলার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। রাজার কাছে জানানো হইল, বুদ্ধ বা বুদ্ধভক্তেরা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, এ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা।

রাজাদেশে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা হইল। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হইতে অতঃপর আর বেশী দেরী হয় নাই। নগর কোতোয়ালের চরেরা একদিন সংবাদ আনিল, কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল ধরণের লোক সুরার দোকানে বসিয়া খুব মাতলামি করিতেছে। একেবারে প্রমত্ত অবস্থা। চীৎকার করিয়া তাহারা একে অন্যের ঘাড়ে সুন্দরী-হত্যার দায়িত্ব চাপাইতে চাহিতেছে।

রাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ এই লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করেন। তাহাদের স্বীকারোক্তির ফলে ষড়যন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানা যায়, বিচারে এই দুর্ব্বৃত্তদের প্রাণদণ্ড হয়।

বুদ্ধ নিজে ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, তদুপরি এক মহান নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন তিনি করিয়াছেন। এজন্য তৎকালীন ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁহার প্রতি বড় আকৃষ্ট ছিলেন, সম্মানও যথেষ্ট প্রদর্শন করিতেন। শুধু রাজরাজড়াদের মধ্যেই বুদ্ধের এ মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ ছিল না—শ্রেষ্ঠী, বণিক ও সাধারণ মানুষের সমাজেও বুদ্ধ ও তাঁহার পরিকরগণ ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একদিন প্রভাতে প্রভু বুদ্ধকে দর্শন করিত গিয়াছেন। ছত্রপাণি নামক একটি ভক্ত রাজার পরিচিত, সেও এখানে তখন বসিয়া আছে। প্রসেনজিৎ লক্ষ্য করিলেন, ছত্রপাণি তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান নাই, রাজোচিত কোন সম্মানও দেখাইলেন না।

মুখে কোন কিছু না বলিলেও অভিমানাহত রাজার চোখে-মুখে তখন অসন্তোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

রাজা যে রুষ্ট হইয়াছেন, বুদ্ধের দৃষ্টিতে তাহা এড়ায় নাই। তিনি বরং চতুর হাসি হাসিয়া ভক্ত ছত্রপাণির নানা গুণপনার কথাই বার বার সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। প্রসেনজিৎ সেদিন তাঁহার পাত্রমিত্রসহ মহাসমারোহে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। হঠাৎ ছত্রপাণির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, অদূরে রাস্তার কোণ ঘেঁষিয়া তিনি চলিয়াছেন। অনুচর পাঠাইয়া তখনি তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন।

এবার ছত্রপাণির আচরণ একেবারে বিপরীত। নিজের পাদুকা ও ছত্রটি ত্যাগ করিয়া যুক্তকরে তিনি রাজসমীপে উপস্থিত।

প্রসেনজিৎ হাসিয়া কহিলেন, "কিহে ছত্রপাণি, এতদিন পরে এবার দেখ্ছি তোমার স্মরণ হয়েছে যে, আমি তোমাদের এ রাজ্যের রাজা।"

সবিনয়ে ছত্রপাণি উত্তর দিলেন, "মহারাজের কথা বিস্মৃত হবো, তাও কি কখনো হয়? আগেও আপনার কথা স্মরণে ছিল, এখনো আছে, চিরকালেই থাক্‌বে।"

"তাই নাকি হে? সেদিন প্রভু বুদ্ধকে দর্শন ক'রতে গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো। কিন্তু কই, তুমি তো আমায় দেখে গাত্রোত্থান করোনি? অভ্যর্থনাও জানাওনি?"

"সেদিন আমি যে বসেছিলাম রাজার চাইতেও শ্রেষ্ঠতর পুরুষ, প্রভু বুদ্ধের কাছে। তাই সেদিন আপনাকে সম্মান দেখানো সম্ভব হয়নি। আজ এসেছি আমাদের রাজ-সন্নিধানে, এখানে রাজার প্রাপ্য সম্মান আমায় দেখাতেই হবে। নইলে যে অপরাধী হবো।"

প্রসেনজিৎ এ উত্তরে বড় প্রসন্ন হইলেন।

রাজগৃহের গণিকা আম্রপালীর নাম এক সময়ে সারা উত্তর ভারতে পরিচিত ছিল। রূপ-যৌবনে ও সঙ্গীত-পারদর্শিতায় তৎকালে তাহার

জুড়ি মিলিত না। রাজা বিম্বিসার ও শ্রেষ্ঠীদের অনুগ্রহে আম্রপালী বিপুল ধনসম্পদের অধিকারিণী হইয়া উঠে। শেষ জীবনে, বৃদ্ধা বয়সে প্রভু বুদ্ধকে সে দর্শন করিতে আসে, আর এই দর্শনের মধ্য দিয়াই ঘটে এক অপূর্ব্ব রূপান্তর।

আম্রপালীর বড় ইচ্ছা, শিষ্য ও ভক্তজনসহ বুদ্ধকে তাহার আবাসে একদিন ভোজন করায়। সেদিন প্রভু তাহার এ আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাই হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাড়াতাড়ি শিবিকারোহণে সে ঘরে ফিরিতেছে।

পথে লিচ্ছবি-বংশীয় একদল বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা। ইহাদের অনেকে তাহার পূর্ব্বপরিচিত। কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল, আম্রপালী বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বহুতর ভক্ত সমভিব্যাহারে প্রভু আসিতেছেন। তাই আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই।

লিচ্ছবীদেরও হঠাৎ জেদ চাপিয়া গেল, বুদ্ধকে তাহারা আজ সশিষ্য ভোজন করাইবে। তাহারা ধরিয়া বসিল, "আম্রপালী, আমরা এতদূর থেকে আস্‌ছি, প্রভুর আজকের নিমন্ত্রণটি তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। এজন্য লক্ষ টাকা তোমায় দেব।"

"লক্ষ টাকা কেন, সারা বৈশালী রাজ্য দান ক'রলেও আজকের দিনের সেবার অধিকারটি আমি ছাড়তে পারবো না। আপনারা আমায় মার্জনা করুন।"

আম্রপালীর শিবিকা দ্রুত চলিয়া গেল। লিচ্ছবীরা এ সময়ে খেদোক্তি করিতেছিল, "প্রভু বুদ্ধের মহিমা ছাখো। আমরা সবাই আজ কিন্তু গণিকা আম্রপালীর কাছে হেরে গেলাম।"

নব ধর্ম্মের প্রচারে বুদ্ধের উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতা ছিল অসাধারণ। বৎসরের পর বৎসর তিনি এ কাজে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। চরিত্রের মাধুর্য্যে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও ধর্ম্মদেসনার মাধ্যমে সহস্র সহস্র মানুষকে নিজের কাছে তিনি টানিয়া নিয়াছেন।

বুদ্ধের এই প্রবল আকর্ষণী-শক্তির কথা সেকালের সাধকসমাজে সুবিদিত ছিল। এক সন্ন্যাসী সাধক এক সময়ে জৈন-আচার্য্য মহাবীরকে সতর্ক করিয়া কহিয়াছিলেন, "শ্রমণ-গৌতম লোককে এক অদ্ভুত মায়ায় মোহিত ক'রে আত্মসাৎ করেন, নিজের শিষ্য ক'রে নেন। দেখ্‌বেন, আপনার শিষ্যরা যেন কখনো তাঁর সান্নিধ্যে না যায়।"

বিরাট এক ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধ ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলেন। আর এই সঙ্ঘের সম্মুখে নিজেকে স্থাপন করেন এক আদর্শ ভিক্ষুরূপে। প্রসিদ্ধ আচার্য্য ও টীকাকার বুদ্ধঘোষ প্রভু বুদ্ধের দিনচর্য্যার এক বিবরণ দিয়াছেন।—

প্রত্যূষে উঠিয়া চীবর পরিধান করিয়া তিনি ধ্যানাবিষ্ট হন। তারপর শুরু হয় তাঁহার পাদ-পরিক্রমা ও ভিক্ষা। এক একটি পল্লীতে এক এক দিন ভ্রমণ করেন, প্রতি গৃহের সম্মুখে গিয়া নতশিরে ভিক্ষা-পাত্র হাতে দণ্ডায়মান হন। কোন গৃহী ভক্তের বাড়ীতে আগে হইতে নিমন্ত্রণ থাকিলে পর্য্যটনের শেষে সেখানেই আহার ক্রিয়া সমাপন করেন। সারাদিনে একবারের বেশী ভোজন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

দ্বিপ্রহরে নিজেদের ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য গ্রহণের শেষে ভিক্ষুরা প্রভুকে ঘিরিয়া বসেন, উপদেশ ও ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করেন।

সায়ংকালীন ধ্যানের পর সবাইকে প্রভুর সন্নিধানে আসিতে হয়, নিজ নিজ ধ্যানের অভিজ্ঞতা তাঁহারা সেখানে বর্ণনা করেন। প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়। এবার বুদ্ধ নিজের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হন, নিমজ্জিত হন ধ্যানের গভীরে।

ভিক্ষুরা প্রকৃত ত্যাগবৈরাগ্যের পথে চলিয়াছে কিনা, ধ্যানধ্যারণার ধারা অব্যাহত আছে কিনা, এ সম্পর্কে বুদ্ধের দৃষ্টি ছিল সদা সতর্ক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের আচরণ তিনি লক্ষ্য করিতেন, সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতিও তাঁহার চোখ এড়াইতে পারিত না।

রাজগৃহে থাকিতে বুদ্ধের একবার শূলব্যাধি হয় এবং তখন তিনি

ত্রিকটু-যাগু খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন। সেবক-ভক্ত আনন্দ তাই সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা হিসাবে পূর্ব্বহইতেই কিছুটা ত্রিকটু জোগাড় করিয়া রাখেন। সেবার প্রভুর অসুখের সময় চট্ করিয়া তিনি ঐ ত্রিকটু-যাগু পাক করিয়া আনিলেন।

পথ্যটি সম্মুখে ধরামাত্র বুদ্ধের সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলেন, "আনন্দ, এত তাড়াতাড়ি এ সব কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রলে ?"

উত্তর হইল, "ভদন্ত, ত্রিকটু আমি সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। উদর-শূলে আপনি মাঝে মাঝে কষ্ট পান, তাই এগুলো আগে থেকেই কাছে রেখে দিয়েছিলাম।"

"না আনন্দ, এ কখনো আমার অভিপ্রেত নয়। আচ্ছা বলতো, ভিক্ষু কেন কোন বস্তু এভাবে সঞ্চয় ক'রে রাখবে ? নিজ প্রয়োজনে রান্নাই বা ক'রবে কেন ? ত্যাগব্রতী ভিক্ষুর পক্ষে এ যে এক মস্ত অপরাধ। ঘোরতর অন্যায় তুমি ক'রেছো।"

এই তীব্র তিরস্কারে আনন্দের অনুতাপের সীমা রহিল না। প্রভুর সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সংসার অনিত্য ও দুঃখময়, এ কথা বুদ্ধ সুযোগ পাইলেই তাঁহার ভিক্ষুদের মনে গ্রথিত করিয়া দিতেন, আর এ সুযোগ সাধারণতঃ তিনি পাইতেন কাহারো মৃত্যু ঘটিলে।

রাজগৃহ নগরে গণিকা শ্রীমতীর তখন খুব নাম ডাক। ভক্তিমতী ও দানশীলা বলিয়াও সকলে তাহাকে জানে। সাধু সন্ন্যাসীদের সেবায় ও ভিক্ষাদানে তাহার মহা উৎসাহ। সঙ্ঘের এক তরুণ ভিক্ষু এ সব কথা শুনিয়া সেদিন তাহার ভবনে গিয়া উপস্থিত।

শ্রীমতী তখন বড় অসুস্থ, স্বয়ং আসিয়া এই ভিক্ষুর ভোজনের সময় তত্ত্বাবধান করিতে পারে নাই। দাসীরাই অতিথিকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করায়, তারপর তাঁহাকে উপস্থিত করে শ্রীমতীর শয্যাকক্ষে।

তরুণী গণিকার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া অতিথি ভিক্ষু সেদিন কিন্তু সংযমের ব্রত রক্ষা করিতে পারে নাই, মনে তাহার তীব্র চিত্ত-চাঞ্চল্য ও কাম-বিকার দেখা দেয়।

সঙ্ঘারামে ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু মনটি তাহার পড়িয়া থাকে গণিকা শ্রীমতীর কাছে। রূপের মোহে একেবারে সে আত্মহারা, উন্মত্ত প্রায়। তপস্যার দিকে দৃষ্টি নাই, আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া যায়। দিনের পর দিন সে শয্যাতেই পড়িয়া থাকে।

শিষ্যের এই ভাবান্তর বুদ্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু কোন কথাই তিনি বলিলেন না।

এদিকে আরো কিছুদিন রোগ ভোগ করার পর আকস্মিকভাবে শ্রীমতীর মৃত্যু ঘটিল।

রাজ্যের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উত্তরাধিকারীহীন বারাঙ্গনাদের শব সৎকার রাজসরকারকেই করিতে হয়। তাহারই তোড়জোড় চলিতেছে। এমন সময় বুদ্ধ সম্রাট বিম্বিসারকে অনুরোধ জানাইলেন, শ্রীমতীর মৃতদেহের সৎকার যেন কয়েকটা দিন স্থগিত রাখা হয়। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধ রক্ষিত হইল।

এবার বুদ্ধ ঐ মোহান্ধ ভিক্ষু ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়া শ্রীমতীর ভবনে গেলেন। সম্রাট বিম্বিসারও স্বয়ং সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দেখা গেল, মৃতদেহটি ইতিমধ্যে পচিয়া উঠিয়াছে, গলিত মাংসস্তূপের মধ্যে কিল্‌বিল্‌ করিতেছে ঘৃণ্য কীটের দল।

বুদ্ধ এই শবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিম্বিসারকে কহিলেন, "মহারাজ, আমায় বলুন তো, প্রসিদ্ধা গণিকার এই দেহের জন্য আজ লোকে কি পরিমাণ অর্থ দেবে?"

"ভদন্ত, অর্থ দেওয়া দূরে থাক্‌, এখন কেউ এ দেহ স্পর্শ ক'রতেও চাইবে না।"

ভিক্ষুদের দিকে ফিরিয়া বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "চেয়ে দ্যাখো, যে রূপলাবণ্যময় নারীদেহটির প্রতি লোকের এমন প্রবল আকর্ষণ ছিল,

আজ তার কি শোচনীয় পরিণাম। সব দেহেরই বিনাশ এমনি অনিবার্য্য-রূপে এসে থাকে। ভিক্ষুগণ, এ থেকে তোমরা ইহলোকের অনিত্যতা উপলব্ধি ক'রতে চেষ্টা করো।"

সেদিনকার এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া ভিক্ষু-শিষ্যটির রূপজ মোহ কাটিয়া যায়।

প্রধান পার্ষদ মৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্রের মৃত্যুর দিনেও ঠিক এমনিভাবে জগতের দুঃখময়তা ও বিনাশশীলতার কথাটি সকল ভক্তের হৃদয়ে বুদ্ধ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

গোড়ার দিকে নবীন ভিক্ষুদের মধ্যে মাঝে মাঝে বাদ-বিসম্বাদ দেখা দিত। একবার বুদ্ধ কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছেন, এ সময়ে স্থানীয় ভিক্ষুদের আত্মকলহ তীব্র আকার ধারণ করে।

ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছে, নির্ব্বাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কেন এই আচরণ? বার বার তিনি ভিক্ষুদের বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাদের অন্তরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলিল।

ক্ষুব্ধচিত্তে বুদ্ধ এ সময়ে কিছুদিনের জন্য এক নির্জ্জন বনে চলিয়া যান, একাকী সেখানে বর্ষা যাপন করেন। ধ্যানানন্দে ও আত্মসমাহিত অবস্থায় দিনগুলি তাঁহার অতিবাহিত হইতে থাকে।

বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবগ্‌গ-এ আছে, বুদ্ধের এ নিভৃত বাসের দিনে তাঁহার সঙ্গী ছিল একটি বন্য হস্তী। এখানে বেশীর ভাগ সময় বুদ্ধ থাকিতেন ধ্যানস্থ, আর এই দুর্গম অরণ্যে তাঁহার একমাত্র অনুচর ও সেবক ছিল এই জীবটি। নিকটস্থ সরোবর হইতে তাঁহার জন্য সে জল আনিয়া দিত। মাঝে মাঝে সন্নিহিত গ্রামে বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইতেন, আর একনিষ্ঠ অনুচরের মত এই বন্য হস্তীটি চলিত সঙ্গে সঙ্গে, শুঁড় দিয়া বহন করিত তাঁহার ভিক্ষাপাত্র। বিস্মিত গ্রামবাসীরা এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য ভীড় করিত।

বুদ্ধের নির্জ্জনবাস কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিয়া আসারপর ভিক্ষুদের চৈতন্যোদয় হয়, বিবাদ মিটিয়া যায়। অতঃপর আনন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভিক্ষুগণ এই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সকলের মিনতির ফলে বুদ্ধ আবার কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন!

রাজগৃহের নিকট ঋষিগিরিতে বসিয়া মৌদ্‌গল্যায়ন সেবার কঠোর তপস্যা করিতেছেন। গিরিগুহা হইতে বাহিরে বেশী যান না, একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সাধনারত রহিয়াছেন। বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীরা দেখিল, এ এক প্রকাণ্ড সুযোগ। মৌদ্‌গল্যায়ন বৌদ্ধ সঙ্ঘের এক বৃহৎ স্তম্ভ, তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিলে নব ধর্ম্মকে হীনবল করা যায়।

ইহাদের আকস্মিক আক্রমণে মৌদ্‌গল্যায়ন নিহত হন।

সম্রাটের চরদের চেষ্টায় এই পাষণ্ডের দল অচিরে ধরা পড়ে, বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়।

মৌদ্‌গল্যায়নের হত্যার সংবাদ বুদ্ধের কাছে পৌঁছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদের এই শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে কোন চাঞ্চল্যই তাঁহার ভিতর দেখা গেল না। সব কথা শুনিয়া নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে শুধু কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, একথা ভুললে চলবে না। আমাদের পরম সহায়ক বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়নের এ ধরণের মৃত্যু ঘটেছে তাঁর নিজেরই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে। মানুষের নিজের কর্ম্মই নিয়ন্ত্রিত করে তার জীবনের প্রবাহ। কাজেই মৌদ্‌গল্যায়নের জন্য আমাদের শোক করার বা তাঁর নিহত হবার সংবাদে দুঃখ করবার কিছু নেই।"

সারিপুত্রের দেহত্যাগের দিনেও বুদ্ধ ছিলেন এমনি শান্ত, অবিচল। মহাজ্ঞানী, মহাধীর এই পরিকর ছিলেন সঙ্ঘমণ্ডলীর মধ্যমণি, বুদ্ধের তিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সেদিন প্রভু বুদ্ধ শিষ্য-পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। ধর্ম্ম উপদেশ ও তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলিতেছে, এমন সময় সারিপুত্রের ভ্রাতা দুঃসংবাদ লইয়া সেখানে উপস্থিত। মৃতের পরিত্যক্ত

চীবর ও ভিক্ষাপাত্রটি বুদ্ধের চরণতলে রাখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

শান্ত স্বরে, গম্ভীরভাবে প্রভু বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত প্রিয়তম শিষ্যের প্রশস্তি বেশ কিছুক্ষণ করিলেন। কহিলেন, "ধর্ম্মের জন্য সারিপুত্র সারাজীবন ভরে বিপুল ত্যাগ স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। আমার নব ধর্ম্মের প্রচারে তিনি দেখিয়ে গেছেন পৃথিবীর মত ধৈর্য্য আর শৃঙ্গ-হীন বৃষ—অর্থাৎ হিংসাবিরহিত বৃষের মত বিপুল শক্তি।"

চীবর ও ভিক্ষাপাত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বুদ্ধ কহিলেন "ভিক্ষুগণ, যে মহান পুরুষ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জন্য অদম্য উৎসাহ নিয়ে এই সেদিন এত কাজ ক'রে গিয়েছেন, এই ছ্যাখো, আজ তাঁর এই ভঙ্গুর জিনিষ ছু'টিমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে।"

ভক্তদের চোখে তখন অশ্রুর ধারা বহিতেছিল।

কাহারো মৃত্যু ঘটিলে বুদ্ধ এমনিভাবে জীবনের নশ্বরতার কথাটি শিষ্যদের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেন। মাঝে মাঝে ভিক্ষুদের তিনি নির্দ্দেশও দিতেন, "যাও শ্মশানে গিয়ে কিছুক্ষণ উপবেশন কর, চিতাগ্নিতে মানুষের পরম প্রিয় দেহ কিভাবে ভস্মীভূত হয়, ধূম্রাকারে উত্থিত হয়ে আকাশে একেবারে বিলীন হয়ে যায়, এ সব লক্ষ্য কর। সংসারের অনিত্যতার কথা উপলব্ধি ক'রে তোমরা সবাই নির্ব্বাণলাভের জন্য তৎপর হও।"

শ্রাবস্তীর এক সঙ্ঘারামে বুদ্ধ সেবারকার বর্ষা যাপন করিতেছেন। কিসা-গৌতমী নামে এক পুত্রশোকাতুরা মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে একদিন সেখানে উপস্থিত। সদ্যমৃত সন্তানকে গৃহে রাখিয়া সেখানে সে ছুটিয়া আসিয়াছে। শুনিয়াছে, প্রভু বুদ্ধ এক শক্তিধর মহাপুরুষ, মানবের জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর ছুঃখ মোচনের জন্য তিনি অবতীর্ণ।

ছুঃখিনী নারী আর্ত্তস্বরে বুদ্ধের চরণ ছু'টি চাপিয়া ধরিল। প্রভুকে তাহার এই মৃত পুত্রটিকে আজ কৃপা করিয়া বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে।

অলৌকিক শক্তিই যদি না থাকে, শবদেহ যদি জীবন্ত করিয়া না তুলিতে পারেন তবে কি মূল্য এই ধর্ম্মদেসনার ? কেনই বা সহস্র সহস্র লোক তাঁহার পিছনে ছুটিবে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিখারী সাজিবে ?

উত্তর হইল, "ভগ্নি, তোমার মৃত পুত্রকে আমি বাঁচাতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমায় একটা কাজ ক'রতে হবে। এমন কোন গৃহ থেকে একমুষ্টি সর্ষপ তুমি নিয়ে এসো, যে গৃহে মানুষ কোনদিন মরেনি, শোকের কালো ছায়া যেখানে পড়েনি।"

নয়নের জল মুছিয়া শোকাকুলা নারী তখনি বাহির হইয়া পড়িল। যেভাবেই হোক্ এ সর্ষপ আজ তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে, পুত্রকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে।

দ্বারে দ্বারে সে ভিক্ষা চাহিয়া ফিরে এক মুষ্টি সর্ষপ। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে প্রশ্ন করে, "ওগো, আগে আমায় ঠিক ক'রে ব'ল তোমরা তো কেউ কখনো শোকের আঘাত পাওনি ? কেউ তো মরেনি কখনো এ পরিবারে ? মরে থাক্‌লে, এ ভিক্ষা নেওয়া যাবে না।"

সারা দিন এই সরিষা সংগ্রহের চেষ্টায় কাটিয়া যায়। অনাহারে, পথশ্রমে দেহ অবসন্ন। শত শত গৃহ তো দেখা হইল, কিন্তু কোথাও সে শুনিতে পাইল না যে, সে গৃহ শোকের কালিমা পড়ে নাই। সত্যিই তো, এ বিশ্বসংসারে সবারই তো এই একই দুর্দ্দশা ! দুঃখ, শোক ও মৃত্যুকে অতিক্রম কেহই যে করিতে পারে না !

মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতার মূল কথাটি কিসা-গৌতমীর অন্তরে এবার গাঁথা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়াছে মুমুক্ষার তীব্র ব্যাকুলতা। কোথায় তবে পরিত্রাণ ? কে দিবে মুক্তিপথের সন্ধান ?

কিসা-গৌতমীর হৃদয়পটে এবার ভাসিয়া উঠিল প্রভু বুদ্ধের প্রশান্ত নয়ন আর তাঁহার সেই অবিস্মরণীয় করুণাঘন মূর্ত্তি। দ্রুত পদে সে সঙ্ঘারামে ফিরিয়া আসে, লুটাইয়া পড়ে বুদ্ধ তথাগতের চরণতলে। মৃত পুত্রের জীবনভিক্ষা নয়, এবার সে মিনতি করিতে থাকে মুক্তি-ভিক্ষার জন্য।

পুত্রের দেহ-সংকার শেষ করিবার পর কিসা-গৌতমী চিরতরে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে।

বুদ্ধের ধর্ম্ম ছিল পরম উদার ও সর্ব্বজনীন। জাতি বর্ণের ভেদ অথবা স্ত্রী-পুরুষের কোন পার্থক্য সেখানে মানা হইত না। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাস নিক্, ঘর-সংসার ছাড়িয়া দলে দলে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করুক, গোড়ার দিকে তথাগত তাহা চাহেন নাই। পরে কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়, স্ত্রীলোকদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও সঙ্ঘে প্রবেশের তিনি অনুমতি দেন।

বৈশালীর কূটাগারশালায় সে'বার বুদ্ধ অবস্থান করিতেছেন। এ সময়ে একদল, শাক্যনারীকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রজাবতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই দৃঢ় পণ ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিবেন—এজন্য বুদ্ধের অনুমতি তাঁহারা চান। পদব্রজে দীর্ঘ পথ তাঁহাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ক্লান্ত, ধুলিমলিন দেহে বুদ্ধের দুয়ারে আসিয়া সকলে সেদিন দাঁড়াইলেন! তাঁহাদের জানা অছে, সঙ্ঘে নারীদের প্রবেশ সম্পর্কে প্রভু তেমন উৎসাহী নন। তাই মনে বড় ভয়, অনুমতি মোটেই মিলিবে কিনা কে জানে।

মহাপ্রজাবতী শুধু বুদ্ধের বিমাতাই নন, শিশুকালে বুকে করিয়া তাঁহাকে তিনি পালন করিয়াছেন। সেই মহীয়সী নারীই আজ প্রার্থিনী সঙ্গিনীগণসহ উপস্থিত।

আনন্দ তাঁহাদের একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তখনই বুদ্ধের কাছে ছুটিয়া গেলেন। কহিলেন, "ভদন্ত, মহাপ্রজাবতী সদলবলে আজ সঙ্ঘারামে এসে পৌঁছেছেন। নারীদের জন্য ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গঠনের অধিকার তিনি চান। আপনি কৃপা ক'রে আজ সে অনুমতি দিন।"

বুদ্ধ সংক্ষেপে কহিলেন, "না আনন্দ তা হয় না, তুমি এ নিয়ে আমায় অনুরোধ ক'রো না।"

আনন্দ স্বভাবতঃই বড় মানব-প্রেমিক। প্রভুর এ উত্তর শুনিয়া

মনে তাঁহার আঘাত লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভদন্ত, কামনা-বাসনা ত্যাগ ক'রে, সংসার ছেড়ে নারীরা যদি সন্ন্যাস নেন, তবে কি তাঁরা অর্হৎ হতে পারেন না ? আপনার প্রদর্শিত পথে সাধনা ক'রে তাঁরা কি নির্ব্বাণ পাবেন না ?"

"আনন্দ, তোমার কথা ঠিক, এ পথে নির্ব্বাণ লাভ তা'রা ক'রবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঙ্ঘ ও সমাজ এই দুইয়েরই কল্যাণের কথা, ভবিষ্যতের কথা আমি ভাব্‌ছি।"

আনন্দ প্রভুকে মিনতি করিয়া কহিলেন, "ভদন্ত, যে করুণা নিয়ে মানব-কল্যাণে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তা কি শুধু পুরুষেরাই পাবে ? মানবজাতির অপরার্দ্ধ, নারীরা তা থেকে থাক্‌বে বঞ্চিত ? আপনার ধর্ম্মে কেন এ বৈষম্য রাখা হবে ? তা ছাড়া, ভেবে দেখুন, আজ স্বয়ং মহাপ্রজাবতী আপনার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তথাগতকে আপন স্তন্য দিয়ে যিনি পালন ক'রেছেন, ভিক্ষুসঙ্ঘের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ ক'রে রাখা কি সমীচীন হবে ? তিনি নারীজাতির সঙেঘ প্রবেশের অধিকার চাচ্ছেন। কৃপা ক'রে আপনি এতে স্বীকৃতি দিন।"

নারীদের আবেদন বুদ্ধকে সেদিন মানিয়া লইতে হয়। আটটি বিশেষ ধর্ম্ম-নিয়ম পালনের সর্ত্তে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের অনুমতি সেদিন তাঁহাদের তিনি দেন।

ভিক্ষু সঙেঘর মধ্যে দেবদত্ত ছিলেন স্বাতন্ত্র্যবাদী, উচ্চাশা ও কর্ত্তৃত্বের লিপ্সাও ছিল তাঁহার প্রবল। বুদ্ধ এ সময়ে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন বয়স সত্তরেরও বেশী, দেহ আর পূর্ব্বের মত তেমন কর্ম্মক্ষম নয়। দেবদত্ত এ সুযোগে নিজের এক দল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।

একদিন ঔদ্ধত্য তাঁহার চরমে পৌঁছিল। রাজগৃহের এক ধর্ম্মসভায় বুদ্ধকে তিনি বলিয়া বসিলেন, "ভদন্ত, বার্দ্ধক্যের ভারে আপনার শরীর এখন জীর্ণ, অপটু হয়ে পড়েছে। এবার আমার ওপর সঙেঘর ভার অর্পণ ক'রে আপনি অবসর নিন।"

দেবদত্ত যে আত্মম্ভরী ও প্রভুত্বপ্রিয় একথা বুদ্ধ ভাল করিয়াই জানেন। তাই স্পষ্টভাষায়, কিছুটা রুক্ষস্বরে তাঁহাকে সেদিন জানাইয়া দিলেন, "দেবদত্ত, সঙেঘর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য চরিত্রের যে উদারতা ও মহত্ব থাকা প্রয়োজন, তা তুমি অর্জন করতে পারোনি। আগে নিজের প্রস্তুতির দিকে দৃষ্টি দাও।"

দেবদত্তের আক্রোশ আরো তীব্র হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন, যে কোন উপায়ে বুদ্ধকে সঙেঘর নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিবেন।

স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজকুমার অজাতশত্রুকে দেবদত্ত হাত করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলেন, "সম্রাট বিম্বিসার বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু আজো তাঁর সিংহাসন ছাড়ার নামটি নেই। অথচ কুমার, এদিকে আপনার বয়স অনেক হয়ে গেল। বলুন তো, রাজত্বের সুখৈশ্বর্য্য আর কবে ভোগ ক'রবেন ?"

ষড়যন্ত্র ঠিক হইল, রাজকুমার সম্রাটকে হত্যা করিবেন আর দেবদত্ত নির্ম্মম হাতে সরাইয়া দিবেন বুদ্ধকে। এই ভাবে অবিলম্বে রাজশক্তি ও ধর্ম্মসঙেঘর শাসন তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে।

রাজমন্ত্রীদের সতর্কতার ফলে অচিরে পিতৃদ্রোহী অজাতশত্রুর চক্রান্ত ফাঁস হইয়া যায়, তিনি ধরা পড়েন। কিন্তু বিম্বিসার সেদিন তাঁহার এই বিপথগামী পুত্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ তখন গৃধ্রকূট পাহাড়ে রহিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহার জীবননাশের জন্য দেবদত্ত একদল তীরন্দাজ পাঠাইয়া দেন। নির্দ্দেশ থাকে, সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র বুদ্ধকে তাহারা হত্যা করিবে।

পাদচারণা করিতে করিতে পাহাড় হইতে বুদ্ধ নীচে নামিতেছেন, আততায়ীরা তাঁহার অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া আছে। অদূরে দেখা দিল তাঁহার সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তি, এক মুহূর্ত্তে সেখানে ঘটিয়া গেল এক ইন্দ্রজাল। তীরন্দাজদের অন্তরে হঠাৎ এক তীব্র অনুতাপের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। ছার অর্থের জন্য এই দিব্যকান্তি মহাপুরুষের প্রাণ সংহার করিতে তাহারা আসিয়াছে! এ পাপের যে ক্ষমা নাই।

হাতের তীর-ধনুক নামাইয়া রাখিয়া বুদ্ধের চরণতলে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পাহাড়ের উপর হইতে বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলিয়া বুদ্ধকে একবার হত্যা করার চেষ্টা হয়। সেদিনকার এই নৃশংস ষড়যন্ত্রেরও নায়ক ছিলেন দেবদত্ত। ভাগ্যক্রমে বুদ্ধের জীবন সেদিন রক্ষা পায় বটে, কিন্তু প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার পায়ে এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সুপ্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য জীবক ছিলেন বুদ্ধের অন্যতম ভক্ত, তাঁহার চিকিৎসার ফলে এই ক্ষত নিরাময় হইয়া উঠে।

অজাতশত্রুর সাহায্য লইয়া দেবদত্ত আরও একবার বুদ্ধের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করেন। রোজকার মত সেদিনও বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষা-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। সাথে কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত।

রাজপথের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, একটি উন্মত্ত হস্তী সবেগে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ভীতসন্ত্রস্ত পথচারীর হায়-হায় করিয়া উঠিল।

উদ্দাম উন্মত্ত হস্তী সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত আনন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—এই বিপদের মুখে সর্ব্বাগ্রে তথাগতের প্রাণ রক্ষা করা চাই। দুই হাত প্রসারিয়া হাতীটির দিকে তিনি ধাবিত হইলেন। নিজে মরিয়া প্রভুকে তো বাঁচানো যাইবে!

তড়িৎ-গতিতে আনন্দকে একপাশে টানিয়া সরাইয়া দিয়া বুদ্ধ এই সময়ে মত্ত হস্তীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান। তাঁহার অলৌকিক শক্তির সম্মুখে উহা হীনবল হয় ও আতঙ্কে পলায়ন করে।

হাতীটি স্থান ত্যাগ করার পর জানা যায়, দেবদত্তের প্ররোচনায় কুমার অজাতশত্রুর চরেরা এটিকে সরকারী হস্তীশালা হইতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্গীদের হত্যা করাই ছিল এই ক্ষিপ্ত জীবটিকে এদিকে ঠেলিয়া দিবার উদ্দেশ্য।

দেবদত্তের দুষ্কৃতির প্রতিরোধ বা তাহাকে দমন করার কথা উঠানো

হইলে বুদ্ধ হাসিয়া বলিতেন, "তোমরা বৃথা ব্যস্ত হয়োনা। যে মূর্খ তাকে লোকে অচিরে চিনে ফেলবেই।"

কিছুদিন পরে দেবদত্তের শত্রুতা আরো প্রবল হইয়া ওঠে। 'বাহুল্যভোগী' বলিয়া বুদ্ধের দুর্নাম তিনি রটাইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য সঙ্ঘের কাছে উত্থাপন করেন কঠোরতর সাধনা ও কৃচ্ছ্রব্রতের প্রস্তাব। বলা বাহুল্য, মধ্যপন্থার চিরসমর্থক বুদ্ধ একথায় কান দেন নাই। ইহার পর দেবদত্ত একদল নবীন ভিক্ষুকে দলে টানিয়া নেন এবং গয়াশীর্ষ পাহাড়ে চলিয়া যান। এবার এক নূতন সঙ্ঘ গঠনে তিনি তৎপর হন।

এ নব্যপন্থী দল বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের কৌশল ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাহাদের অধিকাংশ সদস্য আবার বুদ্ধের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে।

দেবদত্তের প্রভাব প্রতিপত্তি ইহার পর বেশী দিন থাকে নাই। শেষ জীবনে তাঁহার অন্তরে দেখা দেয় তীব্র অনুতাপের দহন জ্বালা। বুদ্ধের চরণে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য তিনি যাত্রা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথমধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আচার্য্যজীবনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রচার ও পরিব্রাজনে একদিনের জন্যও বুদ্ধের উৎসাহের অভাব দেখা যায় নাই। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষ হইলে কি হয়, কর্ম্মব্রত সাধনে চিরদিন তিনি রহিয়াছেন অনলস। সারা উত্তর ভারত তিনি বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, একান্ত অন্তরঙ্গভাবে জনজীবনের সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছেন।

প্রতিদিন আট দশ ক্রোশ পাদপরিক্রমা ও ভিক্ষা-পর্য্যটন ছিল তাঁহার নিত্যকার দিনচর্য্যার অন্তর্গত। আর এই ভ্রমণের মধ্য দিয়াই নিয়ত তিনি যোগ রাখিতেন রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন সকল মানুষের সঙ্গে—সমাজের সর্ব্বস্তরের সহিত সাধিত হইত নিবিড় পরিচয়।

সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আশা–আকাক্ষার সংবাদ যেমন এই লোকোত্তর মহামানব রাখিতেন, তেমনি রাখিতেন তাহাদের অধ্যাত্ম-প্রয়াসের হিসাব নিকাশ।

কিন্তু জীর্ণ পুরাতন দেহটি পূর্ব্বের মত আর যেন এ কর্ম্মের ভার বহিতে চায় না, ক্রমেই তাহা অপটু হইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে, তখন নিজের প্রতিভূরূপে আনন্দকে বাহিরে পাঠান ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য।

আনুমানিক ৪৮৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের কথা। বুদ্ধ বুঝিতেছেন, মরলীলার শেষ অধ্যায়টি আজ সমাপ্তির পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ সময়ে ভক্ত শিষ্য ও অনুরাগীদের আর একবার তিনি দর্শন দিয়া যাইতে চান। শেষবারের মত নিজ জীবনের স্পর্শটি বুলাইয়া যাইবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তাই অসুস্থ শরীর নিয়াই সেদিন রাজগৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বৈশালীতে পৌঁছানোর পর দেখা গেল, দেহ বড় জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দ ভীত হইলেন। তবে কি তথাগতের মহাপ্রয়াণ এবার একেবারে আসন্ন ?

সখেদে মিনতি জানাইলেন, "ভদন্ত, আপনার কৃপায় মানুষের কল্যাণের জন্য এই বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে ! মহাপ্রয়াণের আগে কি একে আপনি দৃঢ়স্থায়ী ক'রে যাবেন না ? প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবস্থা আগে থেকেই শেষ করবেন না ?"

সঙ্গে সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর আসিল, "আনন্দ, তুমি কি বলতে পারো, সঙ্ঘ আমার কাছে নূতন ক'রে কি আশা করে ? ধর্ম্ম সম্পর্কে আমার যা ব'লবার তা আমি পরিষ্কারভাবে বারবার বলেছি। কোথাও গোপন করিনি, কার্পণ্যও কিছু করিনি। তাছাড়া, তথাগত নিজে কখনো ভাবেননি যে তিনি সঙ্ঘ পরিচালনা ক'রবেন, বা সঙ্ঘ তার ওপর চিরদিন নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। তবে কেন আজ আমি এর ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবো ?"

অন্তরঙ্গ ভিক্ষুরা নীরবে দাঁড়াইয়া প্রভুর কথা শুনিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তাহাদের স্বচ্ছ হইয়া আসিল। সত্য কথাই তো! এই বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘের যিনি প্রবর্ত্তক, পরিপোষক, আজ তাঁহার অন্তরে ইহার জন্য বিন্দুমাত্র সময় অবশিষ্ট নাই। থাকিবার কথাও নয়। সমস্ত বাসনা বা তন্‌হার পরপারে তিনি অবস্থিত। 'নির্ব্বাণের পরম তত্ত্বটি নিজজীবনে করিয়া তুলিয়াছেন প্রমূর্ত্ত।

বুদ্ধ আবার বলিয়া চলিলেন, "ছাখো, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, বয়স হয়েছে প্রায় আশী বৎসর। পুরাতন জীর্ণ শকটের মত বহু জোড়াতালি দিয়ে এখন শরীর ধারণ করতে হয়। এসময়ে তথাগতের শরীর সুস্থ থাকে শুধু একান্ত ও নিরন্তর ধ্যানে। অতএব এবার থেকে তোমরা এ শরীরের ভরসা ছাড়ো, নিজেরাই নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও তপস্যার ভেতর দিয়ে নিজেদের পরম আশ্রয় খুঁজে নাও। আনন্দ, জেনে রাখো, যে ভিক্ষু ধর্ম্মাশ্রয় ও ধর্ম্মশরণ নিয়ে থাকবে, তারই ভাগ্যে ঘট্‌বে অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণ।"

ভক্তগণ বড় চমকিয়া উঠিলেন। আসন্ন বিদায়ের একি সব কথা প্রভু আজ নিজমুখে বলিতেছেন। সকলেরই হৃদয়ে নামিয়া আসিল বিষাদের কৃষ্ণছায়া।

ভ্রমণের পথে পড়ে পারাগ্রাম। বুদ্ধের গৃহী ভক্ত চুন্দ কর্ম্মকারের বাস এই স্থানে। চুন্দের এক মনোরম আম্রকানন এখানে রহিয়াছে, বুদ্ধ এখানেই শিষ্যগণসহ সেদিনকার মত আশ্রয় নিলেন।

চুন্দ অত্যন্ত সরল, ভক্তিমান। উদ্যানে আজ প্রভু তাহার অতিথি, তাই আনন্দের আর অবধি নাই। আপন সাধ্যমত সে প্রভু ও তাঁহার ভক্তদের ভোজনের আয়োজন করিল।

সেদিনকার আহার্য্যের এক বড় আকর্ষণ ব্যঞ্জন সূকরমদ্দব-এর। শূকরাকৃতি এই কন্দ স্থানীয় লোকের খুব প্রিয়, উৎসাহী চুন্দ এ বস্তুটি সেদিন যথেষ্ট পরিমাণে রান্না করাইয়াছে।

ভোজনে বসিয়া প্রভু বুদ্ধ কহিলেন, "সূকর-মদ্দব-এর এই ব্যঞ্জন বড়

গুরুপাক, বিশেষ ক'রে আমার এ অসুস্থ শরীরের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। কিন্তু উপায় নেই, ভক্ত চুন্দ বড় আশা ক'রে আয়োজন ক'রেছে, কত রান্না করিয়েছে এ না খেলে সে বড় দুঃখ পাবে।"

ভক্তের প্রীত্যর্থে সেদিন সবটা ব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেন। তারপর শুরু হইল নিদারুণ অসুস্থতা। উদরের তীব্র যন্ত্রণা ও রক্তপাতের ফলে অবস্থা ক্রমে সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল।

কিন্তু বুদ্ধ এখনি তাঁহার এ যাত্রা থামাইতে রাজী নন। ব্যাধির প্রকোপের মধ্যেই পথ চলা আবার শুরু হইয়া গেল। কুশীনগর আজ তাঁহাকে কেবলি হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। কি জানি কেন মনে হইতেছে, সেখানে তাঁহার পৌঁছানো চাই-ই। যত কষ্টই হোক, এই অবিরাম পথচলা বন্ধ করা হইবেনা। রোগজর্জ্জর ক্ষীণ দেহকে অতি কষ্টে বহিয়া নিয়া আবার চলিতে লাগিলেন।

পথেই পড়ে ককুধ নদী। ইহার স্রোতে স্নান সমাপন করিয়া এক উদ্যানে বুদ্ধ বিশ্রাম করিতেছেন। এ সময়ে আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "দ্যাখো, আমার ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়াতে চুন্দকে কেউ যেন দোষ না দেয়। সে যে খাদ্য দিয়েছে তা পরম ভক্তিসহকারেই আমায় নিবেদন করেছে। সে নিজেও যেন মনে কোন ক্ষোভ না রাখে। আমি তাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সহাস্যে কহিলেন, "সুজাতার পায়সান্ন নির্ব্বাণলাভের আগে আমার এই দেহকে সঞ্জীবিত করেছিল। আর চুন্দের ব্যঞ্জন একে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজ পরিনির্ব্বাণের দিকে। এ দুই আহার্য্যই আমার কাছে সমান প্রিয় হ'য়েছে।"

সঙ্গী ভিক্ষুরা বুঝিতেছেন, তথাগতের জীবন নাট্যের উপর যবনিকা পতনের আর মোটেই দেরী নাই। আসন্ন বিরহের ব্যথায় সকলেরই মন ভারাক্রান্ত।

হঠাৎ আনন্দের দৃষ্টি পড়িল বুদ্ধের আননের দিকে, তিনি চমকিয়া উঠিলেন! একি অপরূপ দীপ্তি তাঁহার চোখে-মুখে?

বিমুগ্ধ সেবক শিষ্য তখনি তথাগতকে প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, আজ দেখছি আপনার সারা দেহে এক অপরূপ লাবণ্য টলমল ক'রে উঠেছে। মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়েছে দিব্য আনন্দের জ্যোতি। আজ হঠাৎ কেন এমন অলৌকিক অঙ্গচ্ছটা ?"

উত্তরে বুদ্ধ কহিলেন "আনন্দ, আজ মনে পড়েছে বহুদিন আগেকার স্মৃতি। সেদিনকার শুভ ক্ষণটিতে, বোধিদ্রুমতলে বসে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় এমনিতর দেহজ্যোতি আমার দেখা গিয়েছিল। আজকের দিনে আবার দেখছি তার আবির্ভাব! তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শুভক্ষণটিই এবার এসে পড়েছে।"

সামনেই স্বচ্ছতোয়া হিরণ্যবতী নদী, তাহার ওপারেই কুশীনগর। নদী পার হইয়া বুদ্ধ নগরীর উপান্তস্থিত শালবনে প্রবেশ করিলেন। দেহ আজ চিরবিশ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষতলে শয্যা রচনা করিয়া আনন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া দিলেন। ভক্তের হৃদয়ে এবার উথলিয়া উঠিতেছে শোকের পাথার!

কিন্তু অন্তিম সময়ের করুণ দৃশ্যটি সহ্য করা আনন্দের পক্ষে যে অসম্ভব। অদূরে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। একি আচরণ বুদ্ধের অন্তরঙ্গ সেবক-শিষ্যের। কেন তাঁহার এই শোকোচ্ছ্বাস ও চঞ্চলতা।

তখনি তাঁহাকে কাছে ডাকাইয়া আনিলেন। তারপর শান্ত গম্ভীর স্বরে দান করিলেন শেষ উপদেশ ও আশ্বাস বাণী, "আনন্দ, কেন তুমি শোক ক'রছো? কেনই বা এমন ক'রে কাঁদছো? সারা জীবন ভরে আমি তোমাদের বলেছি, শিক্ষা দিয়েছি—এ জীবন নিতান্তই নশ্বর, আমাদের যা কিছু প্রেয় বস্তু তা এখানে ত্যাগ ক'রে যেতেই হবে। ভেবে ছাখো, যে বস্তুর উৎপত্তি আছে তার বিনাশ তো থাকবেই! তুমি আমার সেবা করেছো একনিষ্ঠভাবে, আর সে সেবার তুলনা নেই। তাছাড়া, সাধনজীবনেও তুমি হয়ে উঠেছো আমার প্রিয় ও অন্তরঙ্গ।

এবার নির্ব্বাণের জন্য চরম প্রয়াস কর। আত্মশক্তির বলে এগিয়ে যাও, আমি বলছি, অচিরে পরমা মুক্তি তুমি লাভ ক'রবে।"

অতঃপর অন্যান্য ভক্ত-শিষ্যদের নিকট ডাকিলেন। শেষ বিদায় আসন্ন জানিয়া শত শত ভিক্ষু ও গৃহস্থ ইতিমধ্যে শালবনে ভীড় করিয়াছে। বুদ্ধ এসময়ে সকলকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার শেষ বাণী উচ্চারণ করিলেন, "আমার উপদেশ তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রেখো—স্থূল, সূক্ষ্ম সব কিছু বস্তুই পরিণামে বিনাশশীল। ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে, অপ্রমাদের সঙ্গে নির্ব্বাণলাভের জন্য তোমরা যত্নবান হও। এই ছিল আমার প্রথম কথা—আর শেষ কথাও এই রইলো।"

লুম্বিনীর শালকুঞ্জের তলে আশীবৎসর পূর্ব্বে যে মহাজীবনের আবির্ভাব, কুশীনগরের* মল্লশালবনে আজ তাহারই ঘটে মহাপরিনির্ব্বাণ। রাত্রির তৃতীয় যামে বুদ্ধ তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সহস্র সহস্র শোকার্ত্তের দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজলে বর্ষার আকাশ বাতাস মন্থর হইয়া উঠে। মূক বনভূমিও সেদিন তাহার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাইতে ছাড়ে নাই, অজস্র শালপুষ্পে আকীর্ণ হয় তথাগতের শেষ শয্যা।

*গোরখ্‌পুরের ত্রিশ মাইল দূরে, বর্ত্তমানের কাশিয়া নামক জনপদ আজো গৌতম বুদ্ধের তিরোভাবের পবিত্র চিহ্নটি বুকে ধরিয়া আছে। দেশ বিদেশের অগণিত নরনারী আজিও তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসে।

ভক্ত কবীর

শীতের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আচার্য্য রামানন্দ কাশীর অসিঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের বেশী দেরী নাই, তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া তাঁহাকে কৃত্যাদি শেষ করিতে হইবে।

পথ ঘাট একেবারে জনশূন্য, নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাইতেছে প্রত্যূষচারী পাখীর ডানা-ঝাপ্‌টানি, আর গঙ্গার জলস্রোতের ছল্‌ছলাৎ শব্দ।

অস্ফুট আলোকে ঘাটের সিঁড়িটি তেমন ভাল দেখা যায়না। অবশ্য তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নাই, এখানে উঠানামা করিতে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কমণ্ডলু ও বহির্ব্বাস ঘাটের উপর রাখিয়া রামানন্দ কেবল নীচের সিঁড়িটাতে পা বাড়াইয়াছেন। হঠাৎ এসময়ে কাহার স্পর্শ তাঁহার গায়ে লাগিল?

ছি-ছি, একি কোন মৃতদেহ? বলিয়া উঠিলেন,—"রাম রাম রাম।" নীচের দিকে ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে হে শীতের রাতে এমন ক'রে ঘাটের সিঁড়িতে শুয়ে? উঠে দাঁড়াও তো বাবা। তুমি কে?"

শায়িত মানুষটি ত্রস্তব্যস্তে ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রদ্ধানত শিরে যুক্তকরে সে নিবেদন করিল, "প্রভু আমি কবির-দাস, আপনার অনুগৃহীত শিষ্য।"

"সে কি কথা! এ আবার কি বলছো? তোমায় তো বাবা আমি কখনো শিষ্যরূপে গ্রহণ করিনি। এ তোমার ভ্রম!"

"না প্রভু, এ আমার ভ্রম নয়, এর চাইতে বড় সত্য আমার জীবনে আর কখনো প্রতিভাত হয়ে উঠেনি। অন্ত্যজ, নিরক্ষ জোলার ঘরে আমার জন্ম। বন্ধনদশার মধ্যে এ দেহ মন এতদিন ছিল মৃতকল্প হয়ে, মুক্তির কোন আশাই ছিলনা। আজ আপনার কৃপায় তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। আজ এ দেহে পবিত্র পদস্পর্শ দিয়ে যে নাম দীক্ষা আপনি দান করলেন, তাই হ'বে আমার মুক্তিপথের পাথেয়। এ অধমকে আপনি আশ্রয় দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু।"

ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিয়া কবীরদাস গঙ্গার ঘাট হইতে চলিয়া গেলেন।

অপস্রিয়মান তরুণের দিকে রামানন্দ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। অন্তরপটে সেদিন তাঁহার নবলব্ধ শিষ্যের কোন্ ভবিষ্যৎ চিত্রটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কে বলিবে?

রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্য এই রামানন্দ স্বামী। স্বীয় সম্প্রদায়ের অনেক কিছু বিধিনিষেধের গণ্ডীকে তিনি অতিক্রম করেন, ভক্তিসাধনার উদারতর অঙ্গনতলে আসিয়া তিনি দাঁড়ান। ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মকেন্দ্র কাশীতে আসিয়া শুরু করেন নিজস্ব মতবাদের প্রচার। উত্তরকালে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বহু মুমুক্ষু তাঁহার আশ্রয় পাইয়া ধন্য হয়। তাই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক-দিকে যেমন দেখি শুদ্ধাচারী, রক্ষণশীল মালাতিলক-ধারী রামাইৎ বৈষ্ণব, তেমনি আর একদিকে দেখি অন্তরঙ্গ প্রেমসাধনার বাণী-উদ্গাতা মরমিয়া সাধক।

আচার্য্য রামানন্দের ভক্তিধারা বাহিয়া অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন বহুতর সমর্থ সাধক। মুসলমান জোলা কবীরদাস, চর্ম্মকার রইদাস, জাঠ জাতীয় ভক্ত ধনা ও ক্ষৌরকার সেনা ইঁহাদের অন্যতম। কিন্তু কবীরদাসই তাঁহার উদার প্রাণময় ধর্ম্মকে উত্তর ভারতের দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া দিয়া যান।

হিন্দীর একটি সুপ্রচলিত দোঁহা এ সম্পর্কে বলিতেছে—

ভক্তি দ্রাবিড় উপজি
লায়ে রামানন্দ,
প্রগট্ কিয়া কবীরনে
সপ্তদ্বীপ নও খণ্ড।

অর্থাৎ, ভক্তি উপজিত হয় দ্রাবিড় দেশে, তাহা আনয়ন করেন রামানন্দ, আর কবীর তাহা বিস্তারিত করিয়া দেন সারা পৃথিবীতে।

কবীরের পরবর্ত্তীকালে মধ্যযুগে এমন কোন ধর্ম্মান্দোলন ছিল না যাহা তাঁহার শরণাগতি ও প্রেমভক্তির স্পর্শে প্রভাবিত হয় নাই।

বারাণসীর এক দরিদ্র মুসলমান জোলার ঘরে কবীরদাসের জন্ম। নিরক্ষর, অর্থ-সংস্থানহীন এক পরিবারকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় বস্ত্র বয়নের উপর। পিতা নিরু ও জননী নীমা তাই একান্তভাবে চান যে, কবীর তাহার পৈত্রিক বৃত্তি গ্রহণ করুক, এ কাজে দক্ষ হোক। সে সংসারের কিছুটা ভার নিলে তবেই না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহারা বাঁচেন।

কিন্তু কবীরকে নিয়া পারিয়া উঠা দায়। স্বভাবতঃই সে খুব উদাসীন, সংসারের কোন কাজেই আঁট নাই। কোথাও হয়তো কোন্ ফকীর বা সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সোৎসাহে সেবার কাজে সে লাগিয়া যায়, পাগলের মত তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া দিন-রাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়। বড় ঘর-ছাড়া বৈরাগী মন এ বালকের। তাঁতের টানা-পোড়েনের সম্মুখে তাহাকে বসানো বড় সহজ নয়।

বহু চেষ্টার পর পুত্রের সম্বন্ধে আশা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মায়ের মনে কেবলই জ্বলিতে থাকে অশান্তির চাপা আগুন। ধর্ম্মাচরণ করা, ফকীর পীর ও সাধুসন্তের কথা শোনা খারাপ কিছু নয়। এ পরিবারের সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ কেহ ইহাতে বাধা জন্মাইবে না। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব গ্রহণও তো একটা বড় কর্ত্তব্য। তরুণ পুত্র যদি সে দায়িত্ব

কেবলি এড়াইয়া যায় তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের কি গতি হইবে ? এ দারিদ্র্য-দুঃখ যে কোন কালেও আর ঘুচিবে না।

বাল্যকাল হইতেই কবীরদাসের অন্তরে জাগ্রত হয় তীব্র বৈরাগ্য আর মুক্তির অদম্য পিপাসা। পিতা মাতার সরলতা ও স্বভাবগত ভক্তি নিয়াই কবীরের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। তদুপরি রহিয়াছে ধর্ম্মান্তরিত পরিবারের পূর্ব্ব-ঐতিহ্যের প্রভাব।

উত্তরভারতের এ জোলার দল একসময়ে ছিল হিন্দু, নাথপন্থী যোগী। মাত্র দুই তিন পুরুষ আগে তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বের আচার ও সংস্কার, যোগী-জীবনের আদর্শ ও সাধনার ঐতিহ্য তখনো তাহাদের মধ্যে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত। কবীরের সহজাত ভক্তি-পরায়ণতা ও ধর্ম্মজীবনের মূল খুঁজিতে হইবে বংশের এই প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

বারাণসীতে বহু হিন্দু সাধুসন্তের বাস, এ তীর্থের নানা পবিত্র স্থানে দেখা যায় শক্তিমান মহাপুরুষদের আনাগোনা। এই সব মহাত্মাদের কিছুটা সঙ্গ পাইয়া কবীরের মুমুক্ষা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিল। স্থির করিলেন, ইঁহাদের কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন ভজনে দিন কাটাইবেন।

কিন্তু অন্তরায়ও কম নাই। তিনি মুসলমান। কোন উচ্চকোটির সাধক বা সন্ন্যাসী যে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু অন্তরে আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে অসহ্য জ্বালা, সাধন যে তাঁহার অবিলম্বে গ্রহণ করা চাই।

আচার্য্য রামানন্দ রামমন্ত্রের উপাসক, দলে দলে মুক্তিকামী নরনারী তাঁহার আশ্রম ভবনে আসিয়া ভীড় জমায়। প্রেম-ভক্তির মাধুর্য্যে, সাধনশক্তির ঐশ্বর্য্যে সকলের তিনি প্রাণমন কাড়িয়া নেন। তাছাড়া, কবীর শুনিয়াছেন, অপর আচার্য্যদের অপেক্ষা রামানন্দের উদারতা অনেক বেশী। যেমনি সমর্থ মহাপুরুষ তেমনি তিনি পরম কৃপালু। কিন্তু

কবীরের ভয়, আচার্য্য যদি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বসেন, তবে উপায় ? ঠিক করিলেন, বরং একাজে তিনি এক ক্ষুদ্র ছলনার আশ্রয় লইবেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু তাঁহার অন্তরের কথাটি কি আর বুঝিয়া নিবেন না ? ক্ষমা তাঁহার অবশ্যই মিলিবে। আগ্রহ অধীর কবীর তাই এমনি অদ্ভুতভাবে গঙ্গার ঘাটে সেদিন দীক্ষা নিলেন।

রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া কবীরদাস এবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কোন কাজেই তাঁহার আর আকর্ষণ নাই, উৎসাহ নাই। সারা দেহে মনে বহিতেছে ভাবগঙ্গার এক প্রবল প্রবাহ। আপনাকে তিনি এই প্রবাহে একেবারে হারাইয়া বসিয়াছেন।

বৃদ্ধ পিতামাতা শঙ্কিত হইয়া পড়েন, এমন করিলে কাজ কর্ম্ম ঘরসংসার সব যে ভাসিয়া যাইবে। পরিবার প্রতিপালনের মস্ত দায়িত্ব তাহার, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন ?

তাঁতঘরে গিয়া কবীর কাজে ব্যাপৃতও হন, কিন্তু হাতের মাকু হাতেই থাকিয়া যায়, টানাপোড়েনের সূতা ছিঁড়িয়া বয়ন পণ্ড হয়। হাল ছাড়িয়া দিয়া তাই তাঁহাকে বলিতে হয়—

দীন দয়াল ভরোসে তেরে।
সভ পরবারু চঢ়াইআ বেড়ে।

—হে আমার দীনদয়াল, তোমার উপরই যে আমার ভরসা। আমার সারা পরিবারকে তোমারি নৌকায় চড়িয়ে দিলাম প্রভু।

শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া ভক্ত কবীরের সাধনা দিনে পর দিন আগাইয়া চলে।

কিন্তু এ ঔদাসীন্য, এ ভাবাবেশ চলিতে থাকিলে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ কি করিয়া হইবে ? কবীরের মাতা ও পিতা প্রমাদ গণিলেন। চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া নিরু ও নীমার জীবন কাটিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র ভরসাস্থল এই পুত্রটি। নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধি ও দক্ষতা তাঁহার যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কোন কাজ করার

মত মনই যে আজ তাঁহার নাই। কবীর-মাতা নীমার এ সময়কার দুঃখদৈন্য ও অশান্তির ছবিটি কবীরের রচিত একটি দোঁহায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—

মুসি মুসি রোয়ৈ
কবীর কী মায়,
এই বারক কৈসে
জীয়হি রঘুরায়।
তন্‌না বুন্‌না সব তজ্যো
হৈ কবীর,
হরিকা নাম লিখি
নিয়ো শরীর।

অর্থাৎ, দুঃখভরে রোদন করতে থাকে কবীরের মা—হে রঘুরায়, এবার কি ক'রে জীবন রক্ষা হবে, তা বল। কবীর তার সারা শরীরের উপর লিখে নিয়েছে হরির নাম, আর তানা-বোনা সব কিছু কাজ সে ক'রেছে পরিত্যাগ।

শক্তিমান আচার্য্য রামানন্দের স্পর্শ, তাঁহার প্রদত্ত রামমন্ত্র আজ চৈতন্যময় হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের লোক কবীরকে উন্মাদ ভাবিলে কি হয়, তিনি যে আজ এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত। ভগবৎ প্রেমের উচ্ছ্বলিত তরঙ্গভঙ্গ সমস্ত চেতনাকে একাকার করিয়া দিতেছে। নামরসে নিরন্তর অবগাহনের ফলে যে অবস্থাটি তাঁহার সাধনজীবনে দেখা দেয়, কবীর তাহার বর্ণনা দিতেছেন—

নাম অমল উতরৈ না ভাঈ।
ঔর অমল ছিন ছিন চঢ়ি উতরৈ,
নাম-অমল দিন বঢ়ৈ সওয়াই
দেখত চঢ়ৈ সুনত হিয় লাগৈ,
সুরত কিয়ে তন দেত ঘুমাঈ।

পিয়ত পেয়ালা ভয়ে মতওয়ালা,
পায়ো নাম মিটী ছুচিতাই।
জো জন নাম অমল রস চাখা,
তর গঈ গণিকা সদন কসাঈ।
কহ কবীর গূঁগে গুড় খায়া
বিন রসনা কা করৈ বড়াঈ।

অর্থাৎ—ভাইরে, নামের নেশা কখনো যায় না টুটে। সব নেশারই রয়েছে হ্রাস আর বৃদ্ধি, কিন্তু নাম-নেশা কেবলই যায় বেড়ে। নামের দিকে তাকালে নেশা বেড়ে ওঠে, শ্রবণ করলে হিয়াতে লাগে তার স্পর্শ, নামে প্রেম জন্মালে তনু হয় আবেশাচ্ছন্ন। নামের পেয়ালায় যে দেয় চুমুক, সে হয়ে যায় মাতাল। নাম যে পেয়েছে সব দ্বিধা তার গেছে কেটে। নামরসের পানপাত্র যে চেখেছে, গণিকা হোক আর সদন কসাই হোক—সে গেছে ত'রে। কবীর কহে, বোবা খেয়েছে গুড়, তাই রসনায় নামের মহিমা সে বলবে কি ক'রে?

মহাপুরুষ রামানন্দের আশ্রয় তাঁহার মিলিয়াছে। গুরুকৃপার আলোকে অন্তরের মণিকোঠা আজ আলোকিত। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কাররাশি এবার উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। কবীর হইয়াছেন প্রেমের পাগল, পরম উদাসীন্—'মস্ত্'।

উত্তরকালে কবীর কহিয়াছিলেন, "রাগ লখৈ সো তরিয়াঁ—প্রেমকে যে ভাগ্যবান দর্শন করিয়াছে, মুক্তি মিলিয়াছে তাহারই। কিন্তু এ সৌভাগ্যোদয়টি ভক্ত কবীরের জীবনে বড় সহজে আসে নাই। এজন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। সামাজিক বাধাবিঘ্ন, কঠোর জীবনসংগ্রাম ও তীব্র ত্যাগতিতিক্ষার ভিতর দিয়া দিনের পর দিন তিনি পথ চলিয়াছেন।

নিতান্ত সাধারণ জোলার ঘরের ছেলে কবীর। মাতা পিতা ও পাড়া-পড়শীরা তাঁহার এ প্রেমোন্মত্ত জীবনের ধর্ম্ম বুঝিতে চাহিবে কেন?

ঘর সংসারের দিকে তাঁহার মন ঘুরানোর জন্য সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠে। চাপিয়া ধরিয়া কবীরকে বিবাহ দেয়, কোনমতে যদি তরুণী বধূ তাঁহার মন ফিরাইতে পারে।

কিন্তু গুরু রামানন্দের স্পর্শ যে অমোঘ। এ স্পর্শে রামনামের আগুন কবীরের জৈব জীবনের পরতে পরতে আজ লাগিয়াছে। জনক জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, সংসারের মোহ-বন্ধন সব কিছু তাঁহার কাছে তাই নিরর্থক।

উদাসীন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় আগেরই মত তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়াও গার্হস্থ্য জীবনকে কোন দিন আর গ্রহণ করিলেন না।

সাধনার দিব্য অনুভূতি পর পর উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে, লোকোত্তর জীবনের স্বাদে, গন্ধে ও নেশায় তিনি বুঁদ! রূপান্তরিত জীবনটি নিয়া নির্লিপ্তভাবে গৃহপরিবেশে তিনি রহিয়া যান।

কবিরের পত্নী ও গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য আজ আর পাইবার উপায় নাই। শুধু জানা যায়, তাঁহার পুত্র কামালও উত্তরকালে এক মহাসাধকে পরিণত হন। পিতার সাধনার নির্দ্দিষ্ট ধারাটি অনুসরণ না করিলেও এক বিশিষ্ট মরমিয়া সাধকরূপে সারা উত্তরভারতে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কবীরের সাধনা হইতেছে নিগূঢ় প্রেমের সাধনা। প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আবর্ত্তে তিনি অধীর, আবার বিরহের তীব্র বেদনায় তিনি জর-জর। দিবানিশি নাম গান করিয়া আর দোঁহা ও ভজন গীত গাহিয়া দিন তাঁহার অতিবাহিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন এই নিরক্ষর সাধকের রচনায় দানা বাঁধিয়া উঠে আন্তর সাধনার মধুর রস, আর এগুলিতে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতে থাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির দীপ্তি।

শুধু সাধারণ মানুষই নয়, সমকালীন সাধুসন্তদের মনেও কবীরের ভাব ও সুর চমক লাগাইয়া দিতে থাকে। বিস্মিত হইয়া

সকলে ভাবে—পরম সত্যের বাণী, শাশ্বত জীবনের গূঢ় তত্ত্ব এমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এ জোলার মুখ হইতে কি করিয়া বাহির হয় ?

জন্ম জন্মান্তরের সাধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায়। এবার রামানন্দের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাঁহার রুদ্ধ দুয়ারটি খুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ভক্ত কবীর খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাঁহার সম্পদ—অপরূপ দাক্ষিণ্যে দুই হাতে তাহা ছড়াইয়া চলিয়াছেন।

সাধনা ও সিদ্ধি, বিরহ ও মিলনের রসবৈচিত্র্যে তাঁহার দোঁহা হইয়া উঠিয়াছে অপরূপ, প্রেমসাধকের আর্ত্তিতে ও আনন্দোল্লাসে এগুলি দিকে দিকে জাগাইয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য।

প্রেমসাধক কবীরের সর্ব্বসত্তা, সর্ব্ব দেহমনপ্রাণ প্রিয়মিলনের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। কিন্তু কই, তাঁহার দর্শন তো মিলিতেছে না ?

তিনি তাই স্বরচিত পদে খেদোক্তি করিতেছেন, "ওগো, পথ চেয়ে চেয়ে আঁখি দুটিতে আমার পড়লো ছানি, নাম নিতে নিতে জিভের ছিঁড়ে গেল ত্বক, চোখদুটি বৈরাগী হয়ে গেল হাতে নিয়ে বিরহের কমণ্ডলু—দরশন মাধুকরী তারা মেগে বেড়াচ্ছে আর এ নিয়ে বিভোর রয়েছে দিন রাত।"

কিন্তু কই, সে বহু-ঈপ্সিত পরমবস্তুটি তো আজো মিলিতেছে না ! প্রেমপাগল কবীরের বিরহী চিত্ত তাই এবার চরম আত্মদানের ভয় দেখাইয়া দয়িতকে কহিতেছে—

লহু তন জালোঁ মসি করৌ, লিখোঁ রামকা নাঁউ।
লেখণি করু করংককী,
লিখি লিখি রাম পঠাউ॥
ইস তন্‌কা দীওয়া করৌ
বাতী মেলু জীব,
লোহী সীঞ্চৌ তেল জ্যু
কব মুখ দেখোঁ পীব।

কৈ বিরহিনকু মীচ দে,
কৈ আপা দিখলাই।
আঠ পহরকা দাঝ্ণা,
মোপৈ সহা ন জাই ॥

অর্থাৎ, আমার এই তনু পুড়িয়ে বানাবো কালি, তা দিয়ে লিখবো রামের নাম। আর বুকের পাঁজরকে লেখনি ক'রে, তাই দিয়ে লিখে পাঠাবো রামকে। এই তনুকে করবো প্রদীপ, আর আমার প্রাণ হবে তাতে সল্‌তে। রক্তরূপ তেল দিয়ে সিঞ্চন করবো এই সল্‌তে। এই প্রদীপের আলোয় আমি কবে দেখবো প্রিয়ের মুখ? হে প্রভু, হয় তোমার দর্শন দাও, নয় তো এ বিরহিনীকে দাও মৃত্যু। অষ্ট-প্রহরের এ দহন জ্বালা আর তো আমার সহ্য হয় না।

দুঃখের দহন ও প্রেমের মন্থনের পর এবার সাধক জীবনে আসিতেছে প্রিয় মিলনের পালা। কবীরের দুয়ারে পরম প্রভুর বার্ত্তা আসিয়া গিয়াছে। এবার তাঁহার প্রেমাভিসার—

ভীজৈ চুনরিয়া প্রেম-রস বুদন।
আরত সাজকে চলী হৈ সুহাগিন
প্রিয় অপনেকো ঢুঢ়ন।
কাহেকী তোরী বনী হৈ চুনরিয়া
কাহাকে লগে চারো ফুদন।
পাঁচ তত্ত্বকী বনী হৈ চুনরিয়া
নামকে লাগে ফুদন।
চড়িগে মহল খুল গঈরে কিবরিয়া
দাস কবীর লাগে ঝুলন।

অর্থাৎ, প্রেমরসের ফোঁটায় ভিজে গেছে চুনরিয়া—বুটিদার ওড়না প্রিয়তমের সন্ধানে প্রেমিকা চলেছে ব্যাকুল হয়ে। ওগো, তোমার চুনরিয়া কি দিয়ে তৈরী? চারদিকের ঝালরই বা কিসের?—পঞ্চতত্ত্বের তৈরী এ চুনরিয়া, তাতে লাগানো হয়েছে নামের ঝালর। ওরে প্রিয়-

মহলে এবার ওঠ্ গিয়ে, দুয়ার যে তার গিয়েছে খুলে—কবীরদাস তাই দেখেই তো আজ দুলছে পরম আনন্দে।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁহার এ প্রিয় মিলন ও পরম প্রাপ্তি। এ মহা সৌভাগ্যের সংবাদটি নিজেই তিনি সানন্দে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—'কহৈ কবীর সুনো ভাগ হমারা, পায়া অচল সোহাগ রে।'

সাধক কবীর সত্যই বড় ভাগ্যবান, প্রেমময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেম লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন। এ মিলনরঙ্গের আনন্দ সংবাদ, রঙ্ মহলের এ নিগূঢ় কাহিনী তিনি সকল ভক্ত, সকল অন্তরঙ্গ প্রেম-সাধকের কাছে অকপটে ব্যক্ত না করিয়া শান্তি পান না। তাই অপরূপ ভাব ও ব্যঞ্জনায় বলিতেছেন—

জোগ জুগত সো রঙ মহলমে,
প্রিয় পাঈ অনমোল রে।
কহৈঁ কবীর আনন্দ ভয়ো হৈ
বাজত অনহদ ঢোল রে॥

অর্থাৎ, যোগ সাধন ক'রে আমি আমার প্রিয়তমকে, রঙমহলের সেই অমূল্য ধনকে পেয়েছি—কবীর বলে, আজ বড় আনন্দ, শোন ঐ অনাহত মৃদঙ্গ বেজে চলেছে।

প্রিয় মিলনের এই মধুর রস মরমী সাধকের জীবনে আরো গাঢ় হইয়া উঠে—

লিখালিখী কী হৈ নহী
দেখা দেখী বাত।
দুল্হা দুল্হিনী মিলি গয়ে
ফীকী পরি বরাত।

—ওগো, এ তো লেখালেখি বা বর্ণনার কথা নয়, এ হ'লো দেখা-দেখির কথা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা—বর কনে মিলে গেল, আর ফিকে হয়ে গেল চারদিকের বরযাত্রীর দল।

কবীরের এই প্রেমসাধনা শুধু অন্তরতমের সহিত নিবিড় মিলনেই

থামিয়া যায় নাই, একীকরণ ও একাত্মকরণের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ছাড়িয়াছে—

উলটি সমানা আপমে,
প্রগটি জ্যোতি অনন্ত।
সাহেব সেবক এক সঙ্গ
খেলৈ সদা বসন্ত ॥

অর্থাৎ, সাধক কবীর এবার উলটিয়া আপন সত্তার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। অনন্ত জ্যোতি সেখানে প্রকটিত, প্রভু ভৃত্য সেখানে এক হইয়া গিয়াছে, আর চির বসন্ত সেখানে রহিয়াছে বিরাজমান।

সিদ্ধ সাধক কবীরের খ্যাতি তখন উত্তর ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বারাণসীর মত বিখ্যাত ধর্ম্মকেন্দ্রে সাধু সন্ন্যাসী ও ফকীরের ভীড় লাগিয়াই আছে। এখানেও ভক্ত কবীর এক মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিলেন।

আচার্য্য রামানন্দের শিষ্য হইলেও রামানন্দ-সম্প্রদায়ে কবীর স্থান পান নাই। কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার মত লোকও তিনি ছিলেন না। গুরুর আশীর্ব্বাদপূত এক অপূর্ব্ব জনপ্রিয়, সহজসাধ্য ভক্তিবাদের প্রচার তিনি শুরু করেন। জটিল অনুষ্ঠান ও বাহ্যাচারকে এড়াইয়া তিনি স্থাপন করেন এক উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমত যাহা সেদিন শিক্ষিত, উচ্চবর্ণ ও অন্ত্যজ সকলেরই গ্রহণীয় হইয়া উঠে।

সমসাময়িক যুগের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাই ভক্ত কবীরের জনপ্রিয়তার সীমা রহিল না। তিনি চিহ্নিত হইলেন এক উদার অধ্যাত্ম-নেতা ও উচ্চকোটি ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

এই প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা প্রাপ্তির পরেও কবীরদাস গুরু রামানন্দ প্রদত্ত শরণাগতি ও ভক্তির আদর্শ হইতে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হন নাই। স্বরচিত দোঁহাগুলিতে এই বহু-বিশ্রুত সিদ্ধপুরুষ তাঁহার আত্মসমর্পনের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন—

কবীর কুতা রামকা,
মুতিয়া মেরা নাঁউ।
গলৈ রামকী জেবড়ী,
জিত খিঁচৈ তিত জাউ॥
তো তো করৈ তো বাহুড়ৌ
দুরি দুরি করৈ তো জাউ॥
জ্যু হরি রাখৈ ত্যু রহৌ,
জো দেবৈ সো খাউ॥

অর্থাৎ, কবীর বল্‌ছে—আমি হচ্ছি রামেরই কুকুর। মুতিয়া আমার নাম, আমার গলায় রয়েছে রামেরই দড়ি। তিনি যে দিকে টানেন সে দিকেই আমাকে যেতে হয়! তু-তু ক'রে ডাক্‌লে কাছে আসি, আবার দূর ক'রে দিলে সরে যাই। হরি যেমন আমায় রাখেন তেমনি আমি থাকি– যা তিনি যোগান তাই খেয়ে করি প্রাণ ধারণ।

রামমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবীরদাসের অন্তর্জ্জীবনের কপাটটি হঠাৎ খুলিয়া যায়, রামনাম রসে ডুবিয়া এক ভাবুক সাধকে তিনি পরিণত হন। সেদিনকার এই প্রেমোন্মাদ সাধককে আমরা বলিতে শুনিয়াছি—

কো বীনৈ প্রেম লাগৌ রী মাঈ, কো বীনৈ।
রাম-রসায়ণ মাতে রী মাঈ, কো বীনৈ।

অর্থাৎ—মাগো, আমি যে পড়েছি প্রেমে, বলতো এখন কাপড় বুন্‌বে কে? মাগো, আমি যে রাম-রসায়ণ পান ক'রে হয়ে গেছি একেবারে প্রমত্ত, কাপড় আর বুন্‌বে কে?

রামনামের এ রসায়ণই সেদিন কবীরকে উত্তরকালে করিয়া তুলে এক সিদ্ধ সাধক, তাঁহার ইষ্ট মূর্ত্তি ছড়াইয়া পড়ে নিখিল ভুবনে। শুধু রাম নয়—হরি, গোবিন্দ, কেশব, সাহিব প্রভৃতি নানা নামে তিনি তাঁহার প্রভুকে ডাকিয়া গিয়াছেন, আর ইঁহাদের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে অচিন্ত্য, অবর্ণনীয় ব্রহ্মের পরম তত্ত্ব।

কবীরদাসের মতে তাঁহার প্রভু, রাম হইতেছেন বেদ কোরাণের অগম্য এক সর্ব্বাতীত পরম বস্তু।—বেদ কুরাণে ৗ গমি নহীঁ।

সগুণ, না নির্গুণ—কোন্ তত্ত্বটি কবীর সমর্থন করেন? উত্তরে বলিতেছেন নির্গুণেরই কথা—

দাস কবীর গাবৈঁ নিরগুণহো,
সাধো করি লে বিচার।
নরম-গরম সৌদা করি লে হো,
আগে হাট না বাজার॥

আপন সাধনায় এই সাকার ও নিরাকারের রূপ ও অরূপের অপরূপ সামঞ্জস্য বিধান তিনি করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদে এই তত্ত্বটি চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। তিনি বলিতেছেন—

রেখ-রূপ জোহি হৈ নহিঁ,
অধর ধরো নহিঁ দেহ।
গগন-মণ্ডলকে মধ্যমেঁ,
রহতা পুরুষ বিদেহ।
সাঁঈ মেরা এক তু,
ঔর ন দূজা কোই।
জো সাহব দুজা কহৈ,
দূজা কুলকো হোই॥
সগুণকী সেবা করৌ
নির্গুণকা করু জ্ঞান।
নির্গুণ সগুণকে পরে,
তহৈঁ হামারা ধ্যান॥

অর্থাৎ রূপ ও আকার যাঁর নেই সেই অধরা দেহ ধারণ করেন না, সেই বিদেহী পুরুষ সদা বিরাজিত গগনমণ্ডলে। ওগো মোর প্রভু, একমাত্র তুমিই আছো, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। যে বলে আমার প্রভুর দ্বিতীয় আছে, সে অন্য কুলের মানুষ। সগুণের সেবা ক'রে

যাও, আর জ্ঞানলাভ কর নিগুর্ণের। সগুণ নির্গুণের অতীত যিনি আমার ধ্যান যে তাঁরই জন্য।

কবীর হইতেছেন মরমিয়া প্রেমসাধক, তাই সাকার ইষ্টের স্মরণে, তাঁহার নাম গানে চলে তাঁহার নিরন্তর রসভুঞ্জন। অনন্ত ভাবময় বিগ্রহ তাঁহার এই ইষ্ট! জাগরণে হোক, স্বপনে হোক, ভক্ত সাধক সেখানে তুমি-আমির পার্থক্য আর প্রভুভক্তের দ্বৈত-রূপ বজায় রাখিয়া চলিতে ব্যগ্র। রস ও রসিকের ভাবটি সেখানে সদা বিদ্যমান। প্রভুকে তিনি তাই মিনতি জানান—

নয়না অন্তর আও তুঁ
　　জ্যোহি নয়ন ঝঁপেউ
নাঁ হৌ দেখোঁ ঔরকু
　　না তুঝ দেখন দেউঁ॥
মেরা মুঝমেঁ কুছ নহীঁ
　　জো কুছ হৈ সো তেরা।
তেরা তুঝ্ কো সৌঁপত,
　　ক্যা লগ্ গৈ হৈ মেরা॥

—ওগো প্রভু, আমার নয়নের ভেতরে তুমি এসো। যেমনি তুমি আসবে, অমনি আমি নয়ন ফেল্ বো মুদে। আর কাউকে আমি দেখতে পাবোনা, তোমাকেও দেখতে দেব না কাউকে।—আমার মধ্যে আমার যে কিছুই নেই, যা কিছু রয়েছে তা শুধু তোমারই। তোমার বস্তু তোমায় সঁপে দেব, তাতে আমার কি আসে যায় বল?

প্রিয়-মিলন ও একৈকনিষ্ঠার এ এক পরম কবিত্বময় বাণী, যাহার অনুরণন চিরকালের ভক্তহৃদয়ে তরঙ্গ না তুলিয়া ছাড়িবে না।

সাধক কবীরদাসের স্বপ্ন-মিলনের ছবি তাঁহার জাগর-মিলনের মতই অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত। তিনি কহিতেছেন—

সুপনেমেঁ সাঈ মিলে,
　　সোওয়ত লিখা জগায়।

আঁখি ন খোলুঁ ডরপতা,
মত স্থপনা হৈ জায়।
সাঈঁকের বহুত গুণ লিখে
জো হিরদে মাহি,
পিউ ন পানী ডরপতা
মত উহ্ই ধোয়ে জাহি ॥

অর্থাৎ, স্বপনে মিললো আমার প্রভু। প্রভু ঘুমিয়ে ছিলাম, তিনি জাগিয়ে নিলেন আমার। ভয়ে খুলি নে আঁখি পাছে এ স্বপন যায় টুটে। প্রভু আমার গুণময়—সব গুণ তাঁর হৃদয়ে আমার লিখে রাখি। ভয়ে করিনে জল পান, পাছে হৃদয়ের এ লেখা যায় ধুয়ে।

মরমী সাধকের এই পদ কয়টিতে প্রেমকল্পনা ও ভাবাবেগের সহিত কবিত্বরসের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে।

কবীর তাঁহার সাধনায় দুর্ব্বল ভাবালুতার প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার এ প্রেমের সাধনা আত্মত্যাগদীপ্ত নির্ভীক বৈরাগ্যবান সাধকের সাধনা। 'সুরত' আর 'নিরত' এর কঠোর সাধন নির্দ্দেশ তিনি শিষ্যদের দিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কোন-আতিশয্য বা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় কোনকালে তাঁহাকে সহ্য করিতে দেখা যায় নাই। শিষ্য হোক বা বাহিরের কোন ভক্ত বা সাধকই হোক, মিথ্যচার বা বেশভূষার অনাবশ্যক আড়ম্বর দেখিলেই শাণিত শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা তিনি বিদ্ধ করিতেন।

বীর ভক্তদের আহ্বান জানাইয়া কবীর তাঁহার রচিত এক পদে কহিয়াছেন—"ওরে ভাই, যে বীর সাধক সে সংগ্রাম দেখে পলায়ন করবে কেন? যে পলায়ন করে সে তো কখনো বীর হ'তে পারেনা। যুঝ্‌তে হবে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহের সঙ্গে, এ দেহের প্রান্তরে সুরু হ'বে প্রচণ্ড যুদ্ধ। সেখানে সাধকের সঙ্গী হ'ল শীল, সত্য ও সন্তোষ—নামের তরবারি ঝন্‌ঝন্ শব্দে উঠ্‌লো বেজে। কবীর বলে, বীর সাধক যদি একবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তবে সকল কাপুরুষতা দূর হয় সেখান থেকে।"

এ অধ্যাত্ম-সংগ্রাম বড় কঠোর, ইহাতে বিরতি নাই, স্বল্পস্থায়ীও মোটেই নয়। এ সংগ্রামের স্বরূপ, উদঘাটন করিয়া বলিতেছেন—

সাধকো খেল তো বিকট বেঁড়া মতী,
সতী ঔর সুরকী চলে আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা,
সতী ঘমসান পল এক লাগৈ।
সাধ সংগ্রাম হৈ
রৈন দিন জুঝ্‌না,
দেহ পরজন্তকা কাম ভাঈ।

অর্থাৎ সাধুদের কর্ম্মের ভেতর রয়েছে অদ্ভুত প্রয়াস, সতী আর বীরের কর্ম্মের চাইতেও তা তীব্রতর। বীর ঘোরতর যুদ্ধ করে দু'চার পলকের জন্য, সতীর যুদ্ধেও লাগে এক পলক। কিন্তু ভাই সাধুর সংগ্রাম চলে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া—যতদিন থাকে দেহ ততদিন দিবারাত চলে তাঁর এ সংঘাতময় জীবন।

নির্ভয়ে একান্ত নিষ্ঠায় কবীরদাস এ প্রেমসাধনা চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন, "ভাইরে স্বামীর সঙ্গে মিলন হওয়া বড় কঠিন কথা। চাতকের মত পিপাসার্ত্ত হয়ে 'প্রিয় প্রিয়' ব'লে ডাকৃতে হবে। দিনরাত পিপাসায় প্রাণ ধড়ফড় করছে তবুও ইচ্ছে হয়না জলপানের জন্য। শব্দ শুনে মৃগ ভয় পায়না, ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেয় প্রাণ—সতী যেমন আগুন দেখে ভীত না হয়ে হাসিমুখে চিতার ওপর উঠে স্বামীর করে অনুগমন ; কবীর বলে—হে ভাই সাধু শোন তেমনি তুমি আপন দেহের আশা ছাড়ো, নির্ভয়ে প্রভুর গুণ গাও, নইলে জন্ম যাবে ব্যর্থতায়।"

নিরন্তর সংগ্রাম, কঠোর ত্যাগ ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের মধ্য দিয়া কবীরদাসের প্রেমসাধনার এ অভিযাত্রা। পদে পদে ইহাতে রহিয়াছে দুঃসহ দুঃখ আর বিরহের যন্ত্রণা।

প্রেমভক্তি সাধনার এই দুর্গম পথে কবীর যে পাথেয় সঙ্গে নিবার কথা বলিলেন তাহা হইতেছে—নাম-জপ, ভজন এবং সেবা। একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এ পথে গুরুকৃপার শক্তি ভক্তজীবনে সঞ্চারিত হয়, নামিয়া আসে দিব্য করুণার ধারা।

কবীরের ভক্তিবাদে রহিয়াছে ভাব-জীবনের সংযম। নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও ত্যাগ-ব্রতের মধ্য দিয়া চলিয়া ইহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে।

নাথপন্থী যোগীদের প্রভাব তখনও তাঁহার বংশে, বারাণসীর এই জোলা পরিবারে কিছুটা ছিল। ইঁহাদের যোগদর্শন এবং কায়াসাধনের তত্ত্ব কবীরের ভক্তিবাদকে তাই কিছুটা প্রভাবিত না করিয়া পারে নাই। সুফী পীর তক্কিসাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তাঁহার উপর অনেকাংশে পড়ে। এজন্যই তাঁহার প্রচারিত তত্ত্বে ভক্তি, জ্ঞান ও কঠোর সাধনার সমন্বয় ঘটিতে দেখা যায়।

কবীর তাঁহার মত প্রচার করিয়াছেন স্বরচিত 'সাখী' (উপদেশ) এবং শব্দ-এর (সঙ্গীত) মাধ্যমে। সহজ ভাব ও ভাষার জন্য এগুলি জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে।

তিনি ছিলেন মরমী সাধক ও সিদ্ধপুরুষ, নিজের অনুভূত সত্য ও প্রজ্ঞার আলোক তাই সমাজ জীবনে ছড়াইয়া দিয়া যান। একাধারে সন্ত ও কবিরূপে, সিদ্ধসাধক এবং পতিত অন্ত্যজদের বন্ধুরূপে সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অন্তরে এক অসামান্য মর্য্যাদার আসন তিনি গ্রহণ করেন।

শুধু সমকালীন মানুষেরই অন্তরে নয়, হিন্দী ভাষার আসরেও কবীরদাসের কবিত্ব, তাঁহার অনুভূতির মাধুর্য্য ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কম প্রভাব বিস্তার করেন নাই। সিদ্ধ সাধকের দিব্য জীবনরস এই ভাষার পরতে পরতে ঢালা হইয়াছে, এমন দরদী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব হিন্দীভাষার ক্ষেত্রে এযাবৎ খুব কমই ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক

তত্ত্বের ব্যঞ্জনায় ও মর্ম্মস্পর্শিতা, উপমা ও রূপকের ব্যবহারে, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের কশাঘাতে কবীরের রচনাগুলি সমুজ্জ্বল।

কবীরের সময়ে এদেশে মুসলমান রাজশক্তি স্থায়ী ও সুদৃঢ় আসন নিয়া বসিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, প্রাচীন ও নবাগত এই দুই সমাজেই বাহ্য আচারের বড় প্রাবল্য। ভেদ বিসম্বাদের উগ্রতাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। এ সময়ে তিনি তুলিয়া ধরিলেন ধর্ম্মের শাশ্বত রূপটিকে, শুরু করিলেন ভক্তিধর্ম্ম ও আন্তর সাধনার কথা।

বাহ্বাস্ফোট ও ধর্ম্মীয় জাঁকজমক নিয়া যাহারা ব্যস্ত তাহাদের বিরুদ্ধে কবীরদাসের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ক্ষুরধার হইয়া উঠে। তাঁহার আঘাতে পুরোহিত ও মোল্লার দল ভীত হয়, আবার তেমনি জনসাধারণের মধ্যেও তাঁহার উদার ভক্তিবাদ ও আশ্বাসবাণী ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের চিত্তে ফুটিয়া উঠিতে থাকে ধর্ম্মের ঐক্যবোধ ও সার্ব্বজনীন আদর্শ।

বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানরত ব্রাহ্মণদের পরিহাস করিয়া কবীর কহেন—

মালা ফেরত জনম গয়া, গয়া ন মনকা ফের।
করকা মালা ছোড়কে মনকা মালা ফের!

অর্থাৎ, মালা ফেরাতে ফেরাতে তোমার এই জনম প্রায় কেটে গেল, মনের দ্বিধা সন্দেহ তবুও গেল না। ওগো, এবার থেকে তুমি মনের মালাটি ফেরাও।

সন্ন্যাসী যোগীর সাজে সজ্জিত সাধককে তিনি বিদ্রূপ করেন—

মন না রগাঁয়ে
রগাঁয়ে যোগী কাপড়া।
আসন মড়ি মন্দিরমে বৈঠে,
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লাগে পথ্‌রা।

অর্থাৎ, রে যোগী, মন না রাঙায়ে রাঙালি তুই কাপড়। আসন ক'রে বস্‌লি এসে মন্দিরে—সেথায় তুই পূজো কর্‌লি পাথর!

তেমনি মুসলমান মোল্লাকে উদ্দেশ করিয়াও তাঁহার শাণিত শ্লেষ প্রয়োগ করিতে ছাড়েন না।—

না জানৈ সাহব কৈমা হৈ।
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেবৈ,
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়কে পগ নেবর বাজে,
সো ভি সাহব সুন্‌তা হৈ।

অর্থাৎ, ওরে জানিনে তোর প্রভু কি রকম। মোল্লা হয়ে চেঁচিয়ে আজান দিস্‌,—কেন, তোর প্রভু কি বধির? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে বাজে যে নূপুর তাও তিনি শুনেন—তা কি তোর জানা নেই?

ধর্ম্ম ও সমাজকে এরূপে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া, প্রেম ভক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া কবীরদাস এক সহজতর সাধনার পথ সেদিন উন্মুক্ত করিয়া দিতে থাকে। মন্দির ও মসজিদ, শাস্ত্রাচার ও বাহ্য জীবনের সমস্ত কিছু ভেদবিভেদ ও গণ্ডীর উর্দ্ধে তাঁহার 'বেড়ুরী' বা সর্ব্ববন্ধনহীন ভক্তিবাদের চেতনাকে জাগ্রত করেন।

প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনের প্রতি তাঁহার এই তাচ্ছিল্য ও বিরোধিতা তৎকালীন সমাজনেতাদের উত্তেজিত করিয়া তোলে।

বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর কাছে অভিযোগ পৌঁছায়, নব সার্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, মুসলমান সাধক কবীর ধর্ম্মের সমস্ত কিছু আনুষ্ঠানিক অঙ্গকে বিদ্রূপ করেন, জনসমক্ষে হেয় করিয়া তুলেন। তাছাড়া, দেখা যায়, হজ, কাবা, মসজিদ, মোল্লা প্রভৃতি কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বাদশাহ্‌ সেবার জৌনপুরে আসিয়াছেন। এসময়ে তাঁহার দরবারে একদিন কবীরদাসের ডাক পড়িল।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কবীরদাস, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হ'য়েছে তা বড় গুরুতর। মুসলমান জোলার ঘরে জন্মে তুমি

ধর্ম্মের কোন অনুশাসনই মানৃছো না। তুমি কি ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রেছো? আসল কথাটি কি, সরলভাবে খুলে বল।"

কবীর উত্তর দিলেন, "হুজুর আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমার দেশ হচ্ছে অমরধাম, সেখানে জাতের বিচার নেই। আমার কাজ হচ্ছে, সে দেশের বার্ত্তা সকলকে জানানো।"

ইব্রাহিম লোদি নীরবে এই সাধকের কথাবার্ত্তা ও আচরণ লক্ষ্য করিতেছেন। সভায় উপবিষ্ট আমীর ওমারাহেরা ইতিমধ্যে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কি স্পর্দ্ধা এই তুচ্ছ জোলার! বাদশাহের দরবারে দাঁড়াইয়া কাহাকেও সে গ্রাহ্য করিতেছে না!

একটি অমাত্য আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "চুপ করো কবীরদাস। তোমার দুঃসাহস কিন্তু সকলেরই সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রেছে। বাদশাহের মুখের উপর এ কথাগুলো বলতে তোমার একটুও ভয় হচ্ছে না।"

কবীরদাস একেবারে অকুতোভয়। স্মিত হাস্যে কহিলেন—

কবীরা কাঁহাকো ডরে, শিরপর সৃজনহার।
হস্তী চঢ়ী ডরিয়ে নহী, কুতিয়া ভুক্তে হাজার॥

অর্থাৎ কবীর কাউকেই করে না ভয়, শিরের উপর তার রয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা। আচ্ছা, বলুন তো, হাতিতে চড়ে যে যাচ্ছে, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ রব তার কি ক'রবে?"

বাদশাহ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি উন্নতমনা। সাধক কবীরদাসের অবস্থাটি বুঝিয়া নিতে তাঁহার দেরী হইল না। সভাসদ্‌দের উত্তেজনা থামাইয়া তাঁহাকে তিনি সসম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন।

তিনি বুঝিয়া নিয়াছিলেন, এই সিদ্ধপুরুষকে রাজশক্তিবলে নিয়ন্ত্রণ করা সঙ্গত নয়—সম্ভবও নয়।

রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কবীরের আদর্শ তেমন সমাদর লাভ করে নাই, কিন্তু জনসাধারণের মর্ম্মে তাঁহার উদার ভাবধারা

প্রবেশ করিয়াছিল। সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের মরমিয়া সাধক ও সংস্কারপন্থী ধর্ম্মনেতাদের উপর তাঁহার জীবন ও বাণীর প্রভাব দীর্ঘ দিন ব্যাপিয়া দেখা গিয়াছে।

উত্তরকালের মরমিয়া সিদ্ধসাধক, দাদূ ছিলেন কবীরেরই এক প্রশিষ্য। তাছাড়া, আরও দেখি, কবিরের ভক্তি ও প্রেমের বাণী, সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় রচিত পদসমূহ পরবর্ত্তীকালে তুলসী-দাসের প্রচার পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করে। ভক্তকবি রইদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি কবীরের 'সাথী' ও 'শব্দ' শ্রবণ করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত হইতেন।

গুরু নানক তাঁহার কাশীপরিক্রমার সময়ে কবীরের দোঁহা ও ভজন সঙ্গীতগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের অনেক জায়গায় কবীরের বাণীর ছায়া পড়িতে দেখা যায়। পবিত্র গ্রন্থসাহেবের নানা-স্থানে ইহার সন্ধান মিলে।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের যে সমন্বয় আদর্শ কবীরদাস প্রচার করিতেন নানকের প্রচারিত তত্ত্বের উপর তাহর ছায়া কম পড়েনাই।

অযোধ্যার জগজীবনদাস, মালবের বাবালাল, গাজীপুরের শিব-নারায়ণ, আলোয়ারের চরণদাস প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায়ের জীবনে কবীরের আদর্শে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাহার মতবাদ উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করিতেও সে সময়ে কম সাহার্য্য করে নাই।

কাশীর গোঁড়া মুসলমান ও রাজপ্রতিনিধিরা ইহাদের সংস্কারপন্থী ধর্ম্মমতকে কোনদিনই সুচক্ষে দেখিতেন না। ইঁহাদের আক্রোশে ও বিরোধিতায় কবীর উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর রহিয়াছে অগণিত ভক্ত দর্শনার্থীর ভীড়। নির্জ্জনতা প্রয়াসী কবির এবার তাই বারাণসী ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

প্রথমে ফতেপুর জেলার গঙ্গাতীরস্থ মানিকপুরে তিনি সাধনভজন করিতে থাকেন। হইার পর কিছুকাল অবস্থান করেন এলাহাবাদের

অপর তীরে ঝুঁসির চরায়। এইখানে সুফী সিদ্ধ ফকীর, তক্কী সাহেবের সহিত কবীরদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। ইঁহার নিকট নানা নিগূঢ় সাধন লাভ করিয়া তিনি উপকৃত হন।

কবীরের সাধনজীবন এবার পূর্ণ পরিণতির দিকে আগাইয়া আসিতেছে। তিনি বুঝিতেছেন, এ মর দেহ এবার ছাড়িতে হইবে।

প্রাণ মন তাঁহার সদাই চায় ইষ্টধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতে আর আত্মাবগাহন করিতে। গোরখ্‌পুর জেলার মগহ্‌র-এ একান্ত বাসের জন্য তিনি রওনা হইলেন। ভক্ত ও অনুরাগীর দল তাঁহাকে পবিত্রভূমি কাশীতে ফিরাইয়া নিতে ব্যাকুল, এ দেহ যদি তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হয় কাশী ছাড়িয়া মগহ্‌র-এ যাওয়া কেন? বারবার তাঁহারা অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন।

কবীর কিন্তু স্থিরসঙ্কল্প, শুভার্থী বন্ধু ও ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া স্মিত হাস্যে কহিলেন—

জস্ কাশী তস্ মগহ্‌র উষর
হিরদৈ রাম সতি হোঈরে।

অর্থাৎ, কাশী আর মগহ্‌র দুই-ই উষর—পরম সত্য বস্তু হচ্ছেন হৃদয়স্থিত রাম। কাজেই মগহ্‌র-এ বাস করিতে যাওয়ায় তাঁহার তো ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাই।

শত শত শিষ্য ও অনুরাগীর দল এই সময়ে ভক্ত কবীরদাসের সঙ্গ নেয়, তাঁহার সাথে সেখানেই অবস্থান করিতে থাকে। আর এদিকে কাশীর ভক্তদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠে।

মগহ্‌র-এর এক প্রান্ত দিয়া বহিয়া চলিয়াছে স্নিগ্ধ, স্বচ্ছতোয়া অমী নদী। ইহারই তীরে অরণ্য অঞ্চলে এক প্রাচীন সাধুর পরিত্যক্ত পুরাতন কুটির পাওয়া গেল। বৈরাগী কবীরদাস এই ভগ্ন কুটিরটিতেই আসন বিছাইয়া বসিলেন।

পরম লগ্নটি ক্রমে আসিয়া পড়িতেছে, প্রেমভক্তির রস-সমুদ্রে

মহাসধক একবার ভাসিতেছেন আবার ডুবিতেছেন। প্রাণ প্রভুর রসে তিনি হইয়া উঠিয়াছেন রসায়িত।

শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যের জন্য, উপদেশামৃতের জন্য শয্যার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু প্রেমমত্ত সিদ্ধপুরুষের কোথায় অবসর ? হুঁসই বা কোথায় ?

চরখা চলৈ সুরত বিরহিনকা
কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর
মহল বনা চেতনকা।
সুরত ভাঁবরী হোত গগনমে'
পীঢ়া জ্ঞান-রতনকা।
মিহীন সূত বিরহিন কাতৈঁ,
মাঁঝা প্রেম-ভকতিকা।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
মালা গূথোঁ দিন রৈনকা।
পিয়া মোর ঐহৈঁ পগা রখিহৈঁ
আঁসু ভঁট দেহোঁ নৈনকা।

—সুরতি-বিরহিনীর চরখা চলছে। কায়ানগরী রচিত হয়েছে অতি সুন্দর, তাতে রয়েছে চেতনার মহল। গগনে, অর্থাৎ, সহস্রারে সুরতিরূপী বধূ ও বরের চল্‌ছে অগ্নি-প্রদক্ষিণ—আর তাদের জন্য রাখা হয়েছে জ্ঞান-রতনের পিঁড়ি। বিরহিনী কেটে চলেছে মিহি সূতো, পরেছে প্রেমভক্তির হলুদরঙা বিয়ের শাড়ী। কবীর বলছে, ভাই সাধু শোন, ঐ সূতো দিয়ে দিন আর রাতের মালাগাছা তৈরী ক'রে ফেল। প্রিয় আমার কর্‌বেন পদার্পণ, অশ্রুজলে দেব তাঁকে আমার প্রেমের ভেট।

বিরহসন্তপ্ত কবীরদাসের হৃদয়ে এক একদিন পরমপ্রভুর এই বহু প্রতীক্ষিত পদার্পণ ঘটে। মিলনের আনন্দে সিদ্ধ সাধক বিভোর হইয়া উঠেন, এ আনন্দ বিচ্ছুরিত হয় অণুপরমাণুতে আর সর্ব্বসত্তায়।

বড় সহজ, বড় স্বছন্দ তাঁহার এই দিব্য মধুর অনুভূতি ও আনন্দ-অবগাহন! কবীর ইহাকে বলিয়াছেন সহজ সমাধি—

আঁখ ন মূঁদূ কান না রূঁধূ,
কায়া কষ্ট্ ন ধারূঁ।
খুলে নৈন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ
সুন্দর রূপ নিহারূ।
কহূঁ সো নাম সুনূ সো সুমিরন
জো কছু করূঁ সো পূজা।
গিরহ-উদ্যান এক সম দেখুঁ,
ভাব মিটাউ দূজা।
জহঁ জহঁ জাউঁ সোঈ পরিকরমা,
জো কছু করূ, সো সেবা।
জব সোউ, তব করূ দণ্ডবত,
পূজু ঔর ন দেবা॥

অর্থাৎ, এ অবস্থায় আমি আঁখি মুদিনে, কাণ করিনে রুদ্ধ, দেহকে কষ্ট দিইনে। স্মিত হাস্তে নয়ন মেলে আমি তাকাই, সুন্দর সে রূপ করি নিরীক্ষণ। যা বলি তা-ই হয়ে যায় নাম, যা শুনি তাই হয় তাঁর স্মরন, যা কিছু কাজ তাই হয় তার পূজো। গৃহ আর উদ্যান আমি দেখি, দ্বৈতভাব দিই মিটিয়ে। যেখানে যেখানে যাই, তাই হয় আমার প্রভুর পরিক্রমা, যা কিছু করি তাই হয় তাঁর সেবা। শয়ন হয়ে ওঠে আমার দণ্ডবৎ—দেবতার পূজা করা তো আর হয়ে ওঠে না!

এই সহজ সমাধি, এই দিব্য সুরতির মধ্য দিয়াই পরম প্রাপ্তির মহালগ্নটি একদিন ঘনাইয়া আসে। কবীরদাস ব্রহ্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন—'হংস পায়ে মানস সরোবর'।

অমী নদীর তটে ক্ষুদ্র কুটিরটিতে ভক্তেরা কবীরকে ঘিরিয়া বসেন ভক্ত-ভগবানের মিলনের আনন্দবার্ত্তা শুনিতে সকলে আগ্রহ অধীর।

দুই একটি কথা যদি বা সংগ্রহ করা যায়, তাহাই যে হইবে তাঁহাদের সাধন-জীবনের পরম পাথেয়।

শত শত 'সাখী' ও 'শব্দের' যিনি রচয়িতা, প্রেম ও ভক্তিসঙ্গীতের রসে এতকাল সিক্ত করিয়াছেন আপামর জনসাধারণকে আজ তিনি মৌনের গভীরে প্রবিষ্ট, আত্মসমাহিত। ভক্তেরা বাণীর জন্য অনুনয় বিনয় করিলে বলিলেন—

কবীর জম হম গাওয়াতে
তব ব্রহ্ম জানা নহী̐।
অব ব্রহ্ম দিল্‌মে দেখা,
গাওন কু কছু নহী̐।

অর্থাৎ আমি কবীর যখন পরম প্রভুর স্তবগান কর্‌তাম তখন ব্রহ্মের তত্ত্ব কিছু ছিল না জানা। এখন আমি ব্রহ্মকে ক'রেছি দর্শন হৃদয়পটে, গান করার তাই আর তো কিছু নেই!

সাধক ভক্তেরা ছাড়েননা, মিনতি করিয়া বলেন, যে প্রভুর সাথে আনন্দে রসে এতদিন কাটিয়েছেন, শেষের দিনে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন আমরা শুনি।"

প্রাণপ্রভুর স্বরূপের বর্ণনা? সে কি? সে যে এক অসম্ভব কথা! কবীরদাস তাই শুধু কহিলেন—

কহনা থা সো কহ দিয়া,
অব্‌ কুছ কহা ন জায়।
একা রহা দূজা গয়া,
দরিয়া লহর সমায়
উনমুনিসোঁ মন লাগিয়া,
গগনহিঁ পহুচা আয়।
চাঁদ-বিহূনা চাঁদনা
অলখ নিরঞ্জন রায়॥

অর্থাৎ—আমার বলার যা কিছু ছিল তা তো দিয়েছি ব'লে—এখন

আর তো কিছু যাবে না বলা। তুই চলে গিয়ে রয়েছে—এক, নদী এবার প্রবেশ ক'রেছে সাগরে। সমাধিতে মগ্ন হয়েছে মন—পোঁছে গিয়েছে গগনের মহাশূন্যে। চাঁদবিহীন চাঁদনী—অখণ্ড মহাজ্যোতি রয়েছে বিরাজিত। ওরে এই তো আমার প্রভু অলখ্ নিরঞ্জন!

মর জীবনের শেষ অধ্যায়টি এবার সমাপ্ত হইয়া আসিল। অন্তরঙ্গ ভক্তদের ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কবীরদাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সহস্র সহস্র শোকার্ত্ত শিষ্য ও ভক্তের সমাগমে মগহ্‌র-এর নদীতট সেদিন জনপূর্ণ হইয়া উঠে, মহাপুরুষের উদ্দেশে তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।

কবীরদাসের দেহের সৎকার সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী শোনা যায়। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। হিন্দুরা এ দেহের অগ্নিসংস্কার করিতে চান, কিন্তু মুসলমানেরা সম্মত নন, কবর দিবার জন্য তাঁহারা কোমর বাঁধেন।

এই আসন্ন সংঘাতের মুখে সিদ্ধপুরুষ কবীরদাসের অলৌকিক বাণী শোনা যায়। শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে মৃত দেহটি ঢাকা রহিয়াছে, প্রত্যাদেশ অনুযায়ী আচ্ছাদন খুলিয়া দেখা গেল, দেহটি অন্তর্হিত হইয়াছে, পড়িয়া আছে একরাশ পদ্মফুল।

কথিত আছে, হিন্দুরা কিছু সংখ্যক ফুল কাশীতে নিয়া যান, এগুলি সেখানে যথারীতি সৎকার করেন। আজিও সেখানকার কবীরচৌরায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মুসলমান ভক্তেরা অবশিষ্ট ফুলগুলি মগহ্‌র-এ কবরস্থ করিলেন। এই সমাধি স্থানটি উত্তরকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদেরই এক পবিত্র তীর্থরূপে পরিচিত হইয়া উঠে। আজিও শত শত ভক্তসাধক কবীরদাসের এই পবিত্র সমাধিমন্দির দর্শন করিতে আসে ও দণ্ডবৎ করিয়া কৃতার্থ হয়।

গোস্বামী শ্যামানন্দ

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ। বাংলা ও উড়িষ্যার অধ্যাত্মজীবনে এসময়ে প্রেমভক্তির বান ডাকিয়া উঠে, শ্রীচৈতন্যের উৎসারিত ভাব-তরঙ্গ দিকে দিকে উচ্ছলিত হইতে থাকে। বর্দ্ধমানের অম্বিকা-কাল্‌নাও সেদিন এ সৌভাগ্য হইতে বাদ পড়ে নাই।

মহাবৈষ্ণব গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য। ইনিই তৎকালীন কাল্‌নার ভক্ত সমাজের মধ্য-মণি। অমৃত সন্ধানী ভক্তজন নানাদেশ হইতে আসিয়া ইহারই চরণতলে সমবেত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের গৌর-বিগ্রহের মন্দির প্রাঙ্গণে সদাই তরঙ্গিত হইতে থাকে নাম-কীর্ত্তনের আনন্দধারা।

সন্ধ্যারতির অনুষ্ঠান সেদিন থামিয়া গিয়াছে। হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর প্রাঙ্গণে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভুর লীলা-কথা কহিতেছেন। ব্যাকুলহৃদয় এক কিশোর ভক্ত সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইল।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিল, "প্রভু, বহু দূর থেকে বড় আশা ক'রে আজ কাল্‌নায় এসেছি। আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক ক'রবো, এই হচ্ছে আমার একান্ত অভিলাষ। কৃপা ক'রে চরণাশ্রয় দিন।"

অপূর্ব্ব দৈন্য ও আর্ত্তির ছাপ এই কিশোর বৈরাগীর চোখে-মুখে। হৃদয়চৈতন্যের হৃদয়ে করুণা জাগিয়া উঠিল। দুই বাহু প্রসারিয়া তিনি তাহাকে বুকে নিলেন।

সযত্নে পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় তোমার নিবাস, কি পরিচয়? কি ক'রে ঠাকুরের আশ্রয় লাভের এ সঙ্কল্প অন্তরে উদিত হয়েছে? সব আমায় খুলে বল?

উত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে ঠাকুর মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

উড়িষ্যার ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে কিশোরের বাস স্থান। অম্বিকা-কাল্‌নার এই শ্রীমন্দির লক্ষ্য করিয়া সে পদব্রজে ছুটিয়া আসিয়াছে। কবে কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নাম তাহার কানে প্রবেশ ক.র, মনে মনে বরণ করে দীক্ষাগুরুরূপে।

উড়িষ্যা হইতে বাংলা—দীর্ঘ বন্ধুর অরণ্যময় পথ অতিক্রম করিয়া আজ সে এখানে উপস্থিত। নিরন্তর পথ পর্য্যটনে পা দুটি রক্তাক্ত, দেহ অবসন্ন। কিন্তু দুই নয়নে এই কিশোর ভক্ত বৈরাগ্যের শিখাটি ঠিকই জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। অন্তরে চলিতেছে কৃষ্ণনামের মৃদু গুঞ্জরণ।

আচার্য্য স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বাছা, তোমার নামটি তো আমায় এখনো বল্‌'ল না!"

উত্তর হইল, "দুঃখী।"

অধ্যাত্মজীবনের পরম অধিকারী এই নবাগত ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়াই আচার্য্যের নয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "না বাবা, তুমি শুধু 'দুঃখী' নও, তুমি যে দুঃখী-কৃষ্ণদাস! জন্মজন্মান্তরের কৃষ্ণদাস তুমি, তাই তো প্রভুর চিরবিরহের ব্যথা অন্তরে চেপে তুমি দুঃখী সেজে আছো। আজ হতে এটাই হ'ল তোমার নব নামকরণ। আমি এই গৌর-বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে তোমায় আজ দীক্ষা দেব। যেটুকু আশ্রয় দেবার শক্তি আমার আছে, তা তুমি অবশ্য পাবে।"

এই দুঃখী এবার হইতে অম্বিকা-কাল্‌নার বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া উঠে দুঃখী-কৃষ্ণদাসরূপে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মধ্য দিয়া সে আগাইয়া চলে অমৃতময় মহাজীবনের পথে।

দুঃখীর পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, জাতিতে তাঁহারা সদ্‌গোপ। পূর্ব্বে বাস ছিল বাংলাদেশের দণ্ডেশ্বর গ্রামে। কালক্রমে মণ্ডল পরিবার উড়িষ্যার ধারেন্দা-বাহাদুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তানের অকাল মৃত্যু হওয়ায় কৃষ্ণ মণ্ডল ও তাঁহার পত্নী দুরিকার মনে দুঃখের সীমা নাই। শেষের দিকে কিন্তু একটি সন্তান তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকে। নিজেদের দুঃখের পরিবেশে জন্ম, তাই মাতা-পিতা নাম রাখিলেন, দুখীরাম। গ্রামের লোকে দুঃখী বলিয়াই ডাকিত। এই বালকই উত্তরকালের গোস্বামী শ্যামানন্দ।

শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্ত এই মহাসাধক সমগ্র উড়িষ্যার ভক্ত সমাজের নেতারূপে আবির্ভূত হন। শত শত উড়িয়া বৈষ্ণব ইঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করে পরমাশ্রয় লাভে ধন্য হয়।

জনক জননীর অভিলাষ, তাঁহাদের আদরের দুঃখীরাম যেন এক মহাপণ্ডিতরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বালককে তোড়জোড় করিয়া গ্রামের সংস্কৃত টোলে পাঠানো হইল। দুঃখীরামের বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় পাইয়া শিক্ষকেরা তো অবাক। লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী এই বালক, দিনের পর দিন অতি দ্রুত সে তাহার পাঠসমূহ শেষ করিয়া ফেলে, দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ অল্পায়াসে আয়ত্ত করিতে থাকে।

দুঃখীরাম ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। কিন্তু বড় অদ্ভুত ধরণের ছেলে সে। এই অপরিণত বয়সেই তাহার মধ্যে দেখা দেয় তীব্র বিষয়-বিরক্তি। সহজাত ভক্তির আবেগ নিয়া সে জন্মিয়াছে, সমগ্র জীবনখানি সেই ভক্তিপথের জন্যই সদা উন্মুক্ত।

নিতাই গৌরাঙ্গের পুণ্যময় জীবনের স্পর্শ বাংলা ও উড়িষ্যায় আনিয়া দিয়াছে নব জীবনের উন্মেষ। কিশোর দুঃখীরামের জীবনেও লাগিল এই 'সোনার কাঠির' ছোঁয়া।

কিশোর ভক্ত স্থির করিল—গৃহত্যাগ করিয়া সে বৈষ্ণবীয় সাধনা গ্রহণ করিবে। কাল্‌নার পরম ভাগবত হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নাম আগেই সে শুনিয়াছে। তাঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণের এক প্রবল আকুতি কি জানি কেন অন্তরে জাগিয়া উঠিল।

জনক-জননীর নিকট তাহার এ সঙ্কল্পের কথা দুঃখীরাম সেদিন

ব্যক্ত করিয়া বসে। কিন্তু, একি মর্ম্মান্তিক কথা ? অপরিণত বয়স্ক বালক একি অসম্ভব প্রস্তাব শোনাইতেছে ?

দুঃখীরাম বলে, "আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, দীক্ষা ও সাধনহীন জীবন পশুরই জীবন। অম্বিকা-কালনার বৈষ্ণবাচার্য্য হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের কাছে আমি দীক্ষা ও ভেক গ্রহণ ক'রতে যাবো। তোমরা আজ আমায় সম্মতি দাও।"

শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ও দুরিকার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনভিজ্ঞ বালক জনক-জননীর সান্নিধ্য ও গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছে ? কোন্ অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাহিতেছে।

মাতার অশ্রু, পিতার খেদোক্তি, কোনকিছুই দুঃখীকে টলাইতে পারিল না। আশ্বাসবাক্যে উভয়কে প্রবোধিত করিয়া তাঁহাদের চরণ-ধূলি নিয়া কাল্‌নার দিকে সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া পড়িল।

হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের গৃহে এক গৌর-বিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছে। দীক্ষাদানের পর আচার্য্য তাঁহার এই বিগ্রহের সেবায় দুঃখী-কৃষ্ণদাসকে নিয়োজিত করিলেন।

নবীন সাধকের আনন্দের আর সীমা নাই। সোৎসাহে গুরুদেবের নির্দ্দেশিত সাধন তিনি শুরু করিলেন।

দুঃখী-কৃষ্ণদাস আজ তাঁহার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কঠোর তপশ্চর্য্যা ও বৈষ্ণবীয় আচার নিষ্ঠার মধ্য দিয়া এ সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করিতে লাগিলেন।

বিগ্রহের স্নানের জন্য প্রতিদিন নবীন শিষ্যকে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে হয়। ইহাই গুরুর আদেশ। নদীর ঘাট বেশ খানিকটা দূরে আর জলের ভাণ্ডটিও ভারী বৃহদাকার। এই জল রোজ বহুবার তাঁহাকে বহন করিতে হয়, ক্রমে এসময়ে তাঁহার মাথায় এক দুরারোগ্য ঘা জন্মিয়া গেল। কিন্তু গৌর-বিগ্রহের সেবায় তিনি আত্মহারা! এদিকে দৃষ্টি দিবার আর অবসর কোথায় ?

সেদিন দুঃখী-কৃষ্ণদাশ গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন, শিষ্যের শিরে হাত ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া ঠাকুর মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। মস্তকে যে এক বৃহৎ ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে! প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, গঙ্গাজল বহন করার ফ:ল এ ঘায়ের সৃষ্টি। সেবায় বিঘ্ন হইবে বলিয়া ভক্ত নিত্যকার কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই।

তরুণ শিষ্যের এই সেবানিষ্ঠা দেখিয়া হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। অপার সন্তোষে দুঃখী-কৃষ্ণদাশকে তিনি প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

আচার্য্য স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে সেদিন কহিলেন, "বাবা, আমি বুঝতে পারছি তোমার সামনে এগিয়ে আসছে প্রেম-ভক্তি সাধনার বিরাট সম্ভবনা। আমার ইচ্ছে, তুমি অবিলম্বে বৃন্দাবনে যাও, গিয়ে শ্রীজীব গেস্বামীর আশ্রয়ে থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে তোমার মত আচার্যের প্রয়োজন রয়েছে।"

একি নিদারুণ কথা গুরুদেবের মুখে! কৃষ্ণদাসের চোখে নামিয়ে আসিল অশ্রুধারা। গুরুদেবের মধুর সান্নিধ্য ও সেবা ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইতে অনিচ্ছুক। গুরুও তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, গুরু সেবার অর্থ হচ্ছে গুরুকে সুখ দেওয়া। আমার যাতে সুখ হবে, সেই কাজই তো তোমার করা উচিত? আমি বল্‌ছি তুমি বৃন্দাবনধামে গিয়ে বাস করলেই আমি আনন্দিত হবো। তাই তুমি কর!" অতপর গুরুর আজ্ঞা পালন না করিয়া আর গত্যন্তর রহিল না।

ব্রজমণ্ডলের কর্ত্তা তখন শ্রীজীব গোস্বামী, ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য তাঁহার নিকট এক অনুরোধপত্র প্রদান করিলেন। এ পত্র সঙ্গে নিয়া গুরুর চরণ বন্দনার পর দুঃখী-কৃষ্ণদাস কাল্‌না ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও অন্যান্য বৈষ্ণব তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি বৃন্দাবন উপস্থিত হন।

রঘুনাথদাস গোস্বামীর সাধনপ্রভাব সে সময়ে সারা ব্রজমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। পবিত্র রাধাকুণ্ডের তীরে প্রেমভক্তির এই সমর্থ সাধক এক নব বৃন্দাবনের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। কুণ্ডতীরস্থিত তাঁহার ভজনকুটিরকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে বহু বৈষ্ণবের সাধনস্থল গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্রজধামে পৌঁছিয়াই দুঃখী-কৃষ্ণদাস রঘুনাথদাস গোস্বামীর কুটিরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। তরুণ সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী প্রভুর আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল।

সস্নেহে কহিলেন, "বৎস, তোমার গুরুর নির্দ্দেশ রয়েছে, শ্রীজীবের কাছে থাক্‌বার জন্য। অবিলম্বে সেখানেই তুমি যাও' শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার ভিত্তিকে আগে দৃঢ় ক'রে তোল।" তখনি একজন সেবক সঙ্গে দিয়া দুঃখী-কৃষ্ণদাসকে তিনি শ্রীজীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অসামান্য বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি দুঃখী-কৃষ্ণদাস, সাক্ষাৎ হইবামাত্র শ্রীজীব তাঁহাকে ভালো না বাসিয়া পারেন নাই। হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের অনুরোধলিপি পাঠ করিয়া এই তরুণ বৈষ্ণবকে তিনি সানন্দে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

বৈষ্ণব সমাজের একপত্রী পণ্ডিত, শ্রীজীবের নিজ শিষ্যরূপে দুঃখী কৃষ্ণদাসের জীবনে উন্মোচিত হইয়া গেল এক নূতনতর অধ্যায়। দুঃখী কৃষ্ণদাস অচিরে ব্রজমণ্ডলে সুপরিচিত হইয়া উঠেন সাধকমণ্ডলীতে। পাইতে থাকেন অসামান্য মর্যাদা।

অতঃপর নিয়মিতভাবে তিনি আচার্য্যের কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করা শুরু করিলেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ইহার পূর্বেই বৃন্দাবনে আসিয়া গিয়াছেন। মহান্ বৈষ্ণব নেতা শ্রীজীবের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারা হইতেছেন শাস্ত্রপারঙ্গম।

এই তিন সতীর্থ মহা প্রতিভাধর, সাধননিষ্ঠাও ইঁহাদের অপূর্ব্ব। ধীরে ধীরে ইঁহাদের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ও আত্মিক বন্ধন গড়িয়া

উঠে। বাংলা ও উড়িষ্যার ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসকে উত্তরকালে এই ত্রয়ী সুহৃদ নানাভাবে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পরের কথা, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত তখন রচিত হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা স্থির করেন, এবার এই অপূর্ব্ব অমৃতকে বাংলা দেশেও পরিবেশন করিতে হইবে। শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের শাস্ত্রগ্রন্থাদির সংখ্যা কম নয়। তাই কিছুদিন যাবৎ বৈষ্ণবেরা এগুলির প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। এবার তাহা কার্য্যে রূপায়ত হইতে চলিল।

আচার্য শ্রীজীবই তখন বৃন্দাবনের গোস্বামী সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারই ব্যবস্থাপনায় এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থাদিসহ শ্রীনিবাসকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। তাঁহার সহকারীরূপে যান নরোত্তম ঠাকুর ও দুঃখী-কৃষ্ণদাস—পরে যিনি পরিচিত হন শ্যামানন্দ নামে।

বিষ্ণুপুরে পৌঁছবার পথে এক দুর্ঘটনা ঘটে, দস্যুদের দ্বারা পথমধ্যে এই অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের পেটিকা লুণ্ঠিত হয়।

এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে নবীন প্রচারকেরা মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। শ্যামানন্দ চলিয়া যান নিজ দেশ উড়িষ্যায়, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।

উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম্মের সংগঠন ও প্রসার শ্যামানন্দের এক বিরাট কীর্ত্তি। স্বীয় কর্ম্মকেন্দ্র হইতে উত্তরকালে মাঝে মাঝে তিনি বৃন্দাবনে আসিতেন। শ্রীজীবের চরণপ্রান্তে বসিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব আহরণ করিয়া ফিরিতেন আপন দেশে।

পাণ্ডিত্য অধ্যাত্ম-সাধনার বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায় না—এমন সৌভাগ্য সাধনজীবনে বিরল। কিন্তু দুঃখী-কৃষ্ণদাসের জীবনে এই সৌভাগ্যোদয় দেখা গিয়াছিল।

শ্রীজীবের কুটিরে নিয়মিতভাবে ভক্তিশাস্ত্রের পাঠ তিনি গ্রহণ

করিতেন, কিন্তু এই সঙ্গে ভজননিষ্ঠা ও বিগ্রহসেবা একদিনের তরেও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। ভক্তসাধক উপলব্ধি করেন, সেবাই ভক্তিশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত, তাই এ সেবাকার্য্যে তিনি সদাই থাকিতেন তৎপর। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরে দুঃখী-কৃষ্ণদাস ঝাড়ুদারের কার্য্যে ব্রতী হইয়া পড়েন। তাঁহার অন্তরের বড় আশা, রাধারাণীর চরণ দর্শন করিয়া এজীবন ধন্য করিবেন।

মন্দির-অঙ্গন কৃষ্ণদাস প্রত্যহ বারবার ঝাঁট দেন, রাধাগোবিন্দের আনন্দলীলা স্মরনে মত্ত থাকেন। বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেবীর কৃপা কবে হইবে, সখীমঞ্জরী পরিবৃত রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত নিকুঞ্জ-বিহার কবে দর্শন করিবেন, ইহারই জন্য দিন গুনিয়া চলেন।

রাত্রির তখন শেষ ষাম। দুঃখী-কৃষ্ণদাস নিদ্রা হইতে উঠিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে নিকুঞ্জ মন্দির পরিষ্কার করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বাহিরের অঙ্গনে এক কোণে একটি চক্‌চকে বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে।

তাড়াতাড়ি সে দিকে তিনি আগাইয়া গেলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! এ যে একগাছা অপরূপ স্থবর্ণ নূপুর। শেষ রাত্রির অস্ফুট আলোকেও উহা জ্বলজ্বল করিতেছে।

এ বস্তু দর্শন করিবার পরই দুঃখী-কৃষ্ণদাসের হৃদয়ে জাগিল এক অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলতা। ভূমিতে পড়িয়া কেবলই গড়াগড়ি দিতেছেন আর অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাকার তাঁহার দেহে উদ্‌গত হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে কৃষ্ণদাস উঠিয়া বসেন। সোনার নূপুরটি তিনি ভক্তিভরে করপুটে তুলিয়া ধরেন। আরো এক আশ্চর্য কাণ্ড! অপরূপ ঔজ্জ্বল্যের সাথে এক দিব্য সৌরভও ইহা হইতে বাহির হইতেছে!

দুঃখী কৃষ্ণদাসের অন্তরে হঠাৎ জাগ্রত হইল এক পরম উপলব্ধি! এ স্বর্ণ নূপুর তো কোন প্রাকৃতিক বস্তু নয়! অন্তরাত্মা হইতে কে যেন

ডাকিয়া বলিতেছে, "ওরে, পরম ভাগ্যবান তুই, পেয়েছিস্ প্রিয়াজীর চরণ-নূপুর !"

দুঃখী-কৃষ্ণদাসের নয়ন হইতে কেবলি অশ্রু ঝরিতেছে, আর সখেদে বলিতেছেন, "কৃপাময়ী রাধে ! এ কাঙালের প্রতি কৃপা যদি হ'লোই তবে নূপুর দিয়েই ভুলিয়ে রাখলে কেন ? চরণকমল তাকে দাও, দয়া ক'রে আবির্ভূতা হও।"

কিন্তু এ কি ! এ যে বিস্ময়ের উপর আর একবিস্ময়। ভাব বিহ্বল সাধকের দৃষ্টি সমক্ষে আবার এ কোন্ দিব্য লীলার দৃশ্যপট উন্মোচিত হইতেছে।

দশ এগারো বৎসরের এক পরমা সুন্দরী বালিকা চঞ্চলপদে এসময়ে নিকুঞ্জ মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। দুঃখী-কৃষ্ণদাসকে সে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে' "এ ভাইয়া, একঠো সোনেকা নূপুর তুমকো মিলা হ্যায় ?" অর্থাৎ—ভাই, একটা সোনার নূপুর কি পেয়েছো ?

কৃষ্ণদাস পুলকাঞ্চিত দেহে উত্তর দিলেন, "হ্যাগো, নূপুর একটা আমি পেয়েছি। কিন্তু এটা কা'র তা বলতে পারো ?"

কিশোরী যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই—তাহার সঙ্গিনীর একটি সোনার নূপুর কাল রাতে হারাইয়াছে। তিনি রাজনন্দিনী, বয়সে তরুণী, সহসা লোকের সম্মুখে আসিতে তাঁহার বড় সঙ্কোচ। তাই তাহাকে খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাস কৌশল করিয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি সত্য কথা বলছো কিনা তা ক'রে জানবো ? যাঁর নূপুর তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এই নূপুরটির সাথে তাঁর চরণ মিলিয়ে নিয়ে তবে আমি তোমার কথা বিশ্বাস ক'রবো। যদি সত্যিই এটি তোমার সখীর হয়, তবে তাঁর চরণে আমি স্বহস্তে পরিয়ে দেবো, নইলে পাবে না।"

কৃষ্ণদাস নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল। বালিকা একথার পর অন্তর্হিত হইয়া যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসে। এবার সাথে রহিয়াছেন রাজনন্দিনী সখীটি।

ভক্ত দুঃখী-কৃষ্ণদাসের দেহে খেলিয়া গেল অদ্ভুত পুলক শিহরণ! নবাগতা কিশোরীর সারা অঙ্গে স্বর্গীয় রূপমাধুরী উচ্ছলিত। সে দিকে তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা দুই সখী এই গভীর রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে কেন এসেছিলে, তা আমায় বল্‌তে হবে।"

সুধাস্রাবী কণ্ঠে নূপুরের অধিকারিণী এবার স্বয়ং উত্তর দিলেন, "মঁয় বহুত ক্যা কহুঙ্গি? ইয়ে তো মেরা নিকুঞ্জ মন্দির হ্যায়। অব্ তুম্ সব্ সমঝ্ লেও। জ্যাদা হট না করো। দেখো সুবহ্ হোনেকে আয়া। মেরা নূপুর তো লওটা দো!" অর্থাৎ, বেশী বলবার কি আর আছে? এ যে আমারই নিকুঞ্জ মন্দির—তুমি এবার সব কিছু নিজেই বুঝে নাও। আর দেরী না ক'রে শিগ্‌গীর আমার নূপুর ফিরিয়ে দাও, ঐ ছাখো ভোর হয়ে আসছে।

সাধক কৃষ্ণদাসের নয়নের আবরণ কে যেন ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিতেছে। সর্ব্বসত্তা দিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা এই রাজনন্দিনী আর কেউ নন, কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারাণী! সঙ্গিনী কিশোরী তাঁহারই সখী ললিতা। কৃপা করিয়া বৃষভানুনন্দিনী আজ তাঁহাকে দেখা দিয়েছেন। হারানো নূপুর উদ্ধারের ছলে আজ দুঃখী কৃষ্ণদাসের উদ্ধারের জন্য প্যারীজীর এ কারুণালীলা!

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, যুক্তপাণি কৃষ্ণদাস প্রার্থনা জানাইলেন, "রাধারাণী, যদি এই অধমকে এতই কৃপা ক'রলে তবে একবার নিজ স্বরূপ দেখিয়ে তাকে কৃতার্থ কর, দেবী।"

প্যারীজী স্মিতহাস্যে কহিলেন, "ইন আঁখোসে মেরা সত্য রূপ তুম্ ক্যা দেখ্ সকোগে?" অর্থাৎ, এই চোখ দিয়ে তুমি আমার চিন্ময় রূপ কি ক'রে দর্শন ক'রবে?

দুঃখী-কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন ও আর্ত্তিতে সঙ্গিনী ললিতার চিত্ত গলিয়া উঠিয়াছে। এইবার তিনি মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "প্যারীজী. জব্ তুম্‌হারী কৃপা হুই হ্যায়, তো থোরি শক্তি ভি দান করো!"

রাধারাণীজী তাঁহার কৃপা-ভাণ্ডারের চাবি খুলিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃষ্ণদাসের নয়ন সমক্ষে উন্মোচিত হইল অতীন্দ্রীয় লোকের সিংহদ্বার ; দর্শন করিলেন, শ্রীগোবিন্দের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ !

চকিতের দর্শন। কিন্তু সর্ব্বসত্তা দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই শুনিলেন, প্যারীজী মধুরকণ্ঠে তাঁহাকে আশীষ জানাইয়া কহিতেছেন, "কৃষ্ণদাস, তোমার একনিষ্ঠ সেবা ও ঐকান্তিকী ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আমার কৃপার চিহ্নস্বরূপ তুমি এই নূপুরচিহ্নিত তিলক আজ হ'তে তোমার ললাটে ধারণ কর।"

এবার বৃন্দাবনের রজলিপ্ত নূপুরগাছা কৃষ্ণদাসের ললাটে স্পর্শ করাইয়া রাধারাণীজী সঙ্গিনীসহ অন্তর্হিতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত সম্বিৎ হারাইয়া হইলেন ভূলুণ্ঠিত।

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দুঃখী-কৃষ্ণদাস কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গিয়া উপস্থিত। রাধারাণীর অলৌকিক দর্শন ও কৃপার কথা পুলকাঞ্চিত দেহে সবিস্তারে বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া শ্রীজীবের নয়ন হইতে ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু, কৃষ্ণদাসকে তিনি আশীষ ও সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। কহিলেন, "বৎস, আজ, থেকে তোমার নাম আর দুঃখী-কৃষ্ণদাস নয়। তোমার দুঃখ যে চিরতরে দূর হ'য়েছে ! তুমি শ্যামপ্রিয়া প্যারীজীর বহুজনবাঞ্ছিত কৃপা পেয়েছে। আজ থেকে হ'লো তোমার নূতন নাম—দুঃখী-কৃষ্ণদাস-এর বদলে গোস্বামী শ্যামানন্দ নামে তুমি অভিহিত হ'বে। শ্রীমতীজীর নূপুরলাঞ্ছিত তিলকচিহ্নই আজ হ'তে তুমি তোমার ললাটে ধারণ ক'রবে তিলকভূষণরূপে।"

শ্রীজীব গোস্বামীর এই স্বীকৃতি ও সম্বর্দ্ধনা পাওয়া যে কোন বৈষ্ণবেরই পরম সৌভাগ্যের কথা। শুধু ব্রজমণ্ডলে নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বত্র শ্যামানন্দের নাম প্রচারিত হইয়া গেল।

এদিকে তাঁহার সম্পর্কে নানা কাহিনী পল্লবিত হইয়া ঠাকুর হৃদয়-

চৈতন্যের কাণে প্রবেশ করিয়াছে। সে-বার এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, "ঠাকুর, দুঃখী-কৃষ্ণদাস আপনাকে ত্যাগ ক'রে অপর গুরু গ্রহণ ক'রেছে! শুধু তাই নয়, আপনার দেওয়া নাম ও তিলক পর্য্যন্ত সে বদ্‌লে ফেলেছে।"

ঠাকুর মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তাঁহার এক পত্র পৌছিল—দুঃখী-কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে একবার তাঁহার কাছে যেন প্রেরণ করা হয়।

বৃন্দাবন হইতে শ্যামানন্দকে কাল্‌নায় আসিতে হইল। গুরুদেবের পাদ বন্দনা করিয়া যুক্তকরে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর সেদিন বড় উত্তেজিত। শিষ্যের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "উত্তর দাও, গুরু প্রদত্ত ভেকের নাম তুমি কেন পরিবর্ত্তন করেছ? চিরাচরিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিলকই বা ত্যাগ করতে তুমি সাহসী হ'লে কেন?"

শ্যামানন্দ সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, এ সব তো আপনারই কৃপায় সম্ভব হ'য়েছে!"

গুরু কৃপাবলেই তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা এযাবৎ অগ্রসর হইতেছে এবং অলৌকিক অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন, ইহাই শ্যামানন্দের বক্তব্য! কিন্তু ক্রুদ্ধ ঠাকুরমশায় তাহা বুঝিতে চাহেন না।

রুক্ষস্বরে বলিলেন, "দ্যাখো, এসব ভণ্ডামী রেখে দাও। যদি আমিই তোমার এ সব পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে থাকি, তবে আমি—তোমার সেই গুরুই আবার আজ আজ্ঞা দিচ্ছি—এই নাম ও তিলক বদ্‌লে ফেলে তুমি পূর্ব্বের মতোই থাকো।"

শ্যামানন্দ শান্ত আত্মসমাহিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! নিবেদন করিলেন, "প্রভু, এ নূতন তিলক গুরু-কৃপার প্রসাদেই আমি পেয়েছি, পরিবর্ত্তন করতে হয়, আপনি নিজেই তা করুন। এ তিলক আমার ললাট হ'তে মুছে দিন!"

উত্তেজিত ঠাকুর মহাশয় সজোরে নিজ বস্ত্র দ্বারা ঘষিয়া শিষ্যের

তিলক মুছিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! বহুবার ঘর্ষণের পরেও তো এ তিলক মোছা সম্ভব হইল না। গুরু বুঝিলেন, রাধারাণীর নূপুরের রজচিহ্নিত এই দিব্য তিলক সত্যই অনপনেয়, আর তাঁহার শিষ্য আজ ভক্তি-সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। দিব্যশক্তিতে তিনি শক্তিমান। ভুল তাঁহারই হইয়াছে।

সাশ্রুনয়নে শিষ্যকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে আনীত রাধাগোবিন্দজীর এক জাগ্রত বিগ্রহ তাঁহাদ কাছে রহিয়াছে, হৃষ্টচিত্তে আজ শ্যামানন্দকে তাঁহারই সেবার ভার দিলেন।

এ বিগ্রহ লাভ করিয়া শ্যামানন্দের আনন্দের অবধি রহিল না। অতঃপর উড়িষ্যার গোপীবল্লভপুর মঠে ইহা তিনি স্থাপন করেন।

এই সময়ে গুরুদেবের নির্দ্দেশে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয়, সুরু হয় তাঁহার আচার্য্য জীবন।

রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবার মধ্য দিয়া বৈষ্ণবীয় আচারসমূহ তিনি উড়িষ্যার জনসমাজে প্রকটিত করেন। লক্ষ লক্ষ উড়িয়া ভক্তকে দীক্ষিত করিয়া শ্যামানন্দ সমগ্র উড়িষ্যার এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসের ধারা উৎসারিত করিয়া দেন। শুধু দরিদ্র ও সাধারণ স্তরের মানুষই নয়, উচ্চ বর্ণের শত শত মুমুক্ষু ব্যক্তিও এই বৈষ্ণব-চূড়ামণির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের শেষে এই শক্তিধর বৈষ্ণব তাঁহার আচার্য-জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দেন, শিষ্য ও ভক্তদের কাছে গৌরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্যামানন্দের বিশিষ্ট বারজন শিষ্য হইতে বৈষ্ণব শাখার উৎপত্তি হয়। এই শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন রয়নীর ভূম্যধিকারীর পুত্র রসিক মুরারী। ঠাকুর গোঁসাই বা রসিকানন্দ নামে তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে ইনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। সুবর্ণরেখার তীরে গোপী-বল্লবপুরে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়েরপ্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়এবং উড়িষ্যার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়া চলে।

রাজা রামকৃষ্ণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ। পলাশীর যুদ্ধের আগে বাংলার আকাশে বাতাসে সেদিন এক রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বাভাষ জাগিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে কেবলই শঙ্কা, সন্দেহ আর উৎকণ্ঠা।

এমনি দিনে নাটোর রাজপ্রাসাদে আজ কোন উৎসব-সমারোহ? সপ্ত পরিখার দ্বারে দ্বারে আলোক সজ্জা, প্রতি চৌকিতে রোশন-চৌকির বাদ্য, কক্ষে কক্ষে হাসি আনন্দের উচ্ছ্বাস। সম্ভ্রান্ত অভ্যাগত-দের নিয়া সকলেই মহা ব্যস্ত।

মহারাণী ভবানী ও দেওয়ান দয়ারাম রায়ের এক মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, মহারাণী আজ যে তাঁহার দত্তকপুত্র নির্ব্বাচন করিবেন।

কোন সন্তান তাঁহার হয় নাই, অথচ নাটোর রাজবংশের ধারাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। তাছাড়া, নাটোররাজ্যের ভূম্যধিকারটি যাহাতে রক্ষা পায় তাহাও দেখা দরকার। তাই দত্তক গ্রহণের সিদ্ধান্তই তিনি করিয়াছেন।

দেশ বিদেশ হইতে সুলক্ষণযুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বালকেরা আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাসাদের বৃহৎ কক্ষটিতে বসিয়া অভিভাবকেরা ভাবিতেছেন, কোন্ ভাগ্যবান শিশু আজ অর্দ্ধবঙ্গের জমিদারীর সৌভাগ্য লাভ করিবে তাহা কে জানে?

দ্বিতলের কক্ষে শিশুদের ভোজনের আয়োজন হইয়াছে, সেখানেই মহারাণী সবাইকে দেখিবেন। দেওয়ানজী দয়ারাম রায় ত্রস্তব্যস্তে আসিয়া সবাইকে আহ্বান জানাইলেন।

সকলেই উপরে উঠিয়া গিয়াছে। একাকী নিঃশব্দে শুধু দাঁড়াইয়া

আছে এক প্রিয়দর্শন বালক। তাহার বাবা ও সঙ্গের ভৃত্যটি কি কারণে যেন বাহিরে গিয়াছে। তাই এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলি সে তাহাদের খুঁজিতেছে।

দেওয়ান দয়ারাম এই জমিদারীর প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক—এক পুরুষসিংহ। বাজখাঁই গলায় দূর হইতে হাঁকিলেন, "খোকা, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে কেন? যাও! শিগ্‌গীর রাণীমার কাছে ওপরে খেতে চলে যাও!"

বালক চুপচাপ দাঁড়াইয়াই আছে। দয়ারাম তাহার নিকটে আসিলেন। সৌম্যদর্শন, অপরূপ লাবণ্যযুক্ত এই বালক, দেখামাত্রই প্রাণমন কাড়িয়া নেয়!

সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? খেতে যাবেনা, খোকা?"

বালক উত্তর দিল, "কি ক'রে যাই, বলো! আমার জুতো পরিয়ে দেবে কে?"

"কেন? তুমি নিজেই প'রে নাও না!"

বালক বসিয়া বলিল, "না, তুমিই আমার জুতো পরিয়ে দাও!"

কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ আছে এই বালকের চোখে মুখে তাহা কে জানে! সিংহপুরুষ দয়ারাম রায় স্নেহ মমতায় একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। তখনি উবু হইয়া বসিয়া জুতা-জোড়া বালকের ক্ষুদ্র পায়ে ঢুকাইয়া দিলেন।

আবার এই ক্ষুদ্র নবাবের হুকুম হইল, "আমায় তুমি কোলে ক'রে ওপরে খাবার ঘরে নিয়ে চল!"

প্রগাঢ় স্নেহে এই তেজস্বী, অনিন্দ্যসুন্দর বালককে কোলে তুলিয়া নিয়া দয়ারাম দোতলার দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে বালকের পিতৃ-পরিচয় পাইয়া তিনি মহা খুসী। মনের ভিতর হইতে কে যেন বারবার তাঁহাকে তখন বলিতেছে, 'ওরে এই—এই।'

মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়াই দেওয়ান বলিয়া বসিলেন, "মা,

আপনি আর ভাববেন না, ছেলে নির্ব্বাচনের কাজ হয়ে গিয়েছে। নাটোরের গদিতে এই ছেলেই শুধু বস্‌তে পারে।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাণী বালকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "আচ্ছা দেওয়ানজী, তুমি হঠাৎ একেই পছন্দ ক'রে বস্‌লে কেন, বল দেখি ?"

"মা, দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান দয়ারামকে হুকুম দিয়ে যে বালক জুতো পরিয়ে নিতে পারে, নাটোরের মহারাজা তাকেই হওয়া সাজে। তাছাড়া আমি খোঁজ নিয়েছি, এরা নাটোরের জ্ঞাতি।"

রাণী বালককে কোলে নিয়া মুখচুম্বন করিলেন। কহিলেন, "তবে তাই হোক। আমি তো কাশীবাস ক'রবো ব'লে একরূপ স্থির ক'রেই ফেলেছি! জমিদারী চালাবে তুমি। তোমার মালিক তুমি নিজেই ঠিক ক'রে নিয়েছ, ভালোই হ'লো।"

সেদিনকার এই বালকই উত্তরকালের শক্তিধর তন্ত্রসাধক রাজা রামকৃষ্ণ।

রাজসাহীর আটগ্রাম নামক পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে সাধক রামকৃষ্ণ জন্মলাভ করেন। হরিদেব রায় এখানকার এক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ, ইহারই তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। এই রায় পরিবারের সঙ্গে নাটোরের রাজবংশের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক ছিল।

রাণী ভবানী রামকৃষ্ণকে মহাসমারোহে দত্তক নিলেন। বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ডের অধিশ্বরী হইয়াও এসময়ে তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। ভাগীরথীর দুই তটে অশান্তির বহ্নি ধূমায়মান হইয়া উঠিয়াছে। নবাব সিরাজ অব্যবস্থিতচিত্ত—শাসনযন্ত্রে তাঁহার ধরিয়াছে ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও অকর্ম্মণ্যতার ঘুঁণ। রাজ্যমধ্যে কেবলি অশান্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কথা, তরুণ নবাব নিজের অনাচার ও হটকারিতার দ্বারা প্রবল অসন্তোস জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

আপ্রাণ চেষ্টায়ও রাণী তাঁহার জমিদারীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়

রাখিতে পারিতেছেন না। আজীবন নৈষ্ঠিকভাবে নিজে ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছেন, জমিদারী পরিচালনায়ও কম দক্ষতার পরিচয় তিনি দেন নাই—কিন্তু এখন এ বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট আর পোহাইতে ইচ্ছা হয় না। বয়সও যথেষ্ট হইয়াছে। আর নয়, এবার কাশীধামে গিয়া বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিবেন।

আবার নানা দুশ্চিন্তাও আছে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাটোরের ভূম্যধিকার হয়তো হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে—লক্ষ লক্ষ আশ্রিত প্রজা পতিত হইবে চরম অরাজকতার আবর্ত্তে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাটোরবংশ ও তাহার মর্য্যাদাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!

কল্যাণবোধের সহিত প্রতিভা ও বৈষয়িক বুদ্ধির অপূর্ব্ব সমন্বয় রাণীর মধ্যে—এসময়ে দত্তক গ্রহণের ব্যবস্থাই তিনি করিলেন।

রাণী ভবানীর অতুল ঐশ্বর্য্যও প্রতাপের ছত্রছায়ায় বালক রামকৃষ্ণ বাড়িয়া উঠিতেছেন। রাণীর পণ, পুত্রকে সর্ব্বগুণে গুণান্বিত করিবেন এক অসামান্য পুরুষরূপে গড়িয়া তুলিবেন, বিদ্যাবত্তা ও জমিদারী পরিচালন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবন যাহাতে তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হয় সেজন্য চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি করা হইবে না।

নাটোরে তখনকার দিনে সদাই ছিল জ্ঞাণী গুণী ও সাধু সন্ন্যাসীদের আনাগোনা। রাণী পুত্রসহ ইহাদের কাছে বসিয়া প্রায়ই উপদেশ গ্রহণ করিতেনে, জনকল্যাণের কাজে ও দান-ধ্যানে তাঁহার কখনো উৎসাহের অভাব ছিল না। প্রাসাদে হয়তো কাঙালী ভোজন হইতেছে, সেখানে রামকৃষ্ণকেই অগ্রণী করিয়া দেওয়া হয়। এক লক্ষ ব্রহ্মণের পদধুলি গ্রহণের ব্রত হয়তো রাণী উদ্‌যাপন করিতেছেন—কুমারও মাতার পশ্চাতে থাকিয়া স্বর্ণপাত্রে সেই ধূলি সংগ্রহ করিয়া ফিরেন।

শ্রেষ্ঠ আচার্য্যদের অধীনে কুমারের শিক্ষা অগ্রসর হয়।

কিন্তু এ অগাধ ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি, ধর্ম্মাচরণ ও জনসেবা কোন কিছুর আকর্ষণই রামকৃষ্ণের কাছে বড় হইয়া উঠেনা! রাজপুরীর

কোলাহলের বহু ঊর্দ্ধে, উদাসীনের মত তিনি থাকেন। কি যেন তাঁহার চাই। এখানে নয়, অন্য কোথায় যেন তাঁহার প্রকৃত স্থান,—এই চিন্তা কেবলি তাঁহার অন্তরে আলোড়ন তুলিতে থাকে।

প্রখর বুদ্ধিশালিনী রাণীর দৃষ্টি এড়ানো কঠিন। কুমারের মতিগতি ও আচরণে তিনি বড় চিন্তিতা হইয়া উঠেন। অমাত্যেরা তাঁহাকে নানা পরামর্শ দিতে থাকেন।

রাণীর গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশকে সে-বার ডাকিয়া আনা হইল। সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ বলিয়া তর্কবাগীশের সুনাম আছে। রাণী তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি কহিলেন "মা, নাটোরের বংশরক্ষার দিকে তাকিয়ে শিগ্‌গীর কুমার রামকৃষ্ণের বিয়ে দাও, আর কুমারের ভেতর ধর্মজীবনে যে আকাঙ্খা উদগ্র হয়ে উঠেছে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে অবিলম্বে তাকে দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর।"

কুমারের বিবাহ দেওয়া স্থির হইল।

রামকৃষ্ণের সংসার ও ধর্ম্মজীবনের চারিদিকে তোলা হয় এক প্রাচীর আর কোন দিকে যেন তিনি সরিয়া না যান।

পুত্রের বিবাহ দিয়া রাণী সুলক্ষণা ও পরম রূপবতী বধূ ঘরে নিয়া আসিলেন। তর্কবাগীশ ঠাকুরের দির্দ্দেশে কুমার রামকৃষ্ণকে মাতা রাণী ভবানীই দিলেন দীক্ষামন্ত্র। তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত মনে মনে চাহিতে ছিলেন, দত্তক পুত্র যেন উত্তরকালে অন্ততঃ গুরুজ্ঞানেও মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকে।

এবার রাণীর অবসর গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত। সংসার হইতে ক্রমে নিজেকে অপসারিত করিয়া নিতেছেন। এসময়ে কখনো তিনি বাস করেন মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গাতীরে, কখনো বা থাকেন বড়নগরের প্রাসাদে। কিন্তু বেশীর ভাগ কালই তাঁহার কাটিয়া যায় বারাণসীধামে পূজা ও ব্রত উদ্‌যাপনে।

রাজা রামকৃষ্ণ এখন তাঁহার জমিদারী শাসনের কাজে আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন। বিপুল ভূম্যাধিকার ও অতুল কীর্ত্তির তিনি উত্তরাধিকারী। কিন্তু জীবনে তাঁহার প্রকৃত শান্তির আস্বাদ মিলিতেছে কই? সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সাহচর্য্য, নবজাত পুত্রের আকর্ষণ, প্রাসাদের আনন্দ-উৎসব, কোন কিছুই যে তাঁহার অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিলাস, ও আড়ম্বর এড়াইয়া অন্তস্থল হইতে দিনের পর দিন উঠিতে থাকে এক অহৈতুক আকুতি!

সর্ব্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমা মুক্তির জন্য রাজা-রামকৃষ্ণ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। রাণী ভবানীর সযত্নে গঠিত রক্ষাপ্রাকার এবার আর পুত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

নাটোরের জয়কালী বিগ্রহ বড় জাগ্রতা! উদ্বেল অশান্ত হৃদয়ে রাজা-রামকৃষ্ণ দেবীর বেদীতলে ছুটিয়া যান, নিরন্তর জপ-ধ্যানে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। মাঝে মাঝে বাগ্‌সরের শ্মশানে গিয়াও ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন।

একান্ন শক্তি-পীঠের অন্যতম এই ভবানীপুর। নাটোর হইতে খুব বেশী দূরে নয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে মহাসমারোহে রাজা-রামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হন। ষোড়শোপচারে মায়ের অর্চ্চনা সম্পন্ন হয়। তারপর দিনের পর দিন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া থাকেন।

একবার তারাপীঠে গিয়াও প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্যদের সহিত মিলিত হন, সাধননির্দ্দেশ ও নিগূঢ় তন্ত্র-ক্রিয়াদি শিক্ষা করিয়া থাকেন।

এ সময়ে ভবানীপুরে এক মহা শক্তিমান কৌলাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ইহার নিকট রাজা-রামকৃষ্ণ পূর্ণাভিষিক্ত হন এবং শব সাধনা অনুষ্ঠান করেন।

কৌলমার্গের নৈষ্ঠিক সাধনধারা ধরিয়া রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মজীবন প্রবাহিত হইতে থাকে, এসময়ে প্রায়ই ভবানীপুরের শক্তিপীঠে গিয়া নিভৃত তপস্যায় তিনি নিরত থাকেন।

শক্তিপীঠ ভবানীপুর নাটোর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে। শাক্ত আগমে উল্লেখ আছে যে, করতোয়ার নিকটে এই পবিত্র পীঠে

সতীর গুল্‌ফ পতিত হয়। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহের নাম হইতেছে অর্পণাদেবী—কিন্তু জনসাধারণের কাছে এই শক্তিবিগ্রহ ভবানী দেবী নামেই খ্যাত।

মন্দিরের চারিদিকে রাজা-রামকৃষ্ণ নূতন করিয়া এসময়ে চারিটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপিত করেন। নিকটেই জোড়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ বকুলবাগান, ইহা তঁহার বৈকালিক ধর্ম্মসভার স্থল। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্যদের কুলাচারের আলোচনা ও সাধনমার্গের নানা মূল্যবান নির্দ্দেশ এসময়ে সভাস্থ সকলে উপকৃত হইত।

শক্তিপীঠে সমাগত কৌলসাধক ও যাত্রী সাধারণের সেবা যত্নের জন্য নাটোর রাজসরকার হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা তখন ছিল। ভবানীদেবীর সেবাপূজার জন্য রাজা-রামকৃষ্ণ এসময়ে বহু টাকা আয়ের এক তালুক উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সেদিন অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। জয়কালী মন্দিরের ভিতরে বসিয়া রাজা-রামকৃষ্ণ মহাশক্তির আরাধনায় রত। ক্রিয়া অনুষ্ঠান সব শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রচুর কারণবারি পানে দুই চোখ ঢুলুঢুলু। অঞ্জলি ভরিয়া বারবার রক্তজবা আর বিল্বদল তিনি মায়ের চরণকমলে দিতেছেন। আর ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া উত্থিত হইতেছে শক্তিসাধকের 'মা—মা' আরাব!

অতঃপর রামকৃষ্ণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িলেন, কাছে রহিল শুধু প্রিয় অনুচর ভোলা ও মন্দির পুরোহিত।

হঠাৎ এ সময়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে দেখা দিলেন দণ্ড-কমণ্ডলু-ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী। দীর্ঘ সুঠাম দেহে পাটলবর্ণ জটাভার নামিয়া আসিয়াছে। নয়নযুগলে ঝক্‌মক্ করিতেছে সিদ্ধ সাধকের দিব্য জ্যোতি।

মন্দির পুরোহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

আগন্তুক আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিলেন, "আমি রাজা রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি, এক্ষুণি আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।"

সেবক-শিষ্য ভোলানাথ দেবী মন্দিরের দ্বার আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া

আছে। সে নিবেদন করিল, "প্রভু, ধ্যানাসনে বসে থাকবার সময় মহারাজের কাছে যাবার তো উপায় নেই। আপনি বরং কাল প্রভাতে এসে আপনার বক্তব্য বলবেন।"

ক্রোধে মহাপুরুষের নয়ন দুইটি আরক্তিম হইয়া উঠে। তখনি দণ্ড-কমণ্ডলু বাঘছাল সব গুটাইয়া নিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। মন্দির-চত্বর হইতে চীৎকার করিয়া বলেন, "রাজা রামকৃষ্ণ, ধিক্ তোমায়, এমন ক'রে তুমি আপনা বিস্মৃত হয়ে আছো! তুমি কি ছিলে? তোমার আসল পরিচয় কি? একবার পূর্ব্বকথা সব স্মরণ কর। এই মায়ার বন্ধন ঘুচিয়ে ফেল।"

নিস্তব্ধ রাত্রে সন্ন্যাসীর বজ্রগম্ভীর ধ্বনি চারিদিক সচকিত করিয়া তোলে। তারপরই তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যান।

রামকৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সন্ন্যাসীর এ উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি তাঁহাকে উচ্চকিত করিয়া তোলে। এ যে বড় পরিচিত কণ্ঠস্বর! এই গভীর নিশীথে মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে কে তাঁহাকে এমন করিয়া ডাকিতেছে?

ত্রস্তব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসেন, পুরোহিত ও ভোলাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় গেল সে সন্ন্যাসী?"

বহু খোঁজ করিয়াও সন্ন্যাসীর সন্ধান আর মিলল না। প্রত্যূষের উদয়ালোকে রাজা-রামকৃষ্ণ যখন প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছে সুগম্ভীর আওয়াজ 'বন্ধনঘুচিয়ে ফেল!'

আগন্তুক সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইতেছে, তিনি যেন বড় পরিচিত, বড় আপনার জন। আহ্বান তাঁহার অমোঘ! সাধক রাজা রামকৃষ্ণের বুকে আজ একি অজানা ব্যথা টন্‌টন্ করিয়া উঠিয়াছে? এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁহাকে টানিতেছে, তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বকে টলাইয়া দিয়াছে। স্থির করিলেন, এই মায়া পাশ, রাজত্বের বন্ধন-রজ্জু সবলে ছিন্ন করিতেই হইবে।

মুক্তি সুযোগও অচিরে আসিয়া গেল। গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস-এর স্বৈরাচার ও উৎপীড়ন এসময়ে চরমে উঠিয়াছে। সুযোগ পাইলেই

রাজ্য ও জমিদারী একটির পর একটি তিনি গ্রাস করিতেছেন। কিছু-দিনের মধ্যেই হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে নাটোরের প্রধান সম্পত্তি বাহিরবন্দ পরগণা হস্তচ্যুত হয়। হেষ্টিংস তাঁহার এক তাঁবেদারের নামে এই বৃহৎ পরগণাটি ইজারা বিলি করেন।

নাটোর রাজের পক্ষে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি, কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণ এতবড় বৈষয়িক ক্ষতিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। একটি আশ্রিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় মূল্যবান ভূষণা পরগণাও গেল। পর পর এ সব বিপদের সম্মুখে রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন একেবারে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মত।

কোম্পানীর রাজস্বের দায়ে জমিদারী মহাল মাঝে মাঝে নীলাম হইতেছে। এক একটি সম্পত্তির বিক্রয়ের সংবাদ আসে, আর তিনি নিষ্কৃতির হাঁফ ছাড়েন, জয়কালীর বাড়ীতে মহাসমারোহে ও ষোড়শোপ-চারে পূজার ব্যবস্থা হয়। মুক্তির জন্য সেদিন তিনি অধীর!

আটগ্রামের জ্ঞাতিরা এই সুযোগে সে-বার রামকৃষ্ণকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করে, গোপনে নবাব সরকারের সহায়তায় নাটোর জমিদারী দখলের জন্য আগাইয়া আসে। কিন্তু তাহাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা শুনিবার পর রামকৃষ্ণ তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনেন। হাসিয়া কহেন, "তোমরা আমায় এসব কিছু না জানিয়ে শুধু শুধু খেটে মরলে কেন? তবে আমার কাণে যখন কথাটা এসেছে, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা কিছুটা পূরণ করবোই।"

অতঃপর একটা বড় জমিদারী মহাল এই ষড়যন্ত্রকারীদের তিনি বিলি করিয়া দেন!

কর্ম্মচারীরা তাঁহার একাজে বাধা দিতে গেলে স্মিত হাস্যে উত্তর দেন, "এবার কিন্তু সম্পত্তি পেয়ে ওদের অশান্তি দূর হবে!"

বিষয়-বিরক্তি এসময়ে চরমে উঠিয়াছে। ঘরসংসার ও জমিদারীতে মহারাজের কোন আকর্ষণই আর নাই। সুযোগ পাইলেই নাটোর ছাড়িয়া কোন বিজন বনে বা নদীতটে চলিয়া যান, তারপর আপনার

মনে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকেন। বন্ধু ও আমাত্যেরা প্রায়ই এজন্য তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন।

নাটোর হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে বাগ্‌সরের প্রসিদ্ধ শ্মশান, এই শ্মশানই হয় রাজা রামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় বিচরণক্ষেত্র ও তাঁহার সাধনভূমি।

নদীতীরের এই ভয়ঙ্কর শ্মশান ভূমিতে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শব ও নরকঙ্কালের মধ্যে রামকৃষ্ণ উপবিষ্ট থাকেন। শিবা ও সারমেয়-দলের বিকট চীৎকারের সঙ্গে মিশে তাঁহার আকুল 'মা' মা' আরাব! দিঙ্‌মণ্ডল শিহরিয়া উঠে। দিব্যোন্মাদ সাধক কখনো বা আপন মনে গান ধরেন—

এখনো কি ব্রহ্মচারী,
হয়নি মা তোর মনের মত,
অকৃতী সন্তানের প্রতি
বঞ্চনা কর মা কত!

আরো কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রাজা রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির কথা, তাঁহার সাধ্যাতিরিক্ত দানের কথা তখন সমগ্র বাংলার গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাজ ঐশ্বর্য্য আর পূর্বের মত নাই, কিন্তু রাজসভায় গিয়া একবার বসিলেই রাজা রামকৃষ্ণ হইয়া পড়েন কল্পতরু, কোনো প্রার্থীকেই তিনি ফিরাইতে পারেন না। বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ ও কাঙালীর সেখানে তখনও অবারিত দ্বার।

একদিন পণ্ডিত ও অমত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সভায় বসিয়া আছেন। এক শীর্ণকায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। হাতে তাঁহার একটি প্রস্তর খণ্ড, ইহাতে হেঁয়ালী পূর্ণ এক সঙ্কেতলিপি অঙ্কিত রহিয়াছে। রাজার হাতে এটি তিনি দিয়া দিলেন।

সভাস্থ পণ্ডিত ও গুণীদের মধ্যে বসিয়া রাজা এই সাঙ্কেতিক শ্লোক পাঠ করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণকে তিনি কহিলেন, "ঠাকুর, এ পাথরের টুকরোটি বড় রহস্যপূর্ণ। এ আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ?"

উত্তর হইল, বাগ্‌সরের শ্মশানের কাছে যে জঙ্গল রয়েছে সেখানে পেয়েছি।"

"কে দিয়েছেন ?"

"এক জটাজুটমণ্ডিত সন্ন্যাসী ?"

রাজা রামকৃষ্ণ আর তখন ধৈর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর, সব কথা আমায় খুলে বলুন, কিছুই লুকোবেন না।"

"মহারাজ, আমি বড় দরিদ্র, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করতে পারিনা। জীবনে ধিক্কার এসে গিয়েছিল, সেদিন তাই গলায় ফাঁস দিয়ে বনের ভেতর আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।"

"তারপর ?"

"এমন সময় হঠাৎ সেখানে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। আমায় প্রবোধ দিয়ে তিনি বলেন, রাজা রামকৃষ্ণের কাছে এই সঙ্কেতলিপি নিয়ে দেখা ক'র, তোমার দারিদ্র ঘুচবে।"

প্রস্তরে লিখিত শ্লোকটি এই—

যদুপতেঃ ক্ব গঙ্গা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

অর্থাৎ, যদুপতি কৃষ্ণের মথুরাপুরী কোথায় বিগত হইয়াছে, রঘুপতির উত্তরকোশলই বা আজ কোথায় ? একথা চিন্তা ক'রে তোমার মন স্থির কর, আর জগতের নশ্বরত্ব বুঝে নাও।

ভ্রাতা সনাতনের নিকট প্রেরিত মুমুক্ষু রূপগোস্বামীর সঙ্কেতলিপি আবার এখানে পাঠনো কেন ?

অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দারিদ্র ঘুচাইবার আদেশ দিয়া রাজা রামকৃষ্ণ

সভা ভঙ্গ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত আন্‌মনা ভাব দেখিয়া অমাত্যেরা সেদিন কেহ কাছে ঘেঁষিল না।

শ্লোকের প্রত্যেকটি চরণ মহারাজের সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া ফেলিতেছে। বৈভব ও ধর্ম্মাচরণের যশ আজ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর! কে এই শক্তিধর সন্ন্যাসী, এতকাল ধরিয়া যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিতেছে? দূরপ্রসারী তাঁহার দৃষ্টি, অভ্রান্ত তাঁহার লক্ষ্য।

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-চেতনার মর্ম্ম কেন্দ্রে নাড়া পড়িয়া গেল! অলক্ষ্যে সঞ্চরমান সন্ন্যাসী তাঁহার পরিচয় আজো দেন নাই, ধরা-ছোঁয়ার তিনি বাহিরে। তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য বহু লোক নিযুক্ত করা হইল কিন্তু কোন ফলই হইলনা।

সংসার-জীবন আর বিষয়ভার দুঃসহ! রামকৃষ্ণ এবার হইতে শ্মশানে মশানে কেবলি ঘুরিতে থাকেন। একেবারে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। রাণী-ভবাণী এসময়ে অবসর নিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। পুত্রের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, ত্রস্তব্যস্তে সেখান হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

রামকৃষ্ণের দাক্ষিণ্য ও বিষয়বিরক্তির ফলে ভাণ্ডার শূন্যপ্রায়! বহু জমিদারী মহাল ইতিমধ্যে হস্তচ্যুত হইয়াছে, যাকিছু অবশিষ্ট আছে রক্ষা না হইলে যে মহা বিপদ! অনন্যোপায় হইয়া রাণী ভবাণী আবার জমিদারীর ভার কিছুদিনের জন্য নিজ হাতে তুলিয়া নিলেন।

পুত্রকে অনেক করিয়া বুঝান, ঘর সংসার ও ধর্ম্ম দুইটিই রক্ষা করিয়া কি চলা যায় না? কিন্তু রামকৃষ্ণকে কে ঠেকাইবে?

প্রচণ্ড আকুলতা নিয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন, দিনের পর দিন এভাবেই কাটিয়া যায়। ক্রমে মায়ের সঙ্গে ঘটে তাঁহার প্রবল মনান্তর। জীবনের যে বন্ধন কাটাইতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, রাণী-ভবাণী আজ তাহারই ফাঁস রামকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দিতে চান। এ তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন।

মায়ের সান্নিধ্য এবার হইতে প্রায়ই তিনি এড়াইয়া চলেন, কিছুকাল এদিক-ওদিক নানাতীর্থ ঘুরিরা বেড়ান। একবার কাশীধামে গিয়া বাবা বিশ্বনাথ ও মা-অন্নপূর্ণার আশীর্ব্বাদও মাগিয়া আসেন।

বড়নগরের কিরীটেশ্বরী মন্দিরে কখনো দিব্যোন্মাদের অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যায়। এক একদিন ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া তিনি ছুটিয়া যান ভবানীপুরের শক্তি পীঠে।

তন্ত্র- সাধনার মহাকেন্দ্র, বশিষ্ঠদেবের সাধনপূত তারাপীঠেও মাঝে মাঝে গিয়া সাধন ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করেন।

এখানকার দেবীপূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইতিপূর্বে নাটোর সরকার হইতে পর্যাপ্ত দেবত্র সম্পত্তি দান করা হইয়াছিল।

সে-বার রাজা রামকৃষ্ণ তারাপুরের মহাশ্মশানে গিয়া কয়েকদিন মাতৃধ্যানে ডুবিয়া থাকেন। তারাপীঠে তখন সারা পূর্ব্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ কৌলাচার্য্যদের সমাগম হইত। ইঁহাদের সাধন-নির্দ্দেশ গ্রহণের ফলে তন্ত্রসাধনার বহুতর নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার আয়ত্ত হয়।

অবশেষে এক শুভলগ্নে শক্তি সাধনার সাফল্য তাঁহার জীবনে দেখা দেয়, ভবানীপুরের পীঠস্থলীতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া ইষ্টদেবী আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন।

ভবানীপুরের অর্পণা বিগ্রহ দেশবিদেশের তন্ত্রাচার্য্যদের পরম প্রিয়। তাই সমসাময়িক কালের বহু বিখ্যাত শক্তিসাধকের আগমন এখানে ঘটিত। রাজা রামকৃষ্ণের সিদ্ধির কথা তাহাদের সকলেরই একবাক্যে এসময়ে স্বীকার করিয়া নিতে দেখা গিয়াছিল।

ভবানীপুর পীঠে সে-বার রামনবমী উৎসবের বিপুল সমারোহ। রাজা রামকৃষ্ণ সাড়ম্বরে পূজা সম্পন্ন করিতেছেন।

দেবী বিগ্রহের অঙ্গে সেদিন শোভা পাইতেছে মহামূল্যবান আভরণ। রাজপুরীর মহিলারাও বিচিত্র বসন ভূষণে সাজিয়া উৎসবে যোগ দিতে

আসিয়াছেন। উৎসবের হাসি, আনন্দ ও জগজ্জননীর স্তব গানে চারিদিক ভরপুর।

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইবে, এখনও কিছুটা বিলম্ব আছে। রাজা রামকৃষ্ণ আজ প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, উদাত্ত স্বরে স্বরচিত এক গান ধরিয়াছেন—

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী-কথা বিনা না শুনে কাণে।
সন্ধ্যা-পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে।
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল।
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কুল,
ব'ল সে মূল হারাবে কেমনে।
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে,
লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে।
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযুষ পানে।

মাতৃনামরসে বিভোর রাজা কুঠিবাড়ীর ছাদে বসিয়া বারবার এ গান গাহিতেছেন, নয়নে অবিরল ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা।

হঠাৎ সম্মুখের বনাঞ্চল হইতে উত্থিত হইল আতঙ্ককর হা-রে-রে ধ্বনি। দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর দল এই উৎসবের দিনে আজ মন্দির লুঠ করিতে আসিয়াছে। তাহারা জানে, উৎসবের দিনে মন্দিরের সিন্দুকে জমিয়াছে প্রচুর টাকা। তাছাড়া, দেবী-বিগ্রহ ও রাজমহিলাদের গহনার মূল্যও লক্ষ টাকার কম হইবে না।

কিন্তু একি বিস্ময়কর কাণ্ড! রাত্রির গভীর অন্ধকারে রাজা রামকৃষ্ণ

ছাদের এক কোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন অদ্ভুত দৃশ্য! অদূরে বনের সম্মুখে ডাকাতের দল মশাল জ্বালাইয়া একবার আগাইয়া আসিতেছে, আর একবার হটিতেছে পিছনে। মন্দিরের রক্ষীর সংখ্যা তো বেশী নয়! তবে কে ইহাদের বাধা দিতেছে? কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ডাকাতেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান।

দস্যুদের এই আকস্মিক আগমন ও অন্তর্দ্ধানের কারণ মন্দিরে সমবেত ভক্তেরা কেহই সেদিন বুঝিতে পারে নাই।

আনন্দবিহ্বল রাজা বারবার গাহিতে লাগিলেন—

কার রমণী সমরে বিরাজ।
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী
অসুর-সমাজে?
মায়ের পদতল-বরণ
জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।

সিদ্ধ সাধক রাজা-রামকৃষ্ণের কপোল বাহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। আজ তাঁহার পরম সৌভাগ্য। মা-জগন্মাতার অলৌকিক করুণালীলা তিনি যে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখিলেন! দস্যুর ত্রাসরূপে স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া মা আজ ভক্তদের রক্ষা করিয়াছেন।

ডাকাতদের দলপতি পরদিন দেবমন্দিরে আসিয়া রাজা-রামকৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া পড়ে। গত রাত্রে সে ও তাহার সঙ্গীরা মায়ের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। লোলজিহ্বা রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির আকস্মিক আবির্ভাব তো স্মৃতিপট হইতে মুছিবার নয়!

যত দিক দিয়া যতবারই তাহারা মন্দির আক্রমণ করিতে যায়, এই অসুর-সংহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে তাহারা পিছু না হটিয়া পারে নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহারা পলায়ন করে।

ইহাদের সর্দ্দারের নাম শঙ্করা। উত্তরবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ দস্যু বলিয়া তাহার দল এসময়ে কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

শঙ্করার সে আসুরিক মূর্ত্তি আর নাই, পাষণ্ডী আজ হইয়াছে পরম ভক্ত। সে বলিতে থাকে, "মহারাজ, আমি জানতাম, শুধু গুটিকয়েক মন্দির রক্ষী এখানে আছে, তাই লুঠ করতে এসেছিলাম। একবারও ভাবিনি যে, সবার যিনি সংহার-পালন করেন সেই জগজ্জননী আপনার হয়ে লড়াইয়ে নামবেন। আজ বুঝেছি, আপনার আশ্রয়ই সব চাইতে বড় আশ্রয়।"

নয়নজলে রামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া যাইতেছে। শঙ্করাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার যে সৌভাগ্যের সীমা নেই। স্বয়ং জগন্মাতাকে তুমি অসি ধরিয়েছো, এখানে অবতীর্ণ করিয়েছো। তোমার সব দোষ আমি ক্ষমা করলুম। এবার থেকে মায়ের গান গেয়ে আনন্দে দিন কাটাও।"

তাঁহার প্রভাবে এই দস্যুনেতার জীবনে ধীরে ধীরে এক অপূর্ব্ব রূপান্তর সাধিত হয়।

রাজ ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণের কীর্ত্তি, যশ চলিয়াছে আরো বৃদ্ধির পথে। সে-বার সংবাদ আসিল, বাদশাহ নাটোরাধিপতিকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বাদশাহের ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সেদিন মহাসমারোহে নাটোরে সনদ দান করিতে আসিয়াছেন। রাজধানীতে দেখা দিল উৎসবের সমারোহ।

রাজা রামকৃষ্ণ নিস্পৃহ, মুক্তপুরুষ - রাজছত্র আর কৌপীন আজ তাঁহার নিকট সমান হইয়া উঠিয়াছে। বরং এবারকার এই সুযোগে আবার ভার কমানোর কিছুটা ব্যবস্থা করিলেন। দেওয়ানকে আদেশ দিলেন, ক্রমাগত কয়েক দিন ষোড়শোপচারে নিত্য দেবীপূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙালী বিদায় চলিবে। প্রার্থীরা এমনিতেই ফিরিত না, এবার অগণিত সংখ্যায় তাহারা ভীড় করিতে লাগিল।

বড় বড় পরগণা একটির পর একটি নীলাম হইয়া যাইতেছে। অর্থের

অনটন ও রামকৃষ্ণের দাক্ষিণ্যের গুরুভার দেওয়ানকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল।

আবার একদিন সেই রহস্যময় সন্ন্যাসীর আবির্ভাব।

কে এই গোপনচারী পরম সুহৃদ, যে বারবারই রাজা রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জীবনে তরঙ্গ তুলিয়া অন্তর্দ্ধান হইতেছে?

উৎসবের শোভাযাত্রায় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেদিন তিনি নাটোরের রাজপথ দিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ এক কোণে দিব্যকান্তি, তেজঃপুঞ্জদেহ এক সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি পড়িল।

সন্ন্যাসীর ইসারা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি নামিয়া আসিলেন। ইনিই কি সেই অলৌকিক পুরুষ? অন্তস্থল হইতে কে যেন বলিয়া দিল এই মহাত্মাই তো সেদিন নিশীথে জয়কালী মন্দিরে উপস্থিত হন, তাঁহাকে মুক্তির আহ্বান জানাইয়া যান।

ইনিই সেই কল্যাণকামী সন্ন্যাসী কিছুদিন আগেও যিনি প্রস্তরখণ্ডে লিখিয়া তাঁহার সঙ্কেত-লিপিটি পাঠাইয়াছিলেন।

কিন্তু অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বারবার কেন এভাবে রামকৃষ্ণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন? তাঁহাকে দিয়া কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? একি প্রহেলিকা?

সন্ন্যাসী এবার তাঁহার আত্মপরিচয় দিলেন। শ্রীজী নামে উচ্চকোটি সাধকসমাজে তিনি পরিচিত, রাজপুতানার বুঁদি রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনেই কুমারের জীবনে আসিয়া যায় মুমুক্ষার আহ্বান, অবলীলায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। অতঃপর এক মহাযোগীর আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি সিদ্ধকাম হন।

উভয়ে সেদিন নগরের উপান্তে এক বিজন প্রান্তরে গিয়া উপবেশন করিলেন। শ্রীজী বহুক্ষণ যাবৎ নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাজা রামকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া আছেন। তারপর হঠাৎ আরও নিকটে ঘেঁসিয়া রাজার মেরুদণ্ডটি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন।

রামকৃষ্ণের দেহে খেলিয়া যায় এক বিদ্যুৎ শিহরণ, পূর্ব্বজন্মের লুপ্ত স্মৃতি মানসপটে ভাসিয়া উঠে।

চাহিয়া দেখেন, হরিদ্বারের পুণ্যক্ষেত্রে এক গিরিগুহায় তিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুরু আর তাঁহার প্রবীণ গুরুভ্রাতা সম্মুখে ধ্যানস্থ। এই গুরুভ্রাতাই আজিকার শ্রীজী। সে জীবনে ইনি ছিলেন তাঁহার নিত্য সঙ্গী, তাঁহার অধ্যাত্মজীনের অন্যতম পথপ্রদর্শক।

দুই তরুণ শিষ্যেরই সাধকজীবনের অন্তস্থলে সংগোপিত ছিল ক্ষীণ ভোগাকাঙ্ক্ষা। সদ্‌গুরুর দিব্য দৃষ্টিকে সেদিন তাহা ফাঁকি দিতে পারে নাই। আবার জন্ম হইয়াছে প্রারব্ধ খণ্ডনের জন্য। শ্রীজী অনেক আগেই আবির্ভূত। তারপর নিজে বন্ধনমুক্ত হইবার পর গুরুভ্রাতার মুক্তির জন্য বারবার ছুটিয়া আসেন।

রহস্যময় সন্ন্যাসী যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন তেমনই আবার সেদিন আত্মগোপন করিলেন।

রাজা রামকৃষ্ণ এবার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। পত্নীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুই নাবালক পুত্রকে তাঁহার রক্ষণাধীনে রাখিয়া নাটোরের বিত্তবিষয় ও সুখসম্পদ ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এবার শুরু হইল তাঁহার চরম সাধনা। ইষ্টদেবী আগেও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন বরাভয় হস্তে। কিন্তু প্রতিবারই চকিতে তিনি মিলাইয়া গিয়াছেন। আজ রামকৃষ্ণ দৃঢ়সঙ্কল্প, মহামায়াকে চিরতরে স্থাপিত করিবেন তাঁহার হৃদয়বেদীতে। জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃরাশিকে এবার ওতপ্রোত করিতে হইবে তাঁহার সর্ব্বসত্তায়।

অমাবস্যার রন্ধ্রহীন অন্ধকার। সাধক আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ পঞ্চমুণ্ডীর সাধনকুটির আলোয় আলোময় হইয়া উঠিল, আদ্যা-শক্তি জগজ্জননী আবির্ভূতা হইলেন তাঁহার সম্মুখে।

দেবী কহিলেন, "বাবা রামকৃষ্ণ, আজ আমি এসেছি তোমায় আমার ক'রে নিতে, তোমায় একেবারে আত্মসাৎ করতে। কিন্তু বাবা, তার

আগে তোমার শেষ প্রস্তুতিটি তো সম্পন্ন ক'রে নিতে হবে। রাণী ভবানী হচ্ছেন তোমার মা, তোমার পালয়িত্রী। অধ্যাত্মজীবনের গোড়ার দিকে দীক্ষাও তুমি নিয়েছিলে তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে তোমার মনান্তর ঘটেছে। তা মিটিয়ে না ফেললে তো পরমপ্রাপ্তি ঘট্‌বেনা বাবা।"

রামকৃষ্ণ করজোড়ে উত্তর দিলেন, "জগজ্জননী, তুমি তো জানো, কেন মা আমার ওপর বিরূপ হয়েছেন। এবার তুমিই ব'লে দাও আমায় কি ক'রতে হবে।"

"বাবা, তোমার মা রাণী-ভবানী চেয়েছিলেন, তোমায় প্রজানুরঞ্জক রাজা আর শক্তিমান সাধক দুই-ই করতে। কিন্তু তুমি রাজত্ব ঠেলে ফেলে হয়ে উঠেছো মুক্তিকামী সাধক। এই জন্যেই যে এত মনান্তর। প্রারব্ধের ভোগ এবার খণ্ডিত হবে। তুমি মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর ক্ষমা চেয়ে নাও। লৌকিক জীবনের দাবী দাওয়া সব মিটিয়ে ফেলে এসো আমার কোলে।"

দেবী আদ্যাশক্তি অন্তর্হিতা হইলেন।

রাজা রামকৃষ্ণের অন্তরে জাগিল তুমুল আলোড়ন। তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে ইষ্টদেবী মহামায়ার সুধাস্নিগ্ধ ক্রোড়। কিন্তু আগে যে তাঁহাকে এদিককার বুঝাপড়া ও হিসাব নিকাশ শেষ করিতে হইবে। মা রাণী-ভবানী আছেন মুর্শিদাবাদের বড়নগরে। সেখানে আজই এইক্ষণেই তাঁহাকে পৌঁছিতে হইবে।

কথিত আছে, সিদ্ধ সাধকের অমোঘ ইচ্ছা এই সময়ে অলৌকিক-ভাবে অচিরে রূপায়িত হইয়া উঠে। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার সিদ্ধ দেহটি পঞ্চমুণ্ডীর ধ্যানের আসন হইতে ঝটিকার বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ধাবিত হয় বড়নগরের দিকে।

সেবকশিষ্য ভোলানাথ সাধনগৃহের দ্বারে তখন প্রহরা দিতেছে।

তাঁহার কাণে পৌঁছিল শুধু কয়টি কথা—"ভোলা ভাবিস্‌নে, আমি মায়ের নিকট এক্ষুণি ছুটে যাচ্ছি।"

চকিতে রাজা-রামকৃষ্ণ শূন্যমার্গে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যান। ভোলা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণের সেদিনকার এই বিভূতিকে কেন্দ্র করিয়া ভবানীপুর শক্তি-পীঠে নানা কল্পনারঞ্জিত কাহিনী প্রচারিত হয়। কেহ বলে, মহারাজ সশরীরে কৈলাসে গিয়াছেন, কেহ বা বলিয়া বেড়ায়—অষ্টসিদ্ধি-প্রাপ্ত মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তিলীলা প্রদর্শন করিয়া আকাশে বিহার করিতেছেন।

ইহার পর কিন্তু সংবাদ আসে, মহারাজ রামকৃষ্ণের দেহ ঐদিন নিশীথে ভবানীপুর হইতে বহুদূরে পাকুড়িয়া অঞ্চলে এক সেতুর সম্মুখে সবেগে নিপতিত হয়। অন্ধকার রাত্রে এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে পাকুড়িয়া অবধি দূরবর্ত্তী রাস্তা তিনি কি করিয়া অতিক্রম করিলেন সে রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারে নাই।

পাকুড়িয়ায় নাটোরের গুরুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহারা ছুটিয়া আসেন, সযত্নে এখান হইতে পালকী-যোগে রাজা রামকৃষ্ণকে রাণী-ভবানীর নিকট পৌঁছাইয়া দেন।

মাতা ও পুত্রের সেদিনকার মিলন হয় বড় প্রাণস্পর্শী। মায়ের নিকট হইতে মার্জ্জনা প্রাপ্তির পর রাজা রামকৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায় এক নবরূপান্তর। পরম প্রাপ্তির লগ্নটি এবার আসিয়া যায়।

বড়নগরের গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি বাস করার পর রাজা রামকৃষ্ণ শেষবারের মত দর্শন পান জননী আদ্যাশক্তির। সর্ব্বসত্তা তাঁহার মাতৃময় হইয়া উঠে।

শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করার আর বেশী বাকী নাই। আপ্তকাম সাধক এ সময়ে পরমানন্দে অস্ফুট স্বরে গাহিতেছেন—

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয়,
রিপু সঙ্গে চলে।
আন্ রে ভোলা, জপের মালা,
ভাসি গঙ্গাজলে।

উত্তরসাধক ভোলানাথ কর্ণমূলে মাতৃনামের সুধা বারবার সিঞ্চন করিতে থাকে। ইষ্টলগ্ন রামকৃষ্ণের হাতের জপমালাটি চিরতরে নিশ্চল হইয়া যায়।

আপ্তকাম মহাসাধকের সর্ব্বসত্তা একাকার হইয়া যায় জগজ্জননীর জ্যোতিঃসমুদ্রে।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্র হইতে এই দিক্‌পাল পুরুষের তিরোধান ঘটে।

সাধক কমলাকান্ত

বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাড়াতাড়ি চান্না গ্রামে পৌঁছিতে হইবে। শিষ্য বাড়ী হইতে ফিরিতেছেন, সেখানকার কাজ সারিতে বড় বেশী দেরী হইয়া গিয়াছে। সম্মুখেই ওড়গাঁয়ের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা। ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতদের ভয়ে একাকী এপথে কেউ বেশী চলাফেরা করে না। সুযোগ পাইলেই দুর্ব্বৃত্তেরা নিরীহ পথিকের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নেয়, নির্ব্বিচারে তাদের হত্যা করে।

সারা প্রান্তর ছাইয়া অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, তাই দ্রুতপদে তিনি আগাইয়া চলিলেন।

রুক্ষ কঙ্করময় প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে। কাছাকাছি বৃক্ষলতার চিহ্ন কোথাও নাই। শুধু দূর দিক্‌চক্রবালে কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করিয়া আছে দুই এক সারি উদ্ধত তালগাছ।

হঠাৎ অদূরস্থিত ডাঙ্গার এক ঢালু প্রান্ত হইতে আতঙ্ককর রব উঠে, হা-রে—রে—রে!

ভীতত্রস্ত ব্রাহ্মণ থমকিয়া দাঁড়ান, দেখিতে দেখিতে লাঠি সড়্‌কি-ধারী এক দল ডাকাত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে।

সর্দ্দার কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠে, "ওহে ঠাকুর, তোর কাছে যা কিছু আছে শিগ্‌গীর ফেলে দে।"

ব্রাহ্মণের হাতে একটি পুঁটুলি, শিষ্য বাড়ি হইতে প্রাপ্ত জিনিসপত্র তাহাতে বাঁধা। ট্যাঁকে রহিয়াছে সামান্য কিছু অর্থ। ডাকাতদের সামনে এগুলি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "নে বাবারা, যা ছিল সব তোদের দিয়ে দিলাম। গরীব ব্রাহ্মণ আমি। আর তো কিছু সঙ্গে নেই।"

টাকা ও পুঁটুলির জিনিষপত্র আত্মসাৎ করার পর ডাকাত সর্দ্দার

বাজখাঁই আওয়াজে কহিল, "ঠাকুর তা তো হলো। এবার বলতো. যাবে কোন্ গাঁয়ে? নাম কি তোমার?"

"যাবো কাছেই—চান্নায়। সেখানেই যে আমি থাকি। নাম আমার কমলাকান্ত দেবশর্ম্মা।"

"তাহ'লে তো বড় মুস্কিলে পড়া গেল। চান্না মাত্র ক্রোশ তিনেকের পথ এখান থেকে। এত কাছে বাস ক'রছো, তোমায় তো আর এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাড়ী ফিরে গিয়েই আমাদের সম্বন্ধে বলা-কওয়া ক'রবে। আমাদের দু'একজনকে এর ভেতরে যে চিনতে পারোনি, তাই বা কে বলবে? দোষ নেবে না ঠাকুর, তোমায় জ্যান্ত ফিরে যেতে দেওয়া যায় না, তাতে আমাদের বিপদ হতে পারে। তোমায় কেটে না ফেলে উপায় নেই। এবার প্রস্তুত হও।"

কমলাকান্ত প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বেশ তো বাবা, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই হবে। তবে মরবার আগে একবার আমায় মায়ের নাম গান ক'রতে দাও। এতে তোমাদের আপত্তি নেই তো?"

"আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তোমার গান গেয়ে নাও, তারপর আমরা আমাদের কাজ শেষ ক'রে ফেলি।"

কমলাকান্ত ভূমিতলে আসন করিয়া বসিলেন, লাঠি বল্লম হস্তে দস্যুরা রহিল তাঁহার চারিদিকে। শুরু হইল আবেগময় কণ্ঠে তাঁহার শ্যামা সঙ্গীত—

আর কিছুই নাই শ্যামা-মা তোর
কেবল দু'টি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি
দেখে হ'লাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদকালে কোথা নাই—
ঘরবাড়ী ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা।

নিজগুণে রাখ,
করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ ক'রে হে তোমায় পাওয়া
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা,
মাকে বলি মনের ব্যথা।
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা।

হৃদয়-গলানো একি অপরূপ সঙ্গীত! মায়ের কোল-ছাড়া শিশুর আকুতি ও কান্নার মূর্চ্ছনায় ইহা ফাটিয়া পড়িতেছে। জোড় হস্তে চক্ষু মুদিয়া কমলাকান্ত বার বার এই গানটি গাহিতেছেন, আর নয়ন হইতে অবিরাম ঝরিতেছে অশ্রুধারা।

শ্যামা মায়ের দিব্য ভাবরসে তিনি আবিষ্ট। গোধুলির রক্তরাগ সুন্দর সুঠাম দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায়, আননে ফুটিয়াছে অপার্থিব দ্যুতি।

দস্যুরা নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। কমলাকান্তের সঙ্গীতের আবেদন, তাঁহার ভাবঘন মূর্ত্তি, সব কিছু মিলিয়া এক মোহময় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার কান্নার অনুরণন উঠিয়াছে দস্যুদের বুকে বুকে। ভাবাবেগে তাহাদের নয়নও অশ্রুসিক্ত।

সঙ্গীত শেষ হইবার পর ডাকাত-সর্দ্দার তাঁহার অনুচরদের নিয়া কমলাকান্তের চরণ জড়াইয়া ধরে। কাঁদিয়া বলিতে থাকে; "ঠাকুর, মহাপাতকী আমরা, তোমার চরণে আমাদের আশ্রয় দাও, বাঁচাও। তুমিই এ কাজ পারবে ঠাকুর। আজ তোমার চোখে মুখে যেন মায়ের করুণার আলো দেখতে পেয়েছি। আমাদের তুমি কৃপা কর।"

সকলের মিলিত কণ্ঠের 'জয় কালী' র'বে সেদিন ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা

মুখর হইয়া উঠে। সাধক কমলাকান্তের কৃপা ও আশ্রয় লাভে দস্যুরা রূপান্তরিত হয় ভক্ত-সাধকরূপে।

দেড়শত বৎসর আগের বর্দ্ধমানের ওড়গাঁও প্রান্তরের এই ঘটনাটি সেদিন শুধু এই কয়টি দস্যুর জীবনেই পরিবর্ত্তন আনে নাই, সাধক কমলাকান্তের জীবনেও ইহা সূচনা করে নতুন অধ্যায়ের। শক্তিমান তন্ত্রসাধকরূপে অচিরে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

বাংলার জনজীবনে ও ভক্ত সাধকদের মধ্যে কমলাকান্ত মাতৃ-সাধনার এক প্রাণবন্ত ধারা বহাইয়া দেন। গায়ক, কবি, সিদ্ধসাধক ও শক্তিধর আচার্য্যরূপে এদেশের লোক-চৈতন্যে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

কমলাকান্ত ছিলেন তন্ত্রমতের সাধক। শক্তিস্বরূপিনী শ্যামা মায়ের, আদ্যাশক্তির সাধনা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত, আর এ ব্রত তাঁহার সার্থকও হইয়া উঠে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও সঙ্গীতের প্রভাব বহু মুমুক্ষুকে উদ্দীপিত করে, তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত উদ্‌গীত হয় শত সহস্র সাধারণ মানুষের কণ্ঠে। বাংলার পথে প্রান্তরে, জনপদ মাতৃনামের শান্তিবারি কমলাকান্ত ঢালিয়া যান।

দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সময়ই রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। এ গান তিনি নিজে প্রাণ-ভরিয়া গাহিতেন, কেহ গাহিলে হইতেন ভাবাবিষ্ট। কমলাকান্তের গানে দিনের পর দিন ঠাকুরের হৃদয়ে মাতৃপ্রেমের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিত! ভবতারিণীর সম্মুখে এক একদিন তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "মা, তুই রামপ্রসাদকে, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় তবে কেন দেখা দিবি নে।"

আনুমানিক ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, বর্দ্ধমানের অম্বিকা-কাল্‌নায় কমলাকান্ত আবির্ভূত হন। পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। তাই তাঁহার লোকান্তরের পর সংসারে দেখা দেয় চরম

দুর্গতি। মাতা মহামায়া দেবী নিরুপায় হইয়া পুত্রদের নিয়া চান্না-গ্রামে পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। কমলাকান্তের মাতুল তাঁহাদের সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন, তাহাতেই কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইতে থাকে।

ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, ভালভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে চলিবে কেন? কিন্তু সাংসারিক অনটনের জন্য পড়ার খরচ কুলানো বড় কঠিন। কমলাকান্তকে তাই অম্বিকাগ্রামে এক যজমানের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, সেখানে থাকিয়া সে পড়াশুনা করিবে।

টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ শুরু হয়। মেধা ও বুদ্ধি তাঁহার অসাধারণ কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, লেখা পড়ায় উৎসাহ বড় কম। পুঁথিপত্রের বাঁধন তাঁহাকে বড় একটা খুলতে দেখা যায় না। অথচ পরীক্ষা নিতে গেলে দেখা যায়, পাঠ সবই মুখস্থ রহিয়াছে। বালকের এ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া যান।

কমলাকান্ত খুব সুকণ্ঠ। রামপ্রসাদী গান গাহিতেও তাহার বড় আনন্দ। চতুষ্পাঠী হইতে পলাইয়া পথে প্রান্তরে ঝোপঝাড়ে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, আর তাঁহার মধুর উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত হইতে থাকে।

উপনয়ন সংস্কারের পর হইতে কমলাকান্তের মধ্যে দেখা দেয় এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। ফাঁক পাইলেই চান্নার বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে নিভৃতে গিয়া আশ্রয় নেন। ধ্যানস্তিমিতনেত্র কিশোরের সম্মুখে প্রহরের পর প্রহর গড়াইয়া যায়।

গ্রামের অনতিদূরেই গোবিন্দ মঠ, প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামী এই মঠের সেবাইৎ। উচ্চস্তরের সাধক বলিয়া চারিদিকে তখন তাঁহার সুনাম খুব। অবসর পাইলেই কমলাকান্ত এই সাধকের চরণতলে আসিয়া বসেন, নানা উপদেশ বাণী শুনিয়া ধন্য হন। গোস্বামীজীর নিকট হইতে তিনি এ সময়ে দীক্ষাও গ্রহণ করেন।

মহামায়া দেবী পুত্রের এই মতিগতি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এ তরুণ বয়সে সে বৈরাগ্যের পথে গেলে সংসারের ভার কে গ্রহণ করিবে? ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিলেন, কমলাকান্তকে এবার বিবাহ দেওয়াইবেন। নিকটেই লাড্ডুকা গ্রাম, সেখানকার ভট্টাচার্য্যদের এক সুলক্ষণা কন্যা রহিয়াছে। পুত্রবধূরূপে তাহাকে বরণ করিয়া আনা হইল। কিন্তু কমলাকান্তের এ পত্নী বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই, অল্পদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাতার অনুরোধে কমলাকান্ত আবার দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। এবার বিবাহ করেন বর্দ্ধমানের কাঞ্চনপুরে।

ত্যাগবৈরাগ্যের যে স্রোত তাঁহার জীবনে প্রবাহিত হইতেছিল এবার তাহা আরো তীব্র হইয়া উঠে। দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ এড়াইয়া তরুণ সাধক আপন মনে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহার সাথে তন্ত্রসাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়। এ সাক্ষাৎ তাঁহার সমগ্র জীবনের মোড়টি ফিরাইয়া দিয়া যায়।

এমনিতর যুবক কমলাকান্ত সংসারধর্ম্মে উদাসীন। ইহার উপর প্রথমা পত্নীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার জীবনে জাগাইয়া তোলে বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ।

চান্নার নিকটেই খড়েগশ্বরী নদী। সেদিন ইহারই তটে বালুকাময় শ্মশানে পত্নীর মৃতদেহে আগুন দিয়া কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্যাস্তের গৈরিকে সন্ধ্যার সারা আকাশ আবৃত। নয়ন সম্মুখে পত্নীর দেহটি পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, চিতাগ্নির ধূম্র-কুণ্ডলী উর্দ্ধে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে আকাশের মহাবিস্তারে। অগতির গতি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জগজ্জননীর উদ্দেশে কমলাকান্ত উদার সুরে গান ধরিলেন—

কালি! সব ঘুচালি ল্যাঠা,
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখবি কিনা রাখবি সেটা।

তোমার যারে কৃপা হয়,
তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান গেলে সুখে ভাস,
তুচ্ছ বাস মণি-কোঠা
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচলোনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ, সুখে রাখ,
ক'রবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পড়েছি, আর,
পুছতে কি পারি সাধের ফোঁটা।
জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ,
কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা ?

চিতাগ্নিতে জল ঢালিয়া কমলাকান্ত গৃহে ফিরিয়া আসেন। স্থির করেন, সংসারের নিগড়ে আর বন্দী থাকা নয়। শ্যামা-মায়ের নাম জপিতে জপিতে এবার চরম বৈরাগ্যের পথে পা বাড়াইলেন।

কিন্তু গর্ভধারিণী জননীর অশ্রুজল তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প ভাসাইয়া নিয়া গেল। তাঁহার কাতর অনুনয়ের ফলে আবার তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মুক্তির আলোক সঙ্কেত যাঁহার প্রাণে পশিয়াছে গৃহ-পরিবেশে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা যায় কই ? কালী নামে মত্ত হইয়া কমলাকান্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। মায়ের পূজা যেখানেই অনুষ্ঠিত হয়, মায়ের সিদ্ধ সাধকের সন্ধান যেখানেই মিলে প্রাণের আকুতি নিয়া সেখানেই উপস্থিত হন।

চান্নার নিকটে শুধ্ড়ে গ্রামে সে-বার মহাসমারোহে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কমলাকান্ত এই পূজা দেখিতে গেলেন।

তন্ত্রসাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ও সেদিন এখানে উপস্থিত। কমলাকান্ত শুনিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক শক্তিমান কৌল-সাধক। বাড়ী তাঁহার অমরার গড় মানকরের কাছেই। সেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও শ্যামা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সাধন করেন।

কেনারামের আরও খ্যাতি আছে, শ্যামাসঙ্গীতে তিনি নিপুণ। যে একবার তাঁহার ভাববিভোর কণ্ঠের যাদুভরা গান শ্রবণ করে সেই মোহিত হইয়া যায়!

ইঁহারই চরণে কমলাকান্ত আত্মসমর্পন করিলেন। দীক্ষা ও শাক্তাভিষেকের পর কেনারাম বুঝাইলেন, তন্ত্র সাধনায় ব্রতী হইয়া তাঁহাকে ঘরসংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। মহামায়ার রচিত এ সংসারে থাকিয়াই, কৌল সাধনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে মায়ার বন্ধন কাটিতে হইবে।

কমলাকান্ত গ্রামে ফিরিয়া আসেন। নূতনতর প্রেরণায় এবার তিনি উদ্বুদ্ধ। গার্হস্থ্য জীবনে থাকিয়া তন্ত্রের নিগূঢ় সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানে তিনি ব্রতী হন। আনন্দময়ীর আরাধনার ফলে হৃদয়ে নামিয়া আসে দিব্য আনন্দের ধারা আর স্ফুরিত হইতে থাকে অপরূপ শাক্তসঙ্গীত। তাঁহার এ সঙ্গীত ছড়াইয়া পড়ে দূরদূরান্তরে।

শাস্ত্র পাঠের পর্ব্ব আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কমলাকান্ত এবার হইতে গ্রহণ করিলেন অধ্যাপক বৃত্তি। ছোট একটি চতুষ্পাঠী তিনি খুলিয়া বসিলেন। ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় নাই, কিন্তু এ কাজ চালানোর জন্য যে ধৈর্য্য ও বৈষয়িক মনোবৃত্তি দরকার তাহাই যে তিনি হারাইয়া বসিয়াছেন।

আট দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এ পরিবেশ আর তাঁহার সহ্য হয় না। প্রায় সারা দিন রাতই সাধন ভজনে আজকাল কাটান। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর এক আসন তিনি পাতিয়াছেন।

এ আসনে একবার আসিয়া বসিলে আর কোন হুঁস থাকে না, মাতৃ-ধ্যানে একেবারে আত্মহারা হইয়া যান। ভাববিভোর সাধক কখনো কখনো ছুটিয়া যান নিকটস্থ নির্জ্জন শ্মশানে, মা—মা অরাবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তোলেন।

এ অবস্থায় চতুষ্পাঠী বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব। অথচ এ অধ্যাপক-বৃত্তি চলিয়া গেলে কিভাবে পরিবার প্রতিপালন করিবেন?

তাঁহার কয়েকটি ছাত্র ইতিমধ্যে, বেশ কৃতী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ঠিক করিল, এ চতুষ্পাঠী উঠিতে দিবেনা, বরং নিজেরাই কষ্ট করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাজ চালাইয়া নিবে। নূতন ছাত্রদের পড়ানোর ভার এবার হইতে তাহারাই গ্রহণ করিল।

জগন্মাতার দর্শন লাভের জন্য কমলাকান্ত ব্যাকুল! এ ব্যাকুলতা ক্রমে আরো তীব্র হইয়া দেখা দেয়। শুনা যায়, এসময়ে একবার তিনি বীরভূমের তারাপীঠে উপনীত হন। এখানে এক শক্তিধর তন্ত্র-সিদ্ধ সাধকের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। এই মহাত্মার নির্দ্দেশিত পথে নিগূঢ়তর কৌল সাধনায় তিনি আগাইয়া চলেন।

উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে কমলাকান্তের চতুষ্পাঠীর সুনাম অতঃপর কমিয়া যায়। ছাত্র আজকাল তেমন আসেনা, ফলে শুরু হয় চরম অর্থাভাব।

ঘরে রহিয়াছে স্ত্রী ও একটি কন্যা, কিন্তু কোনমতেই ইঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা আর করা যাইতেছে না। সাধক কমলাকান্তের সেদিকে বিশেষ কোন দৃষ্টিও নাই। বিশালাক্ষী মন্দিরে আর শ্মশানে-মশানে পরম আনন্দে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান।

ভট্টাচার্য্য-পত্নী সেদিন বড় বিপদে পড়িয়াছেন, ঘরে টাকা পয়সা কিছুই নাই। শিশু কন্যাটির জন্য দুধের প্রয়োজন, তাহাইবা কিভাবে জুটাইবেন? স্বামীর ও নিজের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাই বা কি করিয়া হইবে, কিছুই ভাবিয়া পান না। হতাশ হইয়া গালে হাত দিয়া কেবলি সেদিন নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছেন।

হঠাৎ দ্বারে শোনা গেল এক মৃদু করাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের আঙিনা হইতে নারী কণ্ঠের ডাক আসিল, "ভট্চাজ্‌ মশাই কি বাড়ী আছেন? একবার দোর খুলুন।"

কপাট খুলতেই কমলাকান্তের পত্নী দেখিলেন, শ্যামবর্ণা পরম রূপ লাবণ্যময়ী এক কিশোরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গে তাহার রহিয়াছে দুইটি পরিচারক—তাহাদের মাথায় বহুতর খাদ্যবস্তুপূর্ণ দুইটি বড় চাঙাড়ি।

তাঁহার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে কিশোরী বলিয়া উঠিল, "এগুলো তুলে নাও গো! মা তোমাদের জন্য সিধে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সিধের এ প্রাচুর্য্য দেখিয়া কমলাকান্তের স্ত্রী তো অবাক! এদিকে তাঁহার এ বিস্ময় কাটিতে না কাটিতে বাহকেরা চাঙাড়ি দুইটি নামাইয়া কোথায় সরিয়া পড়িল। কিশোরীও তখনি তাঁহার রহস্যময় ভূবন-ভোলানো হাসি ছড়াইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কে কোথা হইতে এই খাদ্য সম্ভার পাঠাইয়াছে তাহা জানার আর অবকাশ হইল না। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী মনে মনে আকাশ পাতাল কত কিছু ভাবিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে কমলাকান্ত ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঘরে ঢুকে চাঙাড়ি ভরা এত সব জিনিস পত্র দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো! দরিদ্রের ঘরে হঠাৎ আজ একি বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য? কে এত যত্ন করিয়া এসব পাঠাইয়াছে?

ঘটনাটি বিবৃত করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ছাখো, মেয়েটির কোন পরিচয় জান্‌তে পারলুম না, কে এসব পাঠিয়ে আজ আমাদের প্রাণ বাঁচালো, তাও বুঝতে পার্‌ছিনে। কিশোরী মেয়েটি শুধু বল্‌লে,— মা পাঠিয়েছেন এসব। ওগো, কে এই মা?"

সাধক কমলাকান্তের দুই নয়নে তখন পুলকাশ্রুর ধারা নামিয়াছে। এতক্ষণে তাঁহার আর বুঝিতে বাকী নাই—এই মা যে তাঁহারই মা! সারা জগতেরই তিনি মা! জগৎ পালয়িত্রী জগদ্ধাত্রী আজ সিংহাসন

হইতে নামিয়া ছদ্মবেশে দীন ভক্তের কুটিরে আসিয়াছিলেন। এ যে তাঁহারই এক স্নেহলীলা!

গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে দেবী বিশালাক্ষীর এক ক্ষুদ্র মন্দির। দিনের পর দিন রাতের পর রাত কমলাকান্ত এখানে অতিবাহিত করেন। কখনো পূর্ব্বসূরী রামপ্রাসাদের, কখনো বা নিজের রচিত সঙ্গীতে প্রাণের আকুতি মায়ের চরণে নিবেদন করেন।

মায়ের সেবাপূজায় কমলাকান্তের প্রগাঢ় নিষ্ঠা। নিজে একেবার কপর্দ্দকহীন, দেবীর পূজা-উপাচার সংগ্রহের জন্য, ভোগরাগের ব্যবস্থার জন্য স্থায়ী কোন ব্যবস্থাও নাই। অথচ এ দায়িত্বভার তিনি নিজেই মাথায় তুলিয়া নিয়াছেন। আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজের সংসার রোজ যেমন চলে, তেমনিভাবে মায়ের সেবা, অর্চ্চনাও তিনি চালাইয়া যাইতে থাকেন।

দেবীর সেবার প্রাচীন প্রথা—রাত্রিতে মৎস্য রন্ধন করিয়া অবশ্যই তাঁহার ভোগ দিতে হয়। সেদিন বহু চেষ্টার ফলেও ভোগান্নের জন্য মাছ সংগ্রহ করা যায় নাই। সন্ধ্যার পর হইতেই কমলাকান্ত গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, বাহ্য কাজকর্ম্মের দিকে কোন হুঁসই তাঁহার নাই। গভীর নিশীথে যেই ধ্যান টুটিয়া গেল, অমনি মনে পড়িল মায়ের ভোগান্ন রন্ধনের কথা। তাই তো! বহু চেষ্টায়ও মৎস্যের যোগাড় যে আজ করা যায় নাই।

শিমুলতলার সাধন-আসনে বসিয়া আজিকার দুর্ভাগ্যের কথা তিনি ভাবিতেছেন। মনটা বড়ই বিষণ্ণ; দেবীর সেবায় এই বিঘ্ন হওয়াতে আজ তাঁহার প্রাণে বড় বাজিয়াছে। অনন্যোপায় কমলাকান্ত গুন্ গুন্ স্বরে মায়ের নামগান শুরু করিয়া দিলেন।

হঠাৎ মন্দিরের পিছন হইতে তাঁহার কাণে আসিল জলের শব্দ—ঝপ্ ঝপ্-ঝপাৎ।

কমলাকান্ত হাঁকিলেন, "কে গো ওখানে? এই কন্‌কনে শীতের রাতে ডোবার জলে কে নেমেছে?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা গেল, "আমি নারী বাগ্দী। মাছ ধরছি।"

"যদি পাও—আমায় কিছু দিয়ে যেওগো। মায়ের ভোগ আজ এখনো অবধি দেওয়া হয়নি।"

বাগ্দী রমণী কিছুক্ষণ পরে সিক্ত বসনে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। হাতে তাহার একজোড়া মাগুর মাছ। কমলাকান্তের সামনে এ দুইটি রাখিয়া কহিল, "নাও বাবা, এবার দেবীর ভোগ রেঁধে দাও।"

প্রদীপের আলোকে তাহাকে দেখিয়া কমলাকান্ত চমকিয়া উঠিলেন। এ কি ভুবনভোলানো রূপ এই তরুণীর। ইন্দ্রনীলমনির মত তাঁহার রঙ, সারা দেহে দিব্য লাবণ্য টলমল করিতেছে। আয়ত নয়নের আকর্ষণ বড় অদ্ভুত, সুস্মিত আননটি আনন্দে ঝলমল। আপনা বিস্মৃত হইয়া কমলাকান্ত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবিতেছেন, কে এই চিত্ত আলোড়নকারিণী নারী? এ অঞ্চলে কখনো তাহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না?

বাগ্দী নারীকে প্রশ্ন করিলেন, "বাছা তুমি কে গো? তোমায় তো চিনতে পারলুম না।"

চোখে মুখে হাসির দীপ্তি ছড়াইয়া তরুণী কহিল, "আমায় তুমি চিনতে পারোনি, কিন্তু বাছা তোমায় আমি খুব চিনি। তোমার মুখের গান শুনে যে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে। তাই তো আমি ছুটে ছুটে এখানে আসি।"

"তা, এতো রাত্রিতে একলা এদিকে এসেছো। তোমার মনে কি কোন ভয় ডর নেই?"

"বাবা, আমি যে চিরদিন একলাই আসি, একলাই যাই। সে কথা থাক্। এই মাছ দু'টো রইলো। তুমি মায়ের ভোগের যোগাড় কর। আমি এবার তবে আসি।"

বিস্মিত কমলাকান্তের সম্মুখ হইতে তরুণী ধীরে ধীরে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভাবতন্ময় হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে হুঁস

হইল ! সত্যই তো ! মাছ দুইটির দাম তো মেয়েটিকে দেওয়া হয় নাই, সেও উহা চাহে নাই, কে এই রহস্যময়ী নারী যে তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় এমন এক তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেল ?

চকিতে তাঁহার সারা অন্তরে খেলিয়া গেল বিদ্যুতের চমক। নিশীথ রাত্রে বিশালাক্ষী তলায় এই নির্জ্জন অরণ্যে কোন্ তরুণী একাকিনী আসিবে ? মৎস্য ভোগের জন্য মাছ ধরিবার জন্য কেন এমন ব্যাকুলতা তাহার ? এ রমণী তো মানবী নয় ! এমন অপার্থিব রূপের চমক কি মানুষের দেহে থাকে ? এ দিব্য রূপ যে তাঁহার সারা মন প্রাণ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে !

মন্দির সীমানায় ছুটিয়া গিয়া কমলাকান্ত উচ্চ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, "মাগো, একটিবার শুনে যাও, একটিবার ফিরে এসো !"

নিশীথ রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে ভাসিয়া আসিল শুধু তাঁহার নিজ কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি—আর শোনা গেল নিশাচর পেঁচক ও বাদুড়ের আওয়াজ।

অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও সেদিন এই রহস্যময়ী বাগ্‌দী নারীর কোন সন্ধান কমলাকান্ত পান নাই। কিন্তু স্মৃতিপটে তাঁহার ঐ অপরূপ নীলঘন রূপ চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—

কমলাকান্ত এ রূপের স্মৃতি অনুধ্যান করিয়া গাহিয়াছেন—

শ্যামারূপের নয়ন ভুলেছে,
অতি নিরুপম
চিকন কালো তেঁই।
নিরুপমা রূপ চিকন হেরিয়ে,
তা নইলে ত্রিলোচন,
পরম যতনে কেন
হৃদয় মাঝারে রেখেছে।

সাধক কমলাকান্তকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া জগজ্জননীর গোপনলীলা চলিয়াছে, রহস্য-গুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া পরম ভক্তের

আশেপাশে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোন ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই আসিতে চাহেন না।

মায়ের দর্শন মিলিতেছে না, পরমতত্ত্বের স্ফুরণে হৃদিমন্দির এখনো আলোকিত হইয়া উঠে নাই। অথচ সংসার জীবনের সমস্ত কিছু বিষয় বাসনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কমলাকান্ত এজন্যই মায়েয় মন্দিরে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোথায় কৃপাময়ীর সে কৃপা?

পঞ্চমুণ্ডীর সাধন ক্রিয়ার শেষে সেদিন গভীর রাত্রে কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর কাছে আসিয়া বসিয়াছেন। নিকটে কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। বিরলে বসিয়া একাগ্রচিত্তে রক্তজবার মালা গাঁথিতেছেন আর মায়ের বেদীতে নিবেদন করিতেছেন। এ সঙ্গে চলিতেছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া নিবেদিতপ্রাণ সন্তানের মান অভিমানের পালা—

জানি জানি গো জননি,
যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারই অন্তরে থাক মা,
আমারে লুকায়ে।
প্রকাশি আপন মায়া,
সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া
ত্রিগুণ দিয়ে।
কার প্রতি দুর্ম্মতি,
কুমতি হও মা কারো প্রতি,
আপনারো দোষে ঢাকো,
কারো দোষ দিয়ে।
মা! না করি নির্ব্বাণে আশ,
না চাহি স্বর্গবাস,
নিরখি নয়ন দুটি
হৃদয়ে রাখিয়ে।

ধ্যানানন্দে কমলাকান্ত একেবারে বিভোর! দুই চোখে অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে—নীরব, নিস্পন্দ হইয়া তিনি বসিয়া আছেন।

অকস্মাৎ মন্দিরের ক্ষুদ্র কক্ষটি সচকিত করিয়া কে একজন কহিয়া উঠিল, "বাবা, চুপ কর্‌লে কেন? আবার গাও।"

দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিলেন এক বর্ষীয়সি মহিলা সুস্মিত আননে বসিয়া আছেন

মমত্বভরা চোখ দুইটি কমলাকান্তের সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইয়া নিয়া আবার নারী কহিলেন, "বড় মধুর তোমার এ গান। আমায় আরো কিছু শোনাবে বাবা?"

কে এই বৃদ্ধা? এ মুখ তো চেনা নয়। অন্ধকারময় গভীর রাত্রে কোথা হইতে ইনি আসিয়াছেন?

কমলাকান্ত কহিলেন, "মাগো, গান আমি তোমায় শোনাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বল, তুমি কে? কোথা থেকে আস্‌ছো।"

"সে কি গো! আমায় তুমি চিনতে পারলে না, বাবা? আমি যে তোমাদের ধর্ম্মনারায়ণের মা।"

"তাই বল। আগে আর কখনো তোমায় দেখিনি কিনা!"

ধর্ম্মনারায়ণ এ গ্রামেরই এক গোয়ালা। রোজই সে বিশালাক্ষী মন্দিরে দুধ ক্ষীর ভেট নিয়া আসে। এই বৃদ্ধা তাহার মা—একথা জানিয়া কমলাকান্ত খুসী হইয়া উঠিলেন মনের আনন্দে পর পর অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে দেখা গেল বৃদ্ধা হঠাৎ কখন চলিয়া গিয়াছেন।

পরের দিন প্রভাতে ধর্ম্মনারায়ণ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে দুধ যোগাইতে আসিয়াছে।

কমলাকান্ত প্রশ্ন করিলেন, "হ্যারে ধর্ম্ম, কাল তুই ছিলি কোথায়? কাল তোর মা এসেছিলেন মন্দিরে। প্রাণভরে তাঁকে আমি কত গান শুনিয়ে দিলাম।"

"সেকি কথা ঠাকুর? আমার মা তো বহুদিন যাবৎ গত হয়েছেন।

আমি যখন শিশু তখনই যে তাঁর মৃত্যু হয়। পরের কাছে আমি ছোট-বেলায় মানুষ হয়েছি। বিশালাক্ষী দেবীই তো আমার মা, এ পৃথিবীতে আপন বল্‌তে আর তো কেউ আমার নেই!"

কমলাকান্তের হৃদয়ে আবার খেলিয়া গেল উন্মাদনাময় ভাবতরঙ্গ। বুঝিলেন, কাল রাত্রিতে জগজ্জননী আসিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া ছদ্মবেশে তাঁহার গান শুনিয়া গিয়াছেন। মাতৃবিরহের তীব্র বেদনা এবার কান্নায় ফাটিয়া পড়িল। উন্মত্তবৎ মা—মা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে এ সময়ে কমলাকান্তকে কাল কাটাইতে হইতেছে, অথচ সংসারের দিকে কোন দৃষ্টিই তাঁহার নাই। দিনরাত মাতৃধ্যানেই তিনি বিভোর থাকেন।

তাঁহার সংসারের এ সময়কার দুরবস্থা দেখিয়া এক অন্তরঙ্গ শিষ্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। ইঁহার নিজের বাড়ী অম্বিকায়, চান্না হইতে দূরত্ব হইবে প্রায় বারো মাইল। শিষ্যটি নানা অনুনয় বিনয় করিয়া কমলাকান্ত এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে অম্বিকায় নিয়া যান, তাঁহার সংসারের সমস্ত দায়িত্বও গ্রহণ করেন। ফলে আর্থিক দিক দিয়া এখন কমলাকান্তের আর কিছু ভাবিবার রহিল না।

কিন্তু চান্নার সাধনপীঠ ও দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারিবেন কেন? মন শীঘ্রই বড় উচাটন হইয়া উঠিল। ইহার উপর ঘটিল এক দৈব দুর্ব্বিপাক। অম্বিকায় যাইবার কিছুদিন পরে তাঁহার জননী দেহত্যাগ করিলেন।

অতঃপর কমলাকান্ত আর সেখানে অবস্থান করেন নাই, চান্নায় বিশালাক্ষী দেবীর চরণতলেই আবার তিনি ফিরিয়া আসেন।

এবার শুরু হয় তাঁহার সাধন জীবনে কঠোরতর তপশ্চর্য্যা। শক্তি-সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি একের পর এক তিনি সম্পন্ন করিতে থাকেন। ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর কৃপার দুয়ারটি অবশেষে একদিন উন্মুক্ত হইয়া যায়, তন্ত্রসাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

মায়ের নামামৃত রসে সাধক কমলাকান্তের জীবনভৃঙ্গার এবার ভরিয়া উঠিয়াছে। মায়ের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান সাধক মনের আনন্দে গাহিয়া চলেন—

মন তুই কাঙালী কিসে।
কালীনামামৃত সুধা
পান কর মন ঘরে বসে।
ভবার্ণবে মায়া তার,
কত ডুব্‌ছে উঠছে যাচ্ছে ভেসে।
ওরে, আনন্দধামেতে র'য়ে
রঙ্গ ত্থাখ্‌ তুই হেসে হেসে।

কমলাকান্তের সাধনা ও সিদ্ধির কথা, মাতৃসঙ্গীত রচনায় তাঁহার পারদর্শিতার কথা এখন হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

চান্না আর বর্দ্ধমান বেশী দূরের পথ নয়, ক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজার কাণেও তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি পৌঁছে। তেজচন্দ্র সমাদরের সহিত সাধককে রাজধানীতে আনয়ন করেন, পরম শ্রদ্ধাভরে গুরুর পদে তাঁহাকে বরণ করিয়া নেন। অতঃপর বর্দ্ধমান শহরের অনতিদূরে কোটালহাটে তিনি কমলাকান্তের জন্য এক বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার শ্যামা বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য পর্য্যাপ্ত মাসিক বৃত্তিও এ সময়ে নির্দ্ধারিত হয়।

কমলাকান্তের ব্যক্তিত্ব ও সাধনার প্রভাব ছিল অসামান্য। কিছুদিনের মধ্যেই যুবরাজ প্রতাপচাঁদ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া আরো বহু মুমুক্ষু তন্ত্রসাধনার পথে ধীরে ধীরে আগাইয়া চলেন।

কোটালহাটে স্থাপিত কমলাকান্তের শ্যামা বিগ্রহ এসময় হইতে এক মহাজাগ্রত দেবীরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন! নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত পুণ্যার্থী নরনারীকে দেবীপূজার দিনগুলিতে ভীড় জমাইতে দেখা

যায়। কখনো এই সাধনপীঠে, কখনো বা দামোদর তীরে কাঠগোলার শ্মশানে শক্তিসাধনার ক্রিয়াদি তিনি অনুষ্ঠান করিতেন।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি, ঘোর অন্ধকারে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। তদুপরি শুরু হইয়াছে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। গভীর নিশীথে মাতৃসাধক কমলাকান্ত কালী মন্দিরে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেবী পূজার লগ্ন বহিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাঁহার কোন খেয়ালই নাই। প্রকৃতির এ দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরপটে ভাসিয়া উঠিয়াছে জগন্মাতার ভীমা প্রলয়ঙ্করী রূপ। ধ্যানাবেশ কাটিয়া যাওয়ার পর শুরু হইল মায়ের রুদ্রাণী মূর্ত্তির স্তবগান।

বারবার কারণবারি কণ্ঠে ঢালিয়া উদাত্ত স্বরে তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

করালবদনাং ঘোরাং
মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং
মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়গ-
বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্
অভয়ং বরদঞ্চৈব
দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং
তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-
গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং।

মহাকালীর এই স্তোত্র, আর মাতৃনামের ঘন ঘন আরাবে পূজাস্থলী প্রকম্পিত হইতেছে। প্রলঙ্কর ঝটিকার সাথে প্রলঙ্করী দেবীর সিদ্ধ সাধকের সুরটি আজ যেন মিশিয়া গিয়াছে।

বিষ্ণু কর্ম্মকার কমলাকান্তের অনুগত শিষ্য, মন্দিরের পরিচারকের

কাজ পরম নিষ্ঠায় রোজ সে করিয়া থাকে। ব্যাপার দেখিয়া সে প্রমাদ গণিল। ঠাকুর তো নিজের উদ্দীপনা ও ভাবে প্রমত্ত রহিয়াছেন, এদিকে পূজার লগ্ন শেষ হওয়ার যে বেশী দেরী নাই।

মন্দিরে ঢুকিয়া সে নিবেদন করিল, "ঠাকুর, এবার স্থির হয়ে পূজোয় বসুন, সময় যে অতীত হয়ে যাচ্ছে।"

কমলাকান্ত কহিলেন, "ওরে, চেয়ে ছাখ্। আজ মায়ের আমার দনুজদলনী রূপ ফুটে বেরিয়েছে। আর শোন, মায়ের পূজোয় আজ মোষ উৎসর্গ ক'রতে হবে।"

"সে কি ঠাকুর! এই গভীর অমাবস্যা রাতে, জল-ঝড়ের ভেতর মোষ আমি কোথায় পাবো। আগে বললে বরং কোনমতে যোগাড় ক'রে রাখতে পারতাম।"

"ওরে, মায়ের রুদ্রাণী রূপ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, মোষ বলি ছাড়া আজ তাঁর অর্চ্চনা চল্‌বে না। মায়ের পূজোর যা কিছু উপচার চাই, তা তিনি নিজেই সংগ্রহ ক'রে নেবেন, তোর ভয় নেই। তুই শুধু একটু খুঁজে ছাখ্।"

বিষ্ণু কর্ম্মকারকে এই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রাতে বাহির হইতে হইল। গ্রামপথ ধরিয়া কিছুটা আগাইয়া যাইতেই সবিস্ময়ে সে দেখে, ঝড় বাদলে ভিজিতে ভিজিতে কয়েকটি লোক মন্দিরের দিকে আসিতেছে। সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটি বৃহদাকার মহিষ, আর দেবী পূজার জন্য বহুতর দ্রব্য।

মন্দিরের পরিচারকরূপে বিষ্ণু এ অঞ্চলে সুপরিচিত। আগন্তুকেরা তাহাকে দেখিয়া সোৎসাহে কলরব করিয়া উঠিল। মায়ের পূজা এখনো শুরু হয় নাই জানিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহাদের মনিবের মানৎ, কমলাকান্তের জাগ্রত ইষ্টবিগ্রহের কাছে এই মহিষ বলি দিয়া তিনি ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন। দুর্য্যোগের জন্য আজ তাহারা আরো আগে পৌছিতে পারে নাই।

বিষ্ণু কর্ম্মকার হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। কমলাকান্তের সঙ্কল্পিত

পূজা-উপচার যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আগাইয়া আসিবে ইহা সে ভাবিতে পারে নাই। এবার তাহার দুশ্চিন্তার ভার নামিয়া গেল।

পূজা সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া যায়। তারপর রাত্রির শেষ যামে ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া কমলাকান্ত উচ্চকণ্ঠে গাহিতে থাকেন তাঁহার সদ্যরচিত এক মাতৃ-সঙ্গীত—

আজ কেন লোল রসনা বিবসনা
শবাসনোপরে,
হর উরে কি কর জননী ?
গলিত অম্বর কেশ,
ধরেছ মা কেমন বেশ,
পদভরে কম্পিতা ধরণী !
নরকর শির হার
একি তব অলঙ্কার ?
কি কারণে না প'র অম্বর হেমমণি ?
ত্যজি মণি মন্দির
কেন বা শ্মশানে ফের,
উন্মত্তা যেন পাগলিনী ?
ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার,
ধরাতে না সহে ভার,
কম্পিত হয়েছে সহ করী
কুর্ম্ম ফণি।
কমলাকান্তের এই নিবেদন
ব্রহ্মময়ী,
হর উরে ধীরে ধীরে
নাচ গো জননী !

বর্দ্ধমানরাজ তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে গুরুত্বে বরণ করেন, তাহার পর হইতেই শুরু হয় এই শক্তিধর মানুষের আচার্য্য জীবন। শক্তি-সাধন

লাভে উৎসুক ভক্তের দল একে একে তাঁহার চরণতলে আসিয়া জুটিতে থাকে।

কমলাকান্ত তাঁহার সাধনায় তন্ত্রাচার ও যোগ উভয়ই অনুসরণ করিতেন। তাঁহার এই অনুসৃত সাধন পদ্ধতির কিছুটা পরিচয় মিলে তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'সাধকরঞ্জন'-এর মধ্যে। বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কমলাকান্ত ছিলেন একাধারে সাধক, কবি ও লোক-কল্যাণকামী মহাপুরুষ। সঙ্গীত রচনার দিক দিয়া পূর্ব্বসূরী রামপ্রসাদের কিছুটা প্রভাব তাঁহার মধ্যে অবশ্য লক্ষ্য করা যায়। রামপ্রসাদের ভাবময় সঙ্গীত তাঁহাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, উদ্দীপনাও জাগাইয়াছে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, কমলাকান্তের সাধনা ও সিদ্ধির বৈশিষ্ট্য, তাঁহার জীবনদর্শনের মৌলিকত্ব, তাঁহার ভাবময় জীবন ও রচনার মধ্য দিয়া স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার স্বতোৎসারিত গানের কলি শক্তিসাধনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের কণ্ঠে দীর্ঘদিন গুঞ্জরিত হইয়াছে। সাধক-কবি রামপ্রসাদের পরেই তাহারা দিয়েছে কমলাকান্তের স্থান।

কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন'-এর ভাব ও ভাষা এ দেশের সহস্র লোককে প্রেরণা দিয়াছে। এই সুরচিত গ্রন্থটি সম্বন্ধে পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়া গিয়াছেন, "সুললিত ভাষায় মনোহর ছন্দে অতি অল্পের মধ্যে তন্ত্রসাধনার গূঢ় তত্ব সকল এত সহজে আর কেহ বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।"

এই গ্রন্থ ছাড়াও কমলাকান্তের রচিত বহু মনোহর ভক্তিরসাত্মক পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত, সমর সঙ্গীত, আগমনী, বিজয়া, শিবসঙ্গীত এবং কৃষ্ণ-সঙ্গীত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর হৃদয়গলানো সার্থক রচনা।

শ্যামা মায়ের চিন্ময়ী রূপটি সাধক কমলাকান্তের অন্তরপটে ধরা

পড়িয়াছে! হৃদয়-কন্দর আজ মায়ের এ দিব্য রূপৈশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত। ইষ্টবিগ্রহের রূপ কালো হইলে কি হয়, কালোর এই নিঃসীম পারাবারেই যে সকল কিছু নাম ও রূপের পরিসমাপ্তি! এ কালো রূপ যে তাঁহার কাছে বড় মধুর, বড় বিমুগ্ধকর। তাই গাহিয়াছেন—

তেঁই শ্যামারূপ ভালবাসি!
কালি! জগমনোমোহিনী এলোকেশী,
তোমায় সবাই বলে কালো কালী,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।

ইষ্ট দেবীর চিদ্‌ঘন সত্তা তাঁহার অন্তরে দেদীপ্যমান। যে যাহাই বলুক না কেন, মাতৃসাধক কমলাকান্তের কাছে এই কালো আর তো কালো নয়—সে যে আলোয় আলো হইয়া উঠিয়াছে!

মায়ের এই রূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কমলাকান্তকে তাই গাহিতে শুনি—

কেন রে আমার শ্যামা মাকে
ব'ল কালো?
যদি কালো বটে তবে কেন
ভুবন করে আলো?
মা মোর কখন শ্বেত
কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে।
আমি জানিতে না পারি
জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল।
মা মোর কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ
কখন শূন্য মহাকাশ রে।
ওরে, কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে
সহজে পাগল হ'লো।

কমলাকান্তের কালীতত্ত্বের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সর্ব্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তির পরমতত্ব। বিশ্বসৃষ্টির সর্ববত্র জগজ্জননী শ্যামা-মাকে তিনি ওতপ্রোত দেখিতেছেন—

স্থলে অনিলে শূন্যে আছে,
মা মোর সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী শ্যামা
মা'রে জানোনা রে।
ঘটে আছে পটে আছে,
মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে,
তেঁই জগতের মন হরে।
কমলাকান্তের মন!
ভয় করিছ কারে?
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি,
ঘটেছে তোমারে।

অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বরূপে ইষ্টদেবী মহাকালী তাঁহার অন্তরে প্রকাশিতা। আকাশতত্ত্ব ও শব্দ তত্ত্ব, কালী-শিবের পরমসত্তা, পুরুষ-প্রকৃতি যে সেখানে একাকার!

অখণ্ড চৈতন্যময়ী মহাকালীর ধ্যানে সদাই তিনি মগ্ন, তাই শ্যামা ও শ্যামের পার্থক্য তাঁহার দৃষ্টিতে আর নাই। সাধনা ও কাব্যাকৃতির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে পরম সমন্বয়ের বাণী—

জাননা রে মন, পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে ল য় অসি
দনুজতনয় ক'রে সভয়।

কভু ব্রজপুরে আসি
বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন
করয়ে সৃজন পালন লয়।

রাজকুমার প্রতাপচাঁদের অন্তরে জাগিয়াছে মুক্তির তীব্র পিপাসা। কমলাকান্তের নিকট হইতে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিয়া তন্ত্রোক্ত নিগূঢ় ক্রিয়াদি এসময়ে তিনি নিষ্ঠাভরে করিতে থাকেন।

গুরুর প্রতি তাঁহার বড় ভক্তি। প্রায়ই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া বাস করেন। সাধন-উপদেশ গ্রহণ করেন।

সেদিনকার এক অমাবস্যা রাতে কমলাকান্ত প্রতাপচাঁদকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন, পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া নিগূঢ় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করেন।

সিদ্ধিলাভের জন্য রাজকুমার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রায়ই শ্মশানে থাকেন, আর কারণবারি পান করেন।

এ সব কথা মহারাজ তেজচন্দ্রের কাণে উঠিতে দেরী হয় নাই। মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সদলবলে তিনি একদিন অতর্কিতে কোটালহাটে আসিয়া উপস্থিত।

কালী মন্দিরের সম্মুখে যাইতেই কমলাকান্তের সঙ্গে দেখা। তিনি এইমাত্র শ্মশান হইতে ফিরিতেছেন। কারণবারি পান করিয়া সাধক উদ্দীপিত, নয়ন দুইটি জবাফুলের মত রক্তবর্ণ। হাতে তখনও হরিয়াছে এক সুরার ভাণ্ড। টলিতে টলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছেন, আর গাহিতেছেন—

সদানন্দময়ী কালি!
মহাকালের মনমোহিনী গো মা!
তুমি আপনি সুখে আপনি নাচ,
আপনি দেও মা করতালি।

আদিভূতা সনাতনী
শূন্যরূপা শশী ভালী
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী,
যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলাও তেমনি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত
দিয়ে ব'লে গালাগালি—
এবার সর্ব্বনাশি ধরে অসি
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই খেলি।

যেমন কমলাকান্তের মধুর কণ্ঠ তেমনি উদ্দীপনাময় ভাবের আবেশ। রাজা তেজচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই মহাসাধকের দিকে তাকাইয়া আছেন। হঠাৎ হুঁস হইল, ঠাকুরের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করার জন্যই যে আজ তিনি কোটালহাটে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

(গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ঠাকুর একি সব কাণ্ড আপনি এখানে ক'রছেন ? আমার ছেলে প্রতাপকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলাম, আশা ছিল আপনার শিক্ষাধীনে থেকে সত্যকার মানুষ হয়ে সে গড়ে উঠতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টো। আপনার সঙ্গে থেকে থেকে সে আজ এক ঘোর মাতাল হয়ে উঠেছে। যুবরাজ সম্বন্ধে যে সব সংবাদ আমার কাণে গিয়েছে তা যে সত্যি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই।"

কমলাকান্ত স্মিতহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ, কোন্ তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে আপনি একথা বলছেন ?"

"ঠাকুর, আপনার হাতের এই মদের ভাঁড়ই কি এক বড় প্রমান নয় ? এখানে দাঁড়িয়ে যে আমি মদের গন্ধ পাচ্ছি।"

"মহারাজ, কে বলেছে আপনাকে যে এ ভাঁড়ে সুরা রয়েছে? এ যে খাঁটি দুধ!"

তেজচন্দ্র ক্রোধভরে আগাইয়া আসিলেন। সঙ্গীয় কর্ম্মচারী ও দেহরক্ষীরাও কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, কমলাকান্তের হস্তস্থিত বৃহৎ ভাঁড়টি সত্য সত্যই দুধে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কারণবারি তো উহার ভিতরে নাই! যে গন্ধ এতক্ষণ সকলে পাইতেছিলেন তাহাও চলিয়া গিয়াছে।

একি অলৌকিক কাণ্ড! তেজচন্দ্র আজ এ ব্যাপারের শেষ দেখিয়া তবে ছাড়িবেন। কহিলেন, "ঠাকুর এ যদি দুধই হয়, তবে তো এ থেকে মাখন তৈরী করা যাবে? বেশ আজ তাই আমরা সবাই এখানে পরখ্ ক'রে দেখবো।"

কমলাকান্ত হাঁড়িটী তাহাদের হাতে দিলেন। ঐ দুধ হইতে মাখন তৈরী করা হইল, আর মাখন গলাইয়া পাওয়া গেল সদ্য ঘৃত। এই ঘৃত দিয়া সাধক মন্দিরে বসিয়া তাঁহার হোম সম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর আসন হইতে উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ, এবার হয়তো আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হয়েছে, ঐ ভাঁড়ে যে মদ ছিল না, ছিল দুধ—তা তো প্রমাণিত হ'লো?"

একথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তেজচন্দ্র উপলব্ধি করিলেন, গুরুদেব আজ তাঁহারই কল্যাণের জন্য, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এক অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ করিলেন।

সিদ্ধ, গুরুকে অবিশ্বাস করিয়া যে ভাল করেন নাই, ইহা বুঝিয়া খেদও যথেষ্ট হইল।

যুবরাজ প্রতাপচাঁদকে নিয়া মহারাজকে আর বেশীদিন দুশ্চিন্তায় ভুগিতে হয় নাই। বৈরাগ্যবান কুমার অল্পদিনের মধ্যে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া যান।

সিদ্ধ কৌলসাধক কমলাকান্তের খ্যাতি এ সময়ে বাংলার বাহিরে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। সেবার কাশীধামে মহাসমারোহে

বারোয়ারী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। উদ্যোক্তাদের বড় ইচ্ছা তাঁহাকে দিয়া মায়ের পূজা অনুষ্ঠান করাইবেন। কমলাকান্তেরও অনেকদিনের অভিলাষ, বারাণসী একবার ঘুরিয়া আসেন। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ তাঁহার দর্শন করা হয় নাই। এই আমন্ত্রণের সুযোগ তিনি গ্রহণ করিলেন।

মধ্য রাত্রে কমলাকান্ত শ্যামাপূজায় বসিয়াছেন। পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে চলিতেছে ঘন ঘন কারণপান ও মাতৃনামের ধ্বনি।

একি সব অনাচার? দেবীর অর্চ্চনায় বসিয়া এমন সুরাপান করা কেন? একদল লোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

উদ্যোক্তারা বুঝান, কমলাকান্ত সিদ্ধপুরুষ। স্বেচ্ছাময় মায়ের পূজায় বসিয়া আপন ভাবাবেশে চলেন, বৈধী অর্চ্চনার বড় একটা ধার ধারেন না। সকলে একথা মানিতে চাহিবে কেন? কয়েকজন শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠে বামাচারী নাম দিয়ে কত লোকেই তো এ ধরণের পূজা অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। কিন্তু মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে কয়জন? কমলাকান্ত যদি মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে সত্য সত্যই জাগ্রত ক'রে তুলতে পারেন, তবেই বুঝা যায় তাঁর সামর্থ্য।"

একজন স্পষ্ট বক্তা আগাইয়া আসিয়া বলে, "ঠাকুর, কারণ পান ও মত্ততা তো অনেক হলো, কিন্তু মাটির মূর্ত্তিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারলেন কৈ? শুধু লোক দেখানো ঢং এর সার্থকতা কি?

কমলাকান্তের নয়ন দুটি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গর্জ্জিয়া কহিলেন, "বটে, তবে সত্যিই দেখতে চাও—প্রতিমা জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কিনা?"

সামনেই বলিদানের খড়্গটি পড়িয়া আছে, এটি তুলিয়া কমলাকান্ত প্রতিমার বাহুতে বসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা বিগ্রহের আহত স্থান হইতে ঝরিতে লাগিল রক্তধারা।

ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় সমালোচকের দল তখনি কমলাকান্তের চরণে লুটাইয়া পড়ে। ইহার পর কমলাকান্ত কাশীতে আর অপেক্ষা করেন নাই, কোটালহাটের নিজ পরিবেশে ফিরিয়া আসেন।

কাশীতে গিয়া কমলাকান্তের মন ভরে নাই, অন্তর্ম্মুখীন সাধক এখন দিনের পর দিন আত্মসত্তার গভীরে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছেন তাঁহার রচনায় এসময়কার মানসিকতার নিদর্শন মিলে—

আপনারে আপনি দেখ
যেওনা মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
তীর্থগমন দুঃখ ভ্রমণ,
মন! উচাটন হয়োনারে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণী স্নানে
শীতল হও না মূলাধারে।

আরো বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কমলাকান্ত এবার বড় বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। প্রিয় শিষ্য প্রতাপচাঁদ আর নাই। উত্তর সাধিকা প্রিয়তমা দ্বিতীয়া স্ত্রীও দেহরক্ষা করিয়াছেন। এখন গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র যোগসূত্র তাঁহার কন্যাটি। এ ক্ষীণ সূত্রটিও এবার আর থাকিতে চাহে না। পরপার হইতে কমলাকান্তের নিজেরই সেদিন ডাক আসিয়া পড়ে।

পীড়িত গুরুদেবকে দেখিতে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, মরলীলা সমাপ্তির আর বেশী দেরী নাই।

মহারাজা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, অন্তিম সময়ে গুরুদেবকে তো গঙ্গাতীরে না নিলে চলিবে না। কিন্তু তাঁহার এ প্রস্তাব যে কমলাকান্ত কাণেই তুলিতে চাহেন না! বারবার পীড়াপীড়ি করা হইলে অস্ফুটস্বরে গাহিলেন নিজেরই একটি গানের পদ—

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাবো?
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি শরণ ল'ব?

প্রাচীন প্রথা ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ধারক তেজশ্চন্দ্র এ কথায় বড় বিষণ্ণ

হইয়া পড়িলেন। গুরুদেবের গঙ্গাপ্রাপ্তির সব ব্যবস্থাই তিনি প্রায় করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই যে তাঁহাকে রাজী করানো যাইতেছে না।

কমলাকান্ত তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি মনস্তাপ দূর করুন। এখানেই মায়ের মন্দিরের সামনে আমি আমার চোখ বুজতে চাই। আপনি কাল মধ্যাহ্নে একবার আস্‌বেন।"

পরের দিন কমলাকান্তের ভবন লোকে লোকারণ্য, পাত্রমিত্রসহ মহারাজ তেজচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত।

সকাল হইতে সাধক এক দিব্যভাবে বিভোর হইয়া আছেন। এবার ভক্তদের কহিলেন, "আমার জন্য তৃণশয্যা বিছিয়ে দাও।"

ধরাধরি করিয়া দেহটি ভূমিতলে এই তৃণশয্যায় নামানো হইল। কমলাকান্তের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে এক দিব্য জ্যোতির আভা। কণ্ঠ ক্ষীণ, তবুও পরমানন্দে ধীরে ধীরে তাঁহার ইষ্টদেবীকে উদ্দেশ করিয়া গান ধরিলেন—

শ্যামারূপে নয়ন ভুলেছে।
অতি নিরুপম রূপ
চিকন কালো তেঁই
নিরুপমা রূপ চিকণ কালো
হেরি যে।
তা নইলে ত্রিলোচন
হৃদয় মাঝারে রেখেছে ?

জগজ্জননীর এই নীরদবরণী রূপের ধ্যান করিতে করিতে মাতৃসাধক চিরতরে নয়ন নিমীলিত করিলেন।

সমবেত জনতা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া দেখিল, তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভগবতীর পবিত্র ধারা গৃহতলে উৎসারিত হইতেছে !

এই অলৌকিক জলধারার আবির্ভাবের পর গুরুর গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য মহারাজ তেজচন্দ্রের আর খেদ থাকে নাই।

চরণদাসবাবাজী

গোঁসাইবাবুদের যশোর-কাছারীতে সেদিন উত্তেজনার অবধি নেই। পুরাতন এক বিলের সত্ব নিয়া বিরোধ। প্রজারা এটি তাহাদের দখলে রাখিতে চায়, কিন্তু জমিদার একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছেন।

এ কাছারিতে অবিলম্বে একজন সৎ ও সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রাইচরণ ঘোষের এদিক দিয়া সুনাম আছে, তাই তাঁহাকেই এখানে পাঠানো হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষের হুকুম,—যেভাবেই হোক বিরোধী প্রজাদের দমন কর, তাহাদের দখল-করা খেতের আউস ধান জোর করিয়া কাটিয়া আন।

লাঠি ঢালসর্কী নিয়া জমিদারের বরকন্দাজেরা আগাইয়া যায়। রাইচরণবাবু ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, বন্দুক হস্তে তাঁহাকেও মাঠের মধ্যে অবতীর্ণ হইতে হয়। এ পক্ষের তোড়জোড়ে ভীত হইয়া প্রজারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে।

কাছারীবাড়ীর প্রাঙ্গণে কাটিয়া-আনা ধান স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। চারিদিকে শোনা যায় জয়ের উল্লাসধ্বনি। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রাই-চরণবাবু কি জানি কেমন হইয়া গিয়াছেন, মনে তাঁহার একটুকও শান্তি নাই। শস্যস্তূপের দিকে তাকাইতেই বুকটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

রাইচরণ কেবলি ভাবিতেছেন, চাকুরি করিতে আসিয়া দিন দিন একি অমানুষের পর্য্যায়ে তিনি নামিয়া চলিয়াছেন? এভাবে দরিদ্র প্রজাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনা যে এক মহাপাপ! চাকুরীর দায়ে সেই পাপই আজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।

সেদিনকার এ ঘটনা তাঁহার সারা জীবনের ভিত্তিকে টলাইয়া

দিয়া যায়। অস্ফুটস্বরে আপন মনে হঠাৎ বলিয়া উঠেন, "আর নয়! এই ঘৃণিত জীবনের আজই, এইখানেই শেষ!"

বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে। দুপুরের আহার্য্য প্রস্তুত, রাইচরণ তাহা স্পর্শও করিলেন না। অনুশোচনার তীব্র আগুন জ্বলিতেছে তাঁহার বুকে, সমস্ত সংসার হইয়া গিয়াছে একেবারে অর্থহীন।

বিষাদখিন্ন হৃদয়ে সেদিনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন।

যে প্রচ্ছন্ন সর্ব্বনিয়ামক শক্তি রাইচরণকে সেদিন ঘরছাড়া করে, উত্তরকালে তাহাই আবার তাঁহাকে সমাজ-জীবনের মধ্যে টানিয়া আনে। বৈরাগী জীবনের শেষে, মানবপ্রেমিক এক সিদ্ধপুরুষরূপে তিনি ফিরিয়া আসেন।

রাগানুগা ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইলেও সাধনার নিভৃতির মধ্যে তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকেন নাই। ভক্তসমাজের কাছে তিনি আবির্ভূত হন এক পরমাশ্রয়রূপে। বড় বাবাজী শ্রীরাধারমণ চরণ-দাস রূপে দেখা যায় তাঁহার অভ্যুদয়; এ অভ্যুদয় বাংলার বৈষ্ণব ইতিহাসে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হইয়া যায়।

রাইচরণ সেদিন ঘর ছাড়িলেন বটে, কিন্তু পথের কোন সন্ধানই পান নাই। কোথায় তাঁহার গন্তব্য পথ? কোন্ ইষ্টকেই বা সাধন-জীবনে গ্রহণ করিবেন, কিছুই যে তিনি জানেন না।

পথ চলিতে চলিতে অনেক কথাই সেদিন স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে। বৈরাগ্য-আগুনের যে স্ফুলিঙ্গ তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনকে এমন করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিল, ইহার ইন্ধন দিনের পর দিন জীবনের তলে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সংসারে প্রাচুর্য্য ছিল, সুখ শান্তিরও অভাব কখনো দেখা যায় নাই। তবু এসব ছাপাইয়া পরম প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্খা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। আজিকার এ ঘটনাটি তাঁহার জীবনে টানিয়া দিয়াছে একটি অঙ্ক-সমাপ্তির যবনিকা।

আজ তাঁহার মনে পড়ে সেই পুরাতন কথা। দীক্ষাগুরু কৌল-সাধক যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিন তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ

করিয়াছেন। রাইচরণের বংশ তান্ত্রিক, তাই কুল-রীতি অনুসারেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এসময়ে তিনি শাক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কুলগুরুর জ্যোতিষী বিদ্যা কিছুটা জানা আছে, শিষ্যের কোষ্ঠি বিচার করিয়া বড় বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "বাবা, তোমার ভোগ তো সবই দেখ্‌ছি কেটে গিয়েছে। সাম্‌নে রয়েছে সংসার ত্যাগের যোগ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি বহুজনের আদর্শ হবে, লোকগুরু হবে।"

রাইচরণের মানসপটে ভাসিয়া উঠে আর একদিনের কথা। সেদিন তিনি প্রাপ্ত হন মা ভবানীর প্রত্যাদেশ! এক বিচিত্র স্বপ্ন তিনি দর্শন করেন।—জগজ্জননী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিতেছেন, "বৎস, তুমি ভবানীপুরে যাও, সেখানে আমার সম্মুখে বসে পুরশ্চরণ অনুষ্ঠান কর। তোমার সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

রাইচরণ শিহরিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে চলিল আলোড়ন। রাত্রি গভীর হইলে কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ইহার পর দীর্ঘদিন কাটিয়া গিয়াছে, সে রাত্রির স্বপ্নের কথা আর তাঁহার তেমন মনে নাই।

এবার পথ চলিতে চলিতে শুরু হয় নানা ভাবনা। প্রাক্তনের অমোঘ বিধান তো আজ তাঁহাকে বৈরাগী করিয়া ছাড়িল। এবার কোন্ পথে, কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে পা বাড়াইবেন?

কাণে তাঁহার এখনো ধ্বনিত হইতেছে—'ভবানীপুর'। ভাব-তন্ময় রাইচরণ নিজের অজ্ঞাতসারে উত্তরবঙ্গের শক্তিপীঠ ভবানীপুরের পথেই সেদিন আগাইয়া চলিলেন।

বিখ্যাত সিদ্ধপীঠ এই ভবানীপুর। পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর জাগ্রতা দেবীমূর্ত্তি অপরূপ মহিমায় অধিষ্ঠিতা, বহু তন্ত্রসাধকের ইহা সাধনভূমি। অতিকষ্টে দীর্ঘ পথ-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া রাইচরণ পদব্রজে এখানে উপস্থিত হন।

শক্তিমন্ত্রের সিদ্ধি ও পুরশ্চরণের জন্য জগন্মাতার প্রত্যাদেশ তিনি

পাইয়াছেন। এবার ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা জুটিতেও দেরী হইল না।

সেদিন সূর্য্যগ্রহণ। দেবী ভবানীর বেদীর সম্মুখে বসিয়া সবেমাত্র পুরশ্চরণ শেষ করিয়াছেন, হঠাৎ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। একেবারে শিবনেত্র, বাক্‌শক্তিহীন, সারা দেহ বাহিয়া অবিরল ধারে ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়িতেছে! এই নবাগত মানুষটিকে নিয়া সেদিন এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

দুই তিন ঘণ্টা পরে রাইচরণের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভবানীপুর-পীঠে থাকিয়া সাধনভজন করেন। রাইচরণের এ অবস্থা দেখিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন, তাঁহার সেবা যত্ন শুরু করিয়া দিলেন।

প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর প্রশ্ন করিলেন, "বাবা বলতো এখন কেমন বোধ ক'রছো।"

রাইচরণ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া শুধু এদিক ওদিক তাকান। কি এক অমূল্য ধন যেন তিনি সেখানে খুঁজিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সখেদে কহিলেন, "এই তো এখানে দেখ্‌ছিলুম। মা আমার আবার কোথায় চলে গেলেন?"

"বাবা, কার কথা বল্‌ছো?"

"মা-জগজ্জননীর কথা।"

অতঃপর তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজিকার এ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্য দিয়া রাইচরণ অধ্যাত্ম-জীবনের এক বড় নির্দ্দেশ পাইয়াছেন। ইষ্টদেবী মহামায়া স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন এবং তাঁহাকে বলেন, "বৎস, তুমি সরযূতীরে যাও, সেখানেই তোমার প্রার্থিত পরম বস্তুর সন্ধান মিল্‌বে। তোমার অধ্যাত্ম-জীবনের গুরু সেখানেই অবস্থান ক'রছেন। তাঁর কৃপায় অচিরে তোমার ইষ্টলাভ হবে।"

ভাবাবিষ্ট রাইচরণের দুই নয়ন বহিয়া তখন দরদর ধারে পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

অতঃপর অন্তরে তাঁহার প্রশ্ন জাগিল—কে তাঁহার এই গুরুকে চিনাইয়া দিবে ? সে মহাপুরুষের কোন পরিচয়ই তো তিনি জানেন না!

অন্তর্য্যামিনী জগন্মাতা মৃদু মধুর কণ্ঠে আবার কহিলেন, "বাবা তোমায় ভাবতে হবে না, তোমার কথা সে জানে। তোমার জন্য সে সেখানে অপেক্ষা ক'রতে থাকবে। তার নাম শঙ্করারণ্যপুরী। পূর্ব্বাশ্রমে সে ছিল খড়দহের এক বৈষ্ণব আচার্য্য। যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে সে তখন পরিচিত ছিল। আয়ত নয়ন, আজানুলম্বিত বাহু আর দীর্ঘ সুঠাম তনু দেখেই তুমি তাঁকে চিন্‌তে পারবে।"

কৃপাময়ী দেবী আরো জানাইলেন, "স্বামী শঙ্করারণ্যপুরী এক বিরক্ত সন্ন্যাসী, আর কাউকে শিষ্য কর্‌বেন না ব'লে তিনি কিছুদিন আগে প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু বাছা, তোমার ভয় নেই, তোমার ক্ষেত্রে সে প্রতিজ্ঞা তাকে ভঙ্গ ক'রতে হবে।"

রাইচরণের আনন্দ আর ধরেনা। ভক্তিভরে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে তিনি সরযূতীরে উপনীত হইলেন।

অযোধ্যার প্রান্ত দিয়া এই পুণ্যতোয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে। ইহারই তীরে তীরে মুমুক্ষু রাইচরণ তাঁহার গুরুকে খুঁজিয়া বেড়ান। মনে ভয়, সাক্ষাৎ হইলেও কৃপা করিবেন কিনা কে জানে ?

হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল এক দিব্যকান্তি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর দিকে। স্নান সমাপনের পর একটি কাষ্ঠ-কমণ্ডলু হস্তে তিনি চলিয়াছেন।

রাইচরণ সেদিকে কিছুটা আগাইয়া গেলে হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

কহিলেন, "এসো বাবা এসো, তোমার জন্যই যে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি।"

রাইচরণ বুঝিলেন, ইনিই মা ভবানীর নির্দ্দেশিত সেই মহাপুরুষ,

তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের চিহ্নিত নিয়ামক। ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ পতিত হইলেন।

সরযূর সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র বন, ইহারই মধ্যে ছায়াচ্ছন্ন নির্জ্জন পরিবেশে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম। মহাপুরুষ ধীর পদক্ষেপে এখানে প্রবেশ করিলেন।

সম্মুখেই একটি ভজন কুটির, গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে স্থাপিত একটি তুলসী মঞ্চ। মহাপুরুষ ভজনকুটিরে ঢুকিয়া দরজাটি কিছুক্ষণের জন্য অর্গলবদ্ধ করিলেন।

প্রাঙ্গণে প্রতীক্ষমান এক তরুণ সেবক-শিষ্য তৎক্ষণাৎ রাইচরণের সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন। হাতে তাঁহার একটি জলের ভাণ্ড! তখুনি ইহার জল দিয়া সযত্নে তিনি রাইচরণের ধূলিকাদা মাখানো পা দুইটি ধুইয়া দিলেন।

অতঃপর শিষ্যটি নিকটে বসিয়া যেকথা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে রাইচরণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

—কিছুদিন আগেই গিয়াছে সূর্য্যগ্রহণ। এই দিন দীর্ঘ সময় মহাপুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। বাহ্যজ্ঞান পাইবার পর হঠাৎ এক-সময়ে সানন্দে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন, "আহা, কি ভাগ্যবান! কি ভাগ্যবান!"

সেবক-শিষ্যটি তাঁহার এই উক্তির মর্ম্ম জানিতে চাহিলেন, "বাবা কার সৌভাগ্যের কথা আপনি বল্‌ছিলেন?"

পুরীজী উত্তর দিলেন, "তবে শোন্, বলছি। ভবানীপুর-পীঠে বসে এক শুদ্ধসত্ত্ব সাধক পুরশ্চরণ কর্‌ছিলেন। মহামায়া তাঁর উপর প্রসন্না হয়েছেন। আর, এর ফলে দেবী আজ আমায় অনুগ্রহ ও নিগ্রহ—দুই-ই করলেন। তাঁর অনুগ্রহ—তিনি আমায় তাঁর ঐশীকর্ম্ম সাধনের যন্ত্ররূপে অঙ্গীকার ক'রলেন। আর নিগ্রহ—আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য দিলেন তাঁর আদেশ। আর কোন শিষ্য গ্রহণ ক'রবোনা ব'লে সঙ্কল্প করেছিলাম। কিন্তু মাতৃকৃপাধন্য এই তরুণ সাধকের জন্য

আমায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রতে হচ্ছে! পরে দেখ্‌বে, একে দিয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।"

জগজ্জননীর এ কৃপার কথা শুনিয়া রাইচরণের আনন্দের অবধি নাই। অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে।

অতঃপর দীক্ষা দানের পালা। সরযূতে তিনি স্নান করিয়া আসিলে তাঁহাকে তিলক-বিভূষিত করা হইল।

কিন্তু কণ্ঠিমালা কোথায়? তা তো আনা হয় নাই?

পুরী মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তাইতো এই মালা এখন কি ক'রে সংগ্রহ করা যাবে?"

সেবক-শিষ্যটি উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনার নিজের জন্য সে-বার তিনটি কণ্ঠিমালা আপনি কিনেছিলেন, তা আমার কাছে রয়েছে। এখনো ব্যবহার করা হয়নি। তাকি বা'র ক'রে দেবো?

পুরীজী কহিলেন "আহা! যোগমায়ার কি অদ্ভুত যোগাযোগ? দেখ্‌ছি নিতাইচাঁদ এই অধম কীটানুকীটকে নিমিত্ত ক'রে এ নূতন ভক্তটিকে কৃপা বিতরণ ক'রতে চাচ্ছেন! আচ্ছা বেশ, তবে সেই মালায়ই এর কণ্ঠে পরিয়ে দাও!"

মুমুক্ষু রাইচরণকে মহাপুরুষ এবার মন্ত্র প্রদান করিলেন। অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে তাঁহার এই মন্ত্রে! কাণে একবার প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নবীন শিষ্যের সর্ব্ব সত্তা আলোড়িত হইয়া উঠিল—আর দেখা দিল অশ্রু কম্প স্বেদ ও পুলকোদগম। প্রেমের মত্ততায় দেহটি কেবলি ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।

নব দীক্ষিত শিষ্যের এ অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দর্শনে গুরুদেবের আনন্দের অবধি নাই। প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাইচরণ সারা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিলেন, গুরু তাঁহার করুণার অবতার! প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমশক্তি তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত।

প্রেমভক্তির এক মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি, সেই সঙ্গে মহাশক্তিধরও বটেন। এই সন্ন্যাসীর স্নেহচ্ছায়া লাভে তিনি আজ কৃতার্থ।

গুরুদেবের উপদিষ্ট বৈষ্ণব সাধন প্রণালী তিনি আয়ত্ত করা শুরু করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটিত তত্ত্বসমূহের মর্ম্ম বুঝিয়া নিতেও তাঁহার বেশী দেরী হইল না।

তান্ত্রিক বংশে রাইচরণের জন্ম, কুলগুরুর কাছে শাক্ত দীক্ষাও তিনি নিয়াছেন। এবার তাঁহার এই সুদৃঢ় সাধন-আধারে গুরু শঙ্করারণ্য পুরীজী ঢালিয়া দেন বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তির মহারস। এই রসের ধারা উত্তরভারতের দিকে দিকে অতঃপর বিস্তারিত হইতে থাকে। রাইচরণ ঘোষ আত্মপ্রকাশ করেন সর্ব্বজনবন্দিত আচার্য্য, চরণদাস বাবাজীরূপে। এক জীবন্ত, সর্ব্বজনীন বৈষ্ণব আন্দোলন তাঁহার প্রেমশক্তি ও নামকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে।

যশোহর জেলার নড়াল মহকুমার গ্রাম মহিষখোলা। এই গ্রামের কায়স্থেরা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। এই কায়স্থ বংশের মোহনচন্দ্র ঘোষের অন্যতম পুত্ররূপে ১২৬০ সনের ২৯শে চৈত্র রাইচরণ আবির্ভূত হন।

তিনি যখন প্রায় পাঁচ বৎসরের শিশু, তখন হঠাৎ একদিন পিতা মোহনচন্দ্রের লোকান্তর ঘটে। মা কনকসুন্দরী এবং কাকা ঈশানচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বালক ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে থাকেন।

উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্রের মৃত্যুর পর মাতার সম্মুখে রহিলেন এই একমাত্র পুত্র রাইচরণ। পরম আদরে ও স্নেহে তিনি বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। জননী বড় উদার ও ধর্ম্মপরায়ণা। বালককাল হইতে এ বৈশিষ্ট্যগুলি রাইচরণের চরিত্রেও ফুটিয়া উঠে।

বর্ষার দিনে রাইচরণ দেখিতে পান, এক সহাধ্যায়ীর ছাতা নাই—অমনি তাহাকে নিজের ছাতাটি দান করিয়া সানন্দে তিনি বাড়ী ফিরেন। পথিমধ্যে হয়তো কোন দুঃস্থ ব্যক্তি শীতে কষ্ট পাইতেছে, পিতার মূল্যবান শালখানাই তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া চলিয়া আসেন।

সেদিন রাইচরণ দ্রুতপদে বিদ্যালয়েরদিকে চলিয়াছেন। দেখিলেন, এক বৃদ্ধ বাজার হইতে ফিরিতেছে, প্রবল জ্বরে সে আক্রান্ত, চলিবার সামর্থ্য নাই। রাস্তার পাশে তাহার চালডালের বোঝাটি পড়িয়া আছে। অমনি তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, বোঝাটি মাথায় নিয়া রুগ্ন ব্যক্তটিকে গৃহে পৌছাইয়া দিলেন।

বালক পুত্রের এই ধরণের কাজে জননী কোনদিনই উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

যুবক বয়সে রাইচরণের বিবাহ হয়, নববধূ স্বর্ণময়ীকে নিয়া বেশ আনন্দেই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু অতঃপর দেখা দেয় নানা দুর্দ্দৈব। দুইটি পুত্র-সন্তানের মৃত্যুতে তাঁহার সংসারে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। ইহার পর বংশরক্ষার জন্য রাইচরণকে পর পর আরো দুইটি বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী পর্যায়ে রাইচরণ ঘোষকে দেখা যায় বৈষয়িক জীবনের এক সাফল্যমণ্ডিত পুরুষরূপে। পৈতৃক টাকাকড়ি ও জোতজমি যথেষ্ট রহিয়াছে, তদুপরি নিজেও ভাল উপার্জ্জন করেন। জমিদার সরকারের অধীনে চাকুরী নিবার পর হইতে উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। নায়েব এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে রাইচরণবাবু জমিদার ও প্রজা উভয়ের কাছেই প্রচুর সুনাম অর্জ্জন করেন। কৌশলী, দক্ষ ও মহানুভব এই কর্ম্মচারিটিকে সকলকেই সমীহ করিয়া চলিতে দেখা যাইত।

প্রাচুর্য্য ও শান্তিতে পরিপূর্ণ রাইচরণের গৃহ। আত্মীয় ও অতিথি অভ্যাগতের আগমন সেখানে লাগিয়াই আছে। দোল, রাস, ঝুলণ, দুর্গোৎসবের পালা-পার্ব্বণে জাঁকজমকও করা হয় যথেষ্ট। জনকল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয়ে তাঁহার কুণ্ঠা নাই। পুষ্করিণী খনন এবং গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেখা যায় তাঁহার প্রবল উৎসাহ। কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁহার যেন তৃপ্তি নাই, এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও

প্রাচুর্য্য কেবলি মনে হয় নিরর্থক। সংসারজীবনের মূল ভিত্তিটি অলক্ষ্যে দিনের পর দিন কেবলি শিথিল হইয়া যাইতেছে।

ঐশ্বর্য্য ও মানসম্ভ্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাইচরণের জীবনের অন্তস্তলে জাগিয়া উঠিতেছে এক নির্ব্বেদময় ভাব। বৈরাগ্যের ফল্গুধারা আজ বাহিরে উৎসারিত হইতে চাহিতেছে।

রাইচরণের কুলগুরু ছিলেন শক্তিমান তন্ত্রসাধক, দীর্ঘদিন আগে শিষ্য সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী তিনি করেন, উত্তরজীবনে তাহাই তাঁহার জীবনে সত্য হইয়া উঠে।

ভাগ্যের নানা বিচিত্র আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া রাইচরণ ঘোষ উপনীত হইয়াছেন সরযূতটে, শক্তিধর মহাপুরুষ শঙ্কারারণ্যের কৃপা পাইয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

মহাপুরুষের দেওয়া এই বৈষ্ণবীয় দীক্ষা জীবনে ঘটাইয়া দেয় অপূর্ব্ব রূপান্তর। স্পর্শমনির ছোঁয়ায় তিনি হইয়া উঠেন এক নূতন মানুষ। আজ তাঁহার দৃষ্টিতে নিখিল ভুবন মধুময়—প্রেমময়!

'জয় নিত্যানন্দ রাম, জয় গৌর গুণধাম' বলিয়া তিনি অযোধ্যার এ আশ্রম কুটিরের পবিত্র রজে গড়াগড়ি দিতেছেন, চলিতেছে তাঁহার হাসি কান্না। স্বভাবগম্ভীর, ধীরস্থির, বিষয়কর্ম্মনিপুণ রাইচরণ হঠাৎ যেন উন্মত্ত হইয়াছেন। দুই নয়নে প্রেমাশ্রুপাতের বিরাম নাই, পুলকাঞ্চিত দেহে ফুলিয়া ফুলিয়া অবিরত তিনি কাঁদিতেছেন। জীবনে তাঁহার এবার পরম সৌভাগ্যোদয়! তাই শুরু হইয়াছে সদ্‌গুরুর কৃপালীলা আর মন্ত্রচৈতন্যের বিস্ময়কর রূপায়ন!

কয়েকদিন পর গুরুজী তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা চরণদাস, অযোধ্যায় তোমার বেশীদিন থাক্‌বার আর প্রয়োজন নেই। যা পাবার তা তুমি পেয়েছো। এ পরম বস্তু হৃদয়ে ধারণ ক'রে দেশে দেশে নগরে নগরে নামকীর্তন ক'রে বেড়াও। এতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

গুরুদেবের আদেশ শুনিয়া তিনি মুষ্‌ড়িয়া পড়িলেন। নামপ্রচারে

তাঁহাক বাহির হইতে হইবে। কিন্তু এই সরযূতট, এই আশ্রমকুটির, গুরুদেবের এই মধুর সান্নিধ্য ছাড়িয়া যাইতে আজ যে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে চায়।

কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমার একান্ত অভিলাস আপনার সেবায়ই এই জীবন কাটিয়ে দেবো, আপনার কৃপাধন সঞ্চয় ক'রে আমার এই কাঙালের ঝুলি দিনের পর দিন ভরে তুলবো।"

গুরুদেব উত্তর দিলেন, "বৎস আমার সেবাই যদি তোমার কাম্য হয়, তবে আমার যাতে সুখ হবে তাই তো তোমার করা কর্ত্তব্য। জীবের দ্বারে দ্বারে তুমি নাম প্রচার করে বেড়াও, নিতাইচাঁদের আদেশ পালন কর। এতেই আমার পরম সুখ, প্রকৃত সেবা!"

বিদায়ের ক্ষণে কহিলেন, "বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি, বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ তোমার অধিগত হবে। স্বয়ং মহাপ্রভু অন্তরে উদিত হয়ে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ তোমার নিকট প্রকাশ ক'রবেন। আমার নির্দ্দেশ, সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে উচ্চ স্বরে তুমি নাম কীর্ত্তন ক'রে বেড়াবে—এই হচ্ছে তোমার জীবনের ব্রত। নিতাইচাঁদ হবেন তোমার এই পবিত্র কর্ম্মের সহায়ক।"

রাইচরণের দুই চোখ ছাপাইয়া নামিয়াছে অশ্রুর বন্যা। কাতর স্বরে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আর কবে আপনার সাক্ষাৎ পাবো?"

"না বাবা, শিগ্‌গীর তোমার সাথে তো আমার দেখা হবে না। প্রভুর ইচ্ছে হলে—পরে হবে।"

গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া নবদীক্ষিত শিষ্য বাহির হইয়া পড়েন নাম প্রচারের ব্রত উদ্‌যাপনে।

উত্তর ভারতের বহু তীর্থ দর্শন করিবার পর তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিয়াছেন। গৌর-লীলার পবিত্রস্থানগুলি দেখিয়া তাঁহার আশ মিটে না। হৃদয়ে প্রেমের ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হয়, আর নয়নে কেবলি আনন্দাশ্রুর ধারা বহিতে থাকে।

শ্রীবাস অঙ্গনের নিকটে জগদানন্দদাস বাবাজীর আশ্রমে একটি সাময়িক আশ্রয় জুটিল। দিবারাত্র এখানে চলে তাঁহার নামকীর্ত্তন আর শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ। প্রতিদিন পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর সলিলে তিনবার স্নান করিয়া আসেন, বেলা শেষে স্বহস্তে প্রসাদ রাঁধিয়া ইষ্টদেবকে ভোগ দেন। তারপর মুখে উঠে একমুষ্টি প্রসাদান্ন।

নবাগত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রেম বিহ্বলতা ও আর্ত্তির তুলনা নাই। বহু নবদ্বীপবাসীর দৃষ্টি এ সময়ে তাঁহার উপর পড়িতে থাকে।

নিকটেই নৃসিংহ দেবের আখড়া। কয়েকদিন হয় নবদ্বীপদাস নামক এক ভক্ত যুবক তাঁহার স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবসহ এই আখড়ায় আসিয়া উঠিয়াছেন, কিছুদিন শ্রীধামে বাস করিয়া দেশে ফিরিবেন।

নবদ্বীপবাবু শুনিলেন, পাড়াতেই এক প্রেমিক বৈষ্ণব বাস করেন, প্রেমানন্দে তিনি সদাই মাতোয়ারা। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে বসিলেই আত্মহারা হইয়া যান, কাঁদিতে কাঁদিতে হতজ্ঞান হন।

নবদ্বীপদাস ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। দর্শন-মাত্র হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল অপূর্ব্ব আনন্দের ঢেউ। কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ বৈষ্ণব সাধক যেন জন্মজন্মান্তরের এক পরমাত্মীয়।

দুই প্রেমিক পুরুষের সেদিনকার মিলন দৃশ্যটি বড় অপূর্ব্ব। উভয়ে বারবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতেছেন, আর 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্যে গৃহ অঙ্গন কাঁপাইয়া তুলিতেছেন।

বড় অদ্ভুত আকর্ষণ এই বৈষ্ণব সাধকের। তাঁহার স্পর্শ ও সান্নিধ্য পাইয়া নবদ্বীপ হইলেন এক নূতন মানুষ, অন্তরে জাগিয়া উঠিল মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সংসার বন্ধনের মূলটিকে সেদিন একেবারে শিথিল করিয়া দিল।

সঙ্গে স্ত্রীও তীর্থ করিতে আসিয়াছেন, নবদ্বীপবাবু তাঁহাকে সেদিন নিকটে ডাকিলেন। শান্ত অবিচল কণ্ঠে বলিলেন, "ওগো, ছাখো, তুমি আমায় যেন ভুল বুঝো না। আমার জীবনে এসে গেছে এক নতুন জোয়ার, তার সামনে সব কিছু আজ ভেসে যাচ্ছে। সংসারের মায়ায়

আর আমি আবদ্ধ হ'তে চাইনে। এখন থেকে এই বৈষ্ণব সাধকের আশ্রয়েই আমি বাস করবো। আজ থেকে ইনিই হলেন আমার জীবনের কাণ্ডারী, আমার অধ্যাত্ম-জীবনের পথপ্রদর্শক।"

এই নবদ্বীপদাসই চরণদাস বাবাজীর কীর্ত্তন-প্রচার যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সহকারী—তাঁহার প্রথম ভক্ত ও শিষ্য। ক্রমে আরও কয়েকটি ভক্ত ও অনুরাগী আসিয়া জুটিলেন।

ভক্তদের সঙ্গে সাধক চরণদাসের সদা সখ্যভাব। গুরুবুদ্ধি নিয়া তাঁহার সহিত মেশা কাহারো পক্ষে তখন সম্ভব ছিলনা, সকলেরই তিনি পরমাত্মীয়—'দাদা'। এই সহজ সম্বন্ধের জোরেই অনুগামীদের সঙ্গে এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে চরণদাসজী বাঁধা ছিলেন।

কীর্ত্তন-প্রচারের ক্ষুদ্র দলটি ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপের তখনকার প্রাণহীন, আড়ষ্ট জীবনে এই ভক্ত বৈষ্ণবের দল নূতনতর এক প্রেরণা সেদিন জাগাইয়া তোলে।

গৌরলীলার পুণ্যক্ষেত্রে উৎসারিত হয় অপূর্ব্ব ভাব-বন্যা, পুরাতন রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয় নামগানের নূতন চারণদলের উদ্দীপনা।

কীর্ত্তনগোষ্ঠীর নেতা চরণদাস হইতেছেন প্রেমের এক উৎস। গুরু শঙ্করারণ্য পুরী এ পরম ভাগবতের জীবনে নাম-প্রেমের শক্তিকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আর ভাববিহ্বল হইয়া ভক্তগণসহ দিনের পর দিন এ নাম তিনি বিলাইয়া দিতেছেন।

প্রতিভাদীপ্ত পুরুষের কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত কীর্ত্তনপদ, আঁখরের পর আঁখর। গৌরাঙ্গলীলার মধুর দৃশ্যপট একের পর এক ফুটিয়া উঠিতে থাকে। বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্ব ও মাধুর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকেন, তাঁহার কীর্ত্তনে সারা নবদ্বীপে আনন্দস্রোত বহিয়া চলে।

সঙ্গীগণসহ চরণদাসজী সে-বার শ্রীপাট কাল্‌নায় আসিয়াছেন। গৌর-নিতাইর মনোহর বিগ্রহ দর্শনে মহাভক্তের ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অপরূপ পদকীর্ত্তন ও নৃত্য তিনি শুরু করিয়া দিলেন।

এ সময়ে সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। একটি পাঁচ বৎসরের শিশু হঠাৎ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে অঙ্গনে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় এই শিশু যাহা বলিতে থাকে তাহাতে সকলের বিস্ময় চরমে উঠে। সে তখন শিবনেত্র ভাবাবিষ্ট। চরণদাসজী ও তাঁহার ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দেশ দান করে, "ওগো, তোমরা আর একটুও এখানে দেরী করোনা, এখনি. নীলাচলের পথে যাত্রা কর।"

অবোধ শিশুর একি অলৌকিক পদ্দীপনা, একি অদ্ভুত আচরণ! চরণদাস তাঁহার কথার ইঙ্গিতটি ধরিয়া নিতে সেদিন ভুল করেন নাই। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস, নামকীৰ্ত্তন সভায় মহাপ্রভু নিরন্তর উপস্থিত থাকেন। এই ভাবাবিষ্ট শিশুর মধ্যেই যে পাওয়া গেল প্রভুর ইসারা! সেই দিনই তিনি পুরীধামের পথে পা বাড়াইলেন।

শ্রীক্ষেত্রের এই মহাধামেই জীবন-প্রভু তাঁহার আধ্যাত্মজীবনের লীলাক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নীলাচল লক্ষ্য করিয়া চরণদাসজী ছুটিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ ভক্ত। সম্বলের মধ্যে চার জোড়া করতাল, আর একটি করিয়া পরিধানের দোপাট্টা কাপড়, আর চাদর।

পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সাক্ষীগোপাল-এ পৌঁছিলেন। প্রেমানন্দে সকলে বিভোর। চরণদাসজী স্বরচিত মধুময় কীৰ্ত্তনপদের মধ্য দিয়া প্রভুর লীলা বর্ণনা শুরু করিলেন।

উদ্দণ্ড কীৰ্ত্তন চলিতেছে আর বারবার হইতেছে তাঁহার ভাবাবেশ। মন্দির-চত্বর লোকে লোকারণ্য।

এই বৈষ্ণবদের পরিচয় কেহ জানে না, কিন্তু তাঁহাদের কীৰ্ত্তন শ্রবণে সকলেরই হৃদয়ে এক আনন্দের ঢল নামিয়াছে।

কীৰ্ত্তনকারীদের মধ্যমণি হইতেছেন আজানুলম্বিতবাহু, দীর্ঘায়ত সুঠামতনু চরণদাস বাবাজী। সকলেরই দৃষ্টি পতিত হয় এই ভাবাবিষ্ট

মহাবৈষ্ণবের উপর। সাধারণ দর্শনার্থীরা এখানে তাঁহাকে ডাকিতে থাকে বড়-বাবাজী নামে, উত্তরকালে এই নামেই তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। সাক্ষীগোপাল-এর মন্দির চূড়ায় নারিকেলের কুঞ্জে কুঞ্জে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শ্রীবিগ্রহের শয়ন দেওয়া হইয়া গেলে চরণদাসজী মন্দিরচত্বরের কোণে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। শিয়রে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-কলেবর দুই দিব্যপুরুষ দণ্ডায়মান। একজনের অঙ্গকান্তি কাঞ্চন-গৌর, দ্বিতীয়জন একেবারে তুষারশুভ্রবর্ণ।

দ্বিতীয় মহাপুরুষটি চরণদাসজীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি তোমায় আজ এক নিগূঢ় মন্ত্র দান কর্‌ছি। একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে তুমি এটি জপ ক'রবে। এ মন্ত্র বিতরণের অধিকারও তোমার রইলো। শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা বুঝে নিয়ে প্রকৃত অধিকারী ভক্তদের হৃদয়ে এ নামের বীজ তুমি বপন ক'রে যাবে।"

এ কথা কয়টি বলিয়া দিব্যপুরুষ চরণদাসকে দ্বাবিংশ অক্ষরযুক্ত এক গৌরমন্ত্র দান করিলেন।

অতঃপর মূর্ত্তিদ্বয় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

চরণদাসজী ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। এই বিচিত্র স্বপ্ন দেখার পর হইতেই সারা দেহ মনে তাঁহার আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। উৎসাহভরে তখনি সঙ্গীদের জাগাইয়া তুলিলেন। কহিলেন, "ওরে তোরা সব ওঠ্‌। শোন্‌। প্রভু নিতাইচাঁদ আজ এখানে এসে আমায় কৃপা ক'রে গিয়েছেন।"

এই অহৈতুকী কৃপার কাহিনী শুনিয়া ভক্তদের সে রাত্রে উল্লাসের সীমা রহিল না।

চরণদাসজীর মধ্যে দেখা দিল এক দিব্য আবেশ। 'হা নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া কখনো পরম আনন্দে নৃত্য করেন, আবার কখনো বা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে ও বিরহের আর্ত্তিতে তিনি অধীর হইয়া উঠেন।

সঙ্গী ভক্তগণ কোনমতেই তাঁহাকে প্রবোধ দিতে পরিতেছে না। সে রাত্রি এই ভাব মত্ততার মধ্য দিয়া কোনমতে ভোর হইল।

বৈষ্ণবের দল অতঃপর ধীরে ধীরে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই কীর্ত্তনানন্দে তাঁহারা মাতোয়ারা। বড় বাবাজী চরণদাসজীর সুধা কণ্ঠ হইতে স্বতঃস্ফুর্ত্ত পদাবলীর ধারা উৎসারিত হইতেছে, আর অপূর্ব্ব ভাবাবেশে চলিয়াছে সুমধুর কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য।

মন্দিরের জগমোহনে সেদিন এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইল। দলে দলে ভক্ত বৈষ্ণবেরা ভীড় করিতেছে এক অদৃশ্য চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে। সকলেই ভাবিতেছে, কে এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ? গুটিকয়েক সঙ্গী শিষ্যসহ কোন্ প্রেমশক্তির বলে নীলাচলের শ্রীমন্দিরে তিনি আলোড়ন তুলিয়াছেন?

জগন্নাথের শিঙ্গারী পাণ্ডা ভাবাবেগে ছুটিয়া আসিলেন। প্রসাদী মালা ও তুলসী-চন্দন আনিয়া বড় বাবাজী মহারাজের কণ্ঠে ও ললাটে তখনি পরাইয়া দিলেন। এই নবাগত মহাপুরুষকে ঘিরিয়া ভক্তজনদের আনন্দের অবধি রহিল না।

এবার শুরু হয় মহাপ্রভুর লীলাস্থানগুলির পরিক্রমা। এ বৈষ্ণব-দলের প্রাণবন্ত কীর্ত্তন ও ভাবমত্ততার স্পর্শে স্থানমাহাত্ম্য যেন নূতন করিয়া জনচিত্তে জাগিয়া উঠিল।

দীনহীন কাঙালের বেশে চরণদাসজী সঙ্গীগণসহ নীলাচলের সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, আর প্রায়ই যত্রতত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেড়ান।

একদিন রাজপথ দিয়া নাম কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। নারায়ণছত্রে তখন এক মহোৎসব হইতেছে। দুয়ারে শত শত ভক্ত প্রসাদার্থী ও দরিদ্র মানুষের ভীড়। বড়বাবাজী ও তাঁহার সঙ্গীদের পরিধানে ময়লা ছিন্ন বাস, ইঁহাদের দেখিয়া মোহান্ত ভগবানদাস বাবাজী ভাবিলেন,

একদল রাস্তার ভিখারী আসিয়া জুটিয়াছে। ইনি ইঁহাদিগকে রাস্তার ধারেই সারি বাঁধিয়া প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসাইয়া দিলেন।

চরণদাসজী দৈন্য ও আর্ত্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। ভিখারীর পংক্তিতে বসানো হইলেও বিন্দুমাত্র তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভোজনের জন্য একটি শালপাতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আবার ছেঁড়া। রাস্তার ধূলা এই পাতা ফুঁড়িয়া উপরেও উঠিতেছে।

এ দৃশ্য দেখিয়া প্রিয় ভক্ত নবদ্বীপদাস আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বড়বাবাজীর ঐ শালপাতার উপর নিজের চাদরটি বিছাইয়া দিলেন, এভাবে হয়তো আহার করা কিছুটা সম্ভব হইবে। তাছাড়া, মহাপ্রসাদের সম্মানও তো রক্ষা করা চাই!

কাঙালীদের প্রসাদ বিতরণ করিতে আসিয়া মোহান্ত বাবাজীর সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। বৈরাগীর পবিত্র বহির্ব্বাসকে এঁটো করা? বেটাদের তো কোন কাণ্ডজ্ঞানই নাই। তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "পেটের দায়ে কাঙাল সেজে বেটারা সব বৈষ্ণব ধর্ম্মটাকে একেবারে অধঃপাতে দিল।"

চরণদাসজী কিন্তু এ মন্তব্য গায়েই মাখিলেন না। স্মিত হাস্যে উত্তর দিলেন, "বাবা, আমরা তো বৈষ্ণব নই! বৈষ্ণব যে হ'তে পারবো, এমন আশাও পোষণ করিনে। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের মত বৈষ্ণবের দাসানুদাস যেন অন্ততঃ হ'তে পারি। আমার এই বহির্ব্বাসের ওপরই আমার সঙ্গী তিন-মূর্ত্তির জন্য প্রসাদ ঢেলে দিন, আমি এদের হাতে হাতে বেঁটে দেবো।"

অতঃপর চরণদাসবাবাজীর পরিচয় এখানে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহার কাঙাল বেশ ও দৈন্যময় আচরণ দর্শনে মোহান্ত বাবাজীর চৈতন্য উৎপাদিত হয়।

চরণদাসজী সেদিন নরেন্দ্র সরোবর হইতে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। পথে জগন্নাথবল্লভ মঠের মোহান্ত, ভূতনাথ স্বামীজীর

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। মহাসমারোহের সহিত স্বামীজী কোথায় চলিয়াছেন। সঙ্গে আশা-শোটা ও ছত্র-চামর হস্তে একদল অনুচর। বাবাজী তখনি ভক্তগণসহ সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন, সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

মোহান্ত মহারাজ গম্ভীর বদনে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ!"

বৈষ্ণবেরা কিছুটা দূরে চলিয়া গিয়াছেন, তখন ভূতনাথ স্বামীজীর মনে কি এক চিন্তার উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া আবার সাঙ্গোপাঙ্গসহ বাবাজীকে ডাকাইয়া আনিলেন।

এবার চরণদাসজী ও তাঁহার সঙ্গীরা ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে ভুলিলেন না।

সন্ন্যাসীর আচরণ এবার কিন্তু একেবারে অন্যরূপ। প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমো নারায়ণায়।"

চরণদাসজীর আধারে কোন্ দিব্য শক্তির প্রকাশ তিনি দেখিয়াছেন তাহা তিনিই শুধু জানেন।

বিনয়নম্র বচনে স্বামীজী কহিতে লাগিলেন, "দেখুন কি জানি কেন, আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনি এক উঁচু স্তরের মহাত্মা। আপনার এ মূর্ত্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্ত আনন্দে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে, আপনি যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর এক অন্তরঙ্গ সঙ্গী। আমি সন্ন্যাসী আর আপনারা বৈষ্ণব সাধু, তাতে কিছু যায় আসে না আপনারা এসে আমার জগন্নাথবল্লভ মঠের একটা কুঠরী নিয়ে বাস করুন না কেন? তাতে সত্যই আমি বড় আনন্দিত হবো।"

স্বামীজীর এ আমন্ত্রণের পর বাবাজী ও তাঁহার ভক্তেরা জগন্নাথ মঠে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। দিনের পর দিন তাঁহাদের অতিবাহিত হইতে থাকে নাম প্রচার আর কীর্ত্তনানন্দে।

ইহার পর একে একে বহু ভক্ত চরণদাস বাবাজীর আশ্রয়ে আসিয়া জুটিতে থাকে।

ইহাদের মধ্যে ভক্ত শীতলদাসের কাহিনীটি বড় বিচিত্র। এ ব্রাহ্মণ বালকটি অল্প বয়সে এক রামানন্দী মঠের মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়। সেদিন বাবাজী মহারাজ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, ভক্ত ও সঙ্গীরা প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নামের ধ্বনি দিয়া চলিয়াছে। এসময়ে চরণদাস মহারাজের ভাবমধুর মুর্ত্তিটি দর্শন করিয়াই বালকের অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আকুল প্রাণে এই মহাবৈষ্ণের চরণাশ্রয় সে গ্রহণ করে

কিছুকাল পরের কথা। একদল চক্রান্তকারী সাধু শীতলদাসকে মোহান্ত পদ হইতে অপসারিত করে, মঠ হইতেও তাহাকে দূরকরিয়া দেয়! উভয়পক্ষের সমর্থকেরা সাজাইয়া তোলে তুমুল মোকদ্দমা। অবশেষে শীতলদাসেরই পরাজয় হয়।

এ মামলার বিচারক ছিলেন মুন্সেফ কিশোরীবাবু, ইনি বাবাজী মহারাজের অন্যতম ভক্ত। আদালতের রায় বাহির হইবার পর সেদিন তিনি তাঁহার চরণ দর্শনে আসিয়াছেন।

বড় বাবাজী প্রশ্ন করিলেন, "কিশোরী, তোমার মুখখানা আজ এমন ম্লান দেখ্‌ছি কেন?"

কিশোরীবাবু উত্তর কহিলেন, "প্রভু, আজকের রায় দানের পর থেকেই মনটা আমার খারাপ হ'য়ে গেছে। শীতলদাসের মামলার প্রকৃত তথ্য সবই আমি জান্‌তাম। তাই স্বভাবতইঃ বালক তাঁর গদি ফিরে পাবে এই ধারণা আমার অন্তরে ছিল। দুঃখের বিষয়, সাক্ষ্য প্রমাণ তেমন কিছু তার পক্ষ থেকে আদালতে হাজির করা হয় নি। কাজেই বাধ্য হ'য়ে আমায় বিরুদ্ধ রায়ই দিতে হয়েছে। তাই ভাব্‌ছি এর ফলে কোন অন্যায় ক'রেছি কিনা!"

সান্ত্বনা দিয়া বাবাজী যেকথা কয়টি কহিলেন তাহাতে কিশোরীবাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কহিলেন, "ছাখো, জগন্নাথদেবের কৃপায় উচিত বিচারই তো এক্ষেত্রে হয়েছে! কারণ, বালক শীতলদাস যে মামলার অনেক আগে থেকেই ঠাকুরকে জানিয়ে

আস্‌ছিলো, মঠের মোহান্তগিরিতে তার কোন প্রয়োজন নেই—নির্বিঘ্ন, নির্ব্বিষয় হ'য়ে সে আমার অনুগামী হবে। শ্রীজগন্নাথ একান্ত-ভাবে ভক্তবৎসল, তাই তো তিনি ভক্ত শীতলদাসের মনোবাঞ্ছা এভাবে পূরণ করলেন। তুমি তো নিমিত্তমাত্র, কিশোরী।”

অতঃপর নীলাচলধামে চরণদাস মহারাজের ভক্ত সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শুধু ভক্ত জনসাধারণই নয়, নব্য শিক্ষিত সমাজেরও অনেকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, কাঙাল বৈষ্ণবের পদপ্রান্তে তাঁহারা সমবেত হইতে থাকেন।

জগন্নাথ মন্দিরের জগমোহনে গরুড়স্তম্ভের পিছনে শ্রীচৈতন্যের পদ-চিহ্নাঙ্কিত এক শিলাখণ্ড দেখা যায়। শত শত বৎসর যাবৎ এটি পড়িয়া আছে। শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেরই নয়, সারা ভারতের বৈষ্ণব ভক্তদের ইহা শ্রদ্ধার বস্তু—এক মূল্যবান ঐতিহাসিক স্মারক-শিলা।

মন্দিরে আসিলেই চরণদাসজী এটিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করেন। বিশেষ কোন পুণ্যতিথি বা পালা পার্ব্বণ উপস্থিত হইলেই জনতার প্রচণ্ড ভীড় হয়, ঐ পদচিহ্নের পবিত্রতা রক্ষা করা তখন কঠিন হইয়া পড়ে। অনেকে উহার উপর দিয়া যাতায়াত করে, পা দিয়াও মাড়াইয়া ফেলে।

চরণদাসজীর হৃদয়ে ইহা শেলের মত বিঁধিল। এই শিলাটির মর্যাদা রক্ষার জন্য পুরীর রাজাকে তিনি ধরিয়া বসিলেন। প্রার্থিত অনুমতি মিলিল, প্রস্তরটি জগমোহন হইতে তিনি উঠাইয়া আনিলেন। অতঃপর তাঁহারই উদ্যোগে জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর দ্বারে একটি মন্দিরের মধ্যে সাড়ম্বরে উহা স্থাপিত হইল।

সেদিন সিদ্ধবকুল মঠের অধিকারী বাবাজী ও তাঁহার ভক্তদের মহা-প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে চৈতন্যদেবের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলার কথা উঠিল। পুরী-রাজের নিকট হইতে মহাপ্রভু মন্দির মার্জ্জনের এই সেবাধিকারটি চাহিয়া নিয়াছিলেন।

কালক্রমে অনুষ্ঠানটি লুপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধুরা সবাই ধরিয়া বসিলেন, বাবাজীকেই এ লীলা-উৎসবটির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, একাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

চরণদাসজীকে এ ভার নিতে হইল। তিনি করজোড়ে উপস্থিত বৈষ্ণব মোহান্ত ও ভক্তদের কহিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রাণপণে এ সেবা-অনুষ্ঠানটি জাগিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা ক'রবো। তবে এতে চাই বৈষ্ণবজনের আশীর্ব্বাদ ও নিতাই চাঁদের কৃপা।"

অতঃপর এই বৈষ্ণব মহাপুরুষের প্রেরণায় ভক্তদলের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জাগিয়া উঠে। শত শত কলসী, সর্ম্মাজনী ও খোল করতাল সংগৃহীত হয়, শুরু হয় তুমুল নর্ত্তন-কীর্ত্তন। ভাবাবেশ ও দিব্য প্রেরণায় গুণ্ডিচামন্দির চঞ্চল হইয়া উঠে। মহাপ্রভুর দৈন্যমধুর মার্জ্জন-লীলাটির পুনরুজ্জীবন এভাবে সাধিত হয়।

তখনকার পুরীধামের রথযাত্রা উৎসবও জীবন্ত হইয়া উঠে বড় বাবাজী মহারাজের ইন্দ্রজাল স্পর্শে। লক্ষ লক্ষ দর্শকের অন্তরে গৌরলীলার অতীত স্মৃতি নূতন করিয়া জাগ্রত হয়।

শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়াছেন, রথচালক কালবেঠিয়া-দল রজ্জুধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ভুবনমঙ্গল হরিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। এই সঙ্গে বাজিতেছে শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁকরঝাই কাঁসরের বাদ্য। দর্শনার্থীদের অন্তরে উল্লাস ও উদ্দীপনার অন্ত নাই। এই উৎসব ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে চরণদাসজী প্রেমানন্দে উদ্বেল, মৃদঙ্গ মাদল করতালের তালে তালে চলিতেছে তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-নর্ত্তন।

ভাবাবেশে চরণদাস মহারাজের দুই আঁখি ঢুলু ঢুলু। কণ্ঠ হইতে অবলীলায় উৎসারিত হইতেছে গৌরলীলার মধুময় পদ, আর শোনা যাইতেছে আঁখরের পর আঁখর। সঙ্গী ভক্ত কীর্ত্তনীয়ারা তাঁহার এই ললিত পদাবলী তখনি কণ্ঠে টানিয়া নিতেছে। ভাবনিধি গৌরসুন্দরের মহাভাবে আজ বাবাজী একেবারে উন্মত্ত। তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া

ভক্তগণ তাঁহারই গানের ধুয়া গাহিয়া ফিরিতেছেন, "এ তিন ভুবনে প্রাণবঁধু বিনে, আর কেহ নাই !"

প্রেমাবেশ ক্রমে আরো গাঢ় হইয়া উঠে, বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া ভূতলে পতিত হন। মহাসাধকের দেহে উদ্‌গত হইতে থাকে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ। এই দৃশ্য লক্ষ লক্ষ ভক্ত দর্শনার্থীর হৃদয়ে দিব্য প্রেরণার সৃষ্টি করে, উৎসবক্ষেত্রে ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠে।

নীলাচলের মহাধামে এই নবাগত বৈষ্ণব মহাপুরুষ প্রেম ভক্তির এক নূতন জোয়ার আনিয়া দিয়াছেন। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদের সার্থক সাধক চরণদাস বাবাজী, নিতাইচাঁদের প্রেমশক্তিরই এক অংশ নিয়া শ্রীক্ষেত্রের জনজীবনে সেদিন তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন ভাবরসের মন্থনে নর্ত্তন কীর্ত্তনের উন্মাদনায় প্রেমলীলা তিনি বিস্তার করিতে থাকেন।

জগন্নাথধামের সমস্ত উৎসব ও পার্ব্বণে দেখা যাইত চরণদাসজীর আবির্ভাব। তাঁহার প্রেমরসাবিষ্ট কীর্ত্তন ও নামগানের শক্তি জনগণের মধ্যে আনিয়া দিত এক অপরূপ প্রেমোচ্ছাস, সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিত প্রাণচাঞ্চল্য। সিদ্ধপুরুষ শ্রীবাসুদেব রামানুজদাস বড় বাবাজী মহারাজের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই আচার্য্যকে এ সময়ে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, "ইয়ে মহাত্মা সাধারণ মনুষ্য নেহি হ্যায়। ইয়ে নিশ্চিতরূপসে ভগবৎ পার্ষদ হ্যায়। অ্যায়সি প্রেমভাবনা ময়নে কভি নহী দেখী।"

বাবাজী মহারাজ সে-বার নীলাচল হইতে নবদ্বীপ আসিয়াছেন। পুরাতন বন্ধু বান্ধবদের সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। একদিন ভজন কীর্ত্তনের পর তিনি অঙ্গনে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক বৈষ্ণব সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

আগন্তুক চরণদাস বাবাজীর মুখের দিকে উৎসুক নেত্রে বারবার

কি যেন চাহিয়া দেখিতেছেন। পূর্ব্ব পরিচয়ের কি এক সূত্র যেন তিনি আবিষ্কার করিতে চাহেন। বৈষ্ণবটিকে চিনিয়া ফেলিতে বাবাজীর কিন্তু দেরী হয় নাই, পূর্ব্বাশ্রমে ইনি ছিলেন তাঁহারই এক বৈবাহিক। কিন্তু জীবনের যে অঙ্কের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া আসিয়াছেন আর সেইটি তিনি উত্তোলন করিতে চাহেন না! পূর্ব্বাশ্রমের কোন পরিচয় দিতেই আর রাজী নন।

নবাগত বৈষ্ণবটিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, তাঁহার নাম মাধবদাস বাবাজী, শিক্ষাগুরুর নাম শ্রীপাদ গৌরহরি দাস মোহান্ত, অতি উচ্চ-স্তরের এক বৈষ্ণব মহাপুরুষ। নবদ্বীপ ধামেই তিনি অবস্থান করেন। বাবাজী মহারাজ কৌতূহলী হইয়া এই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যকে দর্শন করিতে চলিলেন।

অপরূপ দিব্যলাবণ্যযুক্ত পুরুষ এই গৌরহরি দাস। খর্ব্বাকৃতি, গৌরতনু, বয়স প্রায় পঁচাশী বৎসর। নীরবে বসিয়া একান্তমনে সদাই মালা জপ করিয়া চলিয়াছেন। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বৃদ্ধ বাবাজীর! চরণদাসজী বার বার তাঁহার কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কথা প্রসঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের বৈবাহিক মাধব-দাসজীর পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবার তাঁহারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে চরণদাসজী এই আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করিতে থাকেন।

গৌরহরিদাস বাবাজীর ভজন কুটিরের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ শস্য-ক্ষেত্র। সেদিন ভোরে চরণদাসজী নিত্যকার কীর্ত্তন-টহলে বাহির হইতেছেন, বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ বাবাজী এই ফসলের ক্ষেতে বসিয়া নিবিষ্ট মনে আগাছা উত্তোলন করিতেছেন।

এ দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। শ্লেষের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবাজী মশায়, একাজই যদি ক'রতে হবে, তবে সংসার ছেড়ে আসার আর দরকার কি?"

বৃদ্ধ বাবাজী একমনে তাঁহার হাতের কাজ করিয়াই চলিয়াছেন। এবার হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, সে যে মায়ার দাসত্ব। আর এ হ'লো পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নিজ কাজ।"

চরণদাসজী বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, "সে তো স্তোকবাক্য ছাড়া আর কিছু নয়! লোহার শেকল দিয়েই বাঁধি, আর সোনার শেকলেই জড়াই, বন্ধন যাতনা কিন্তু একই।"

গৌরহরি বাবাজী আর বাদানুবাদ না করিয়া শান্ত চিত্তে নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কিছুদূর গিয়াই চরণদাসজীর মনে এক তীব্র আত্মগ্লানি জাগিয়া উঠিল। একি ঘৃণ্য কাজ তিনি আজ করিয়া বসিলেন? নিজের অহংবুদ্ধি তাঁহার তো একটুও কমে নাই। কেন শুধু শুধু এই শুদ্ধসত্ত্ব বৃদ্ধ বাবাজীকে অপমান করিলেন? এ যে এক গুরুতর বৈষ্ণবাপরাধ! নিতাইচাঁদের দাস বলিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিয়া বেড়ান, কিন্তু এ যে এক ঘোরতর প্রতারণা। অভিমান তো তাঁহার আজিও যায় নাই, আর এই অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই রহিয়াছে প্রবল! সংসার ছাড়িয়া আসিয়া বৈষ্ণব বাবাজীর বেশ ধরিয়াছেন, অথচ আজো তাঁহার আত্মশুদ্ধি হয় নাই। তবে কি শুধু লোক-প্রতারণাই সার হইবে?

অনুতাপে সর্ব্ব অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ চঞ্চল পদে ফিরিয়া আসিলেন!

গৌরহরি দাসজীর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, আমি আপনার অবোধ সন্তান। বৈষ্ণব সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব আজো হৃদয়ে স্ফুরিত হয় নি। আত্মাভিমানবশে আমি নানা শ্লেষবাক্য প্রয়োগ ক'রেছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

বৃদ্ধ বাবাজীব চোখে ফুটিয়া উঠিল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি। বারবার স্নেহকর বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন।

চরণদাসজী ভাবিতে লাগিলেন, যে অপরাধ তিনি করিয়াছেন

তাহার স্খালন যে একান্ত প্রয়োজন। ভ্রান্তিবশে যে সাধু পুরুষকে অপমান করিয়াছেন তাঁহার কাছেই এবার নিবেন ভেক ও তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা, তবে যদি অভিমানের মূল উৎপাটিত হয়।

বৃদ্ধ আচার্য্য সানন্দে রাজী হইলেন।

অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে চরণদাস মহারাজ সবিনয়ে কহিলেন, "বাবা, কিছুদিন আগে আমি স্বপ্নে আমার মন্ত্র পেয়েছি, উপযুক্ত বোধ কর্‌লে আপনি সেই মন্ত্রই আমায় প্রদান করুন।"

সেই মন্ত্রই তাঁহাকে দেওয়া হইল, আর তাঁহার ভেকের নাম হইল রাধারমণ-চরণদাস।

মুণ্ডিত মস্তক, ডোর কৌপীনধারী চরণদাসজী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। নয়নে তাঁহার গলদশ্রুধারা, মুখে বৈষ্ণবের আর্ত্তি ও দৈন্যময় আকুতি, "আপনারা সবাই আমায় ক্ষমা ভিক্ষা দিন। আমি যেন অভিমানশূন্য হয়ে নিতাইচাঁদের দাসানুদাস হ'তে পারি। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে যত কিছু অপরাধ আমি ক'রেছি সকলে আমায় সেজন্য মার্জ্জনা করুন, আমার সর্ব্ব বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিন। আমি ঘোর বৈষ্ণবাপরাধী। আপনাদের কৃপা ভিন্ন যে আমার আর গতি নেই!"

নবদ্বীপের পথে পথে এই আর্ত্তি ও আকুতি যে দেখিয়াছে সে-ই সেদিন অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে নাই।

শঙ্করারণ্য পুরীর রোপিত দীক্ষাবীজে এবার শুরু হয় মহাত্মা গৌরহরিদাসের সলিল সিঞ্চন। ইহারই ফলে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেন প্রেমদাতা পরমাশ্রয়দাতা চরণদাস মহারাজ। তাঁহার করুণার ধারা ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব্ব স্তরে। ধনী নির্ধন, শুদ্ধাত্মা ও পাষণ্ডী সকলেরই জীবনে তাহা বর্ষিত হয়।

বাবাজী মহারাজ সেদিন নবদ্বীপের মহাপ্রভু-মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে

গিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল এক প্রিয়দর্শন তরুণ ভক্তের উপর। বয়স তাহার বিশ বৎসরের বেশী হইবে না। শ্রীঅঙ্গনে দাঁড়াইয়া দৈন্যভরে সে কাঁদিতেছে, গৌরবিগ্রহের কাছে জানাইতেছে তাহার প্রাণের আৰ্ত্তি। বড় মর্ম্মস্পর্শী এ দৃশ্য!

চরণদাসজীর দিব্যকান্তি দীর্ঘায়ত মূর্ত্তিখানি ততক্ষণে এই তরুণ ভক্তের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্নেহমধুর কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেই সে চকিত ফিরিয়া দাঁড়ায়, চরণদাস মহারাজের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে।

যুবক কাতর কণ্ঠে বলিয়া বসে, "প্রভু, আপনি আমায় কৃপা করুন। দীক্ষা ও চরণাশ্রয় আমায় দিন।"

চরণদাসজীর আননে স্মিত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ধীর স্বরে কহিলেন, "বাবা, কৃপা যিনি তোমায় করবেন তাঁর কাছেই তো এসেছো। গৌরসুন্দরের বিগ্রহ ঐ দাঁড়িয়ে, তাঁর কাছে মিনতি জানাও, যা চাও তাই পাবে, গৌর যে আমার কল্পতরু।"

"প্রভু, গৌরসুন্দরের কৃপা তো আমি আগেই পেয়েছি, এবার আপনার কৃপা চাই। তবে শুনুন। কাল রাতে স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে মহাপ্রভু বল্লেন—ওরে, তুই আর আর্ত্ত হয়ে কাঁদিসনে। তোর কোন চিন্তা নেই। ভোরে উঠেই আমার বিগ্রহ দর্শন কর্গে যা। সেখানে মন্দির চত্বরে সাক্ষাৎ পাবি তোর বহু আকাঙ্খিত গুরুর।"

"বড় ভাগ্যবান তুমি বাবা! মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ পেয়েছো। তা, গুরু তোমার মিলবে, একটু ধৈর্য্য ধরো।"

"প্রভু, ধৈর্য্য যে আর ধরতে পাচ্ছিনে। গুরু আমার মিলে গিয়েছে মহাপ্রভুর কৃপায়। স্বপ্নে যে সব চিহ্নের কথা জান্‌তে পেরেছি, সব মিলে যাচ্ছে আপনার দেহে। আপনিই আমার গুরু এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমায় আপনি দীক্ষা প্রদান করুন।"

"বাবা, তুমি শান্ত হও। আচ্ছা, এবার আমায় বলতো, তোমার নাম কি চৈতন্যদাস? কাছাড় জেলায় তোমার বাড়ী? তোমার ওপর

যে মহাপ্রভুর অসামান্য কৃপা ! ক্রন্দন থামাও। তোমার মনস্কামনা অচিরে পূর্ণ হবে।”

বড় বাবাজীর নিকট দীক্ষা ও সাধন নিয়া চৈতন্যদাস উত্তরকালে গোপীভজনের এক সার্থক সাধকরূপে পরিণত হন।

মন্দিরের দর্শন ও ভজনকীর্ত্তন সারিয়া চরণদাসজী সেদিন সাঙ্গোপাঙ্গসহ গৃহে ফিরিতেছেন। কীর্ত্তনাঙ্গন হইতে তাঁহার সঙ্গে জুটিল এক কুকুরী। ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে তাহার পরম আনন্দ, চরণদাসজী তাই নাম রাখিলেন ‘ভক্তি-মা’। তাঁহার আশ্রম কুটিরে এই কুকুরী শ্রদ্ধেয়া বৈষ্ণবীর মতই সেবা ও মর্য্যাদা পাইতে থাকে।

কিছুদিন রোগভোগের পর এই কুকুরীর দেহত্যাগ ঘটে। গঙ্গাগর্ভে তাহার দেহ সমাধি দিবার পর বড় বাবাজী মহাশয়ের অন্তরে এক অদ্ভুত অভিলাষের উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন, ‘ভক্তি-মায়ের’ ধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে এক মহোৎসব করিবেন।

সারা নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বাবাজীর প্রবল ইচ্ছা জাগিল—ভক্তি-মায়ের স্বজাতি, নবদ্বীপের কুকুর সমাজকেও নিমন্ত্রণ করা হোক্।

চরণদাস মহারাজের সঙ্গী ও ভক্তগণ তো তাঁহার এ প্রস্তাব শুনিয়া অবাক ! এমনিতেই তো কুকুরীর শ্রাদ্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তদুপরি কুকুরদের ভোজন ? লোক শুনিলে পাগলের কাণ্ড ছাড়া আর কি বলিবে ?

একনিষ্ঠ ভক্ত নবদ্বীপদাসের উপর এই নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছে। আশ্রম হইতে বাহির হওয়ার আগে নবদ্বীপদাস বড় বাবাজীর চরণে প্রণাম করিতেছেন। বাবাজী এসময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তের পিঠে হঠাৎ এক চপেটাঘাত করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। নবদ্বীপদাস প্রবল ভাবাবেগে মত্ত হইয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ভাবমত্ত অবস্থায়ই নবদ্বীপের পথে পথে তিনি সেদিন শুরু করিলেন তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম।

সমস্ত মঠ ও আখড়ার সাধু, মোহান্ত ও ভক্ত বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ জানানো হইল।

ভাবোন্মত্ত নবদ্বীপ দাস আরও এক অদ্ভুত কাণ্ড এ সময়ে করেন। পথে যেখানে কুকুরের সাক্ষাৎ পান, করজোড়ে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া নিবেদন করেন, "আমাদের ভক্তি-মা দেহ রেখেছেন। আগামী কাল তাঁর মহোৎসব। আপনারা সবান্ধবে বড়াল ঘাটের নিকটে আমাদের গুরুদেবের আশ্রমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ক'রবেন।"

মহোৎসবের দিন কিন্তু বড় গোল বাধিল। বৈষ্ণব আখ্ড়ার সাধুরা সবাই বাঁকিয়া বসিলেন, এ মহোৎসবে কুকুরের ভোজন হইলে তাঁহারা পঙ্গতে বসিবেন না।

ইহার উপর দেখা দিল আর এক বিপদ। ভক্তের দল মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন, বাবাজীর এ আবার কি নূতন খেলা? কুকুরেরা মানুষের নিমন্ত্রণ-সঙ্কেত কি করিয়া বুঝিবে? দুই দশটা কুকুর আহারের লোভে যেমন নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আসে, তেমন হয়তো বা আসিতে পারে। কিন্তু সারা নবদ্বীপের কুকুরসমাজ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মধ্যাহ্ন ভোজনে উপস্থিত হইবে—সে কেমন কথা?

রাধেশ্যাম বাবাজী নবদ্বীপের এক প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। চরণদাসজীকে তিনি বড় স্নেহ করেন। অভ্যাগত বৈষ্ণবদের ভোজনে আপত্তির কথা, কুকুরের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়াছেন।

চরণদাসজীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "এ তোর কি পাগ্লা কাণ্ড, বাবা? শেষ কালে কি নিজেকে হাস্যস্পদ করবি? তোর নিন্দা শুন্লে যে আমাদের প্রাণে লাগ্বে। কোথায় এবার তোর নিমন্ত্রিত কুকুরের দল, বল্তো?"

আত্মপ্রত্যয়ভরা কণ্ঠে চরণদাসজী কহিলেন, "বাবা, আপনারা তো বলে থাকেন, প্রভু সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান! কুকুরদের ঘটে কি তাহ'লে নেই? প্রহ্লাদের জন্য স্ফটিক স্তম্ভ থেকে তো নৃসিংহ মূর্ত্তিও বার হ'য়েছিলেন! তবে সচেতন প্রাণীদেহে কি প্রভুর লীলা প্রকট হ'তে পারে না? নিতাইচাঁদ সর্ব্বত্র বিরাজমান—একথা যদি সত্য হয়, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, আজ এই কুকুরসমাজ দিয়ে আমার রঙ্গিয়া নিতাই নবদ্বীপের এই অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখাবেন।"

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, দলে দলে কুকুর মহোৎসবের চত্বরে সমাগত হইতেছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কুকুর দলের চিরাচরিত অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই, কারুর মুখে একটি শব্দও শুনা যাইতেছে না। সুসভ্য নিমন্ত্রিতদের মত তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া আসিয়া মহোৎসব প্রাঙ্গণে দাঁড়াইতেছে। আর চরণদাস মহারাজ জয় নিতাই-চাঁদের জয়' বলিয়া করজোড়ে তাহাদের জানাইতেছেন অভ্যর্থনা!

প্রেমাবেশে তাঁহার দুই নয়ন ঢুলুঢুলু—আরক্তিম। দেহ টলমল করিতেছে। অভ্যাগত কুকুরদের ভোজন এবং আপ্যায়নের নানা নির্দ্দেশ দিতেও তিনি মহাব্যস্ত। পঙ্‌ক্তি ভোজন শেষ হইলে কুকুরের দল একে একে নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করিল।

সহস্র সহস্র লোকের জনতা বড় বাবাজীর এই অলৌকিক বিভূতিলীলা দর্শনে সেদিন বিস্ময়াভিভূত। মহোৎসবের প্রাঙ্গনে তখন ঘন ঘন উঠিতেছে গগনভেদী হরিনাম।

বৈষ্ণব আখড়ার যে সব বাবাজীরা ইতিপূর্ব্বে ভোজনে আপত্তি জানাইয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে আর সাড়া শব্দ নাই। বারবার তাঁহারা মার্জনা ভিক্ষা চাহিলেন, কুকুরের পঙ্গত শেষ হইবার পর শ্রদ্ধাভরে সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে তখন চরণদাসজীর জয় জয়কার!

এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে রাধেশ্যাম বাবা বড়বাবাজী মহারাজকে আলিঙ্গন দিলেন। কহিলেন, "বাবা চরণদাস

তোর যে নিতাইচাঁদের ওপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এমন সমর্থ সাধক তুই হয়েছিস, এ আমি ধারণা ক'রতে পারিনি। ধন্য বাবা, ধন্য তোর ভক্তি বিশ্বাসের শক্তি। আশীর্ব্বাদ করি তোর সাধনা আরো সার্থক হয়ে উঠুক।"

চরণদাস বাবাজী সেদিন তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া কৃষ্ণনগরের পথে পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। মুখে কীর্ত্তনের ধুয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" চরণোপরি চরণ রাখিয়া, বঙ্কিম ঠামে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। আননখানি দিব্য আনন্দের আভায় ঝলমল। প্রেমাবেশে নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত।

পথের পরিচয় কখনো কাহারো কাছে জিজ্ঞাসা করা নাই, অথচ অভ্যস্ত ব্যক্তির মতই আগাইয়া চলিয়াছেন। গন্তব্যস্থলগুলিতে পৌঁছিতে একটুও তাঁহার ভুল হইতেছে না।

ভক্তেরা কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করে, "বাবাজী মহারাজ, এ সব পথঘাট কি আপনার পরিচিত?"

স্মিত হাস্যে উত্তর দেন, "ওরে, আমি না চিন্‌লে কি হয়, আমার নিতাইচাঁদ যে সব চেনেন। নাম আর নামী অভিন্ন। নামরূপে নিতাইচাঁদ চলেছেন এই কীর্ত্তনের সাথে সাথে। তার অজ্ঞাত, অগন্তব্য কিছু কি আছে রে? একমাত্র নামাশ্রয় ক'রে চলে যা, যে খানেই তোরা যেতে চাস তিনি ঠিকিই পৌঁছে দেবেন।"

কৃষ্ণনগরে এই সময়ে বড় বাবাজীর কীর্ত্তনবাসরে নানা অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ ঘটিতে থাকে। একদিন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া তিনি কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। ভাবাবেশে সকলেই মাতোয়ারা। অঙ্গনের এক প্রান্তে এক নৈষ্ঠিক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি ইহার শিষ্য। কীর্ত্তনের ভাব তরঙ্গ আজ তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় আলোড়ন উঠিয়াছে। অকস্মাৎ উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

কীর্ত্তন অঙ্গনের পবিত্র রজে তিনি উন্মত্তের মত গড়াগড়ি দিতেছেন, আর তাঁহার গৈরিক বসন রুদ্রাক্ষমালা ও সিন্দূর তিলক সমস্ত কিছু হইতেছে বিপর্য্যস্ত।

শান্ত হইবার পর তান্ত্রিক ব্রাহ্মণটি যাহা বলিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কহিলেন, বাবা, তোমরা শোন, আমি ঘোর অপরাধী। নিতাই-গৌরভজা দলের উপর আমার ছিল জাতক্রোধ। কিন্তু আজ এই কীর্ত্তনে যে অলৌকিক দৃশ্য দেখ্‌লাম তা আমি কখনো ভুলতে পারবো না! নৃত্যপরায়ণ জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী যুগল দেব মূর্ত্তি আমি এই অঙ্গনে দর্শন ক'রেছি। আমি দুর্ভাগা, তাই দেখা দিয়েই চকিতে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। তোমরা সবাই আমায় দয়া কর।"

তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া চরণদাস মহারাজ বলিলেন, "বাবা, নাম ও নামী যে অভিন্ন। নামরূপে তিনি সদা সাক্ষাৎভাবে বর্ত্তমান। এই নাম-কীর্ত্তনক্ষেত্রে আপনি নিতাই গৌরের দিব্য দর্শন লাভ ক'রেছেন আপনার ওপর মা মহামায়ার যে অশেষ কৃপা।"

আর একদিন চরণদাসজী সাঙ্গোপাঙ্গসহ নগরকীর্ত্তনে চলিয়াছেন। সহরের একপ্রান্তে ভুবনমোহন মিত্রের বাড়ী। মিত্র মহাশয় ধীর, গম্ভীর ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। মনে মনে ভাবিতেছেন, 'শুনেছি এই বাবাজী শক্তিধর অন্তর্য্যামী পুরুষ। ইনি যদি আমার এই কুটিরে অনাহুত ভাবে আসেন, ঐ তুলসীমঞ্চের সম্মুখে নাম কীর্ত্তন করেন, তবে বুঝ্‌বো ইনি সত্যই এক সমর্থ সাধক!'

আশ্চর্যের কথা, ক্ষণকাল মধ্যেই কীর্ত্তনের শোভাযাত্রার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। মিত্রমহাশয়ের অপরিসর অঙ্গনে ঢুকিয়া চরণদাস বাবাজী উদ্দণ্ড কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন!

চারিদিক সেদিন লোকে লোকারণ্য। কীর্ত্তন সম্প্রদায় ও দর্শক সকলেরই মধ্যে জাগিয়াছে এক অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ। অতঃপর এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। এক ব্যক্তি ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কীর্ত্তন-

মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠে ঘন ঘন শোনা যাইতেছে উচ্চরবের মা-মা ডাক। এই মাতৃনাম আর নর্ত্তনে-কুর্দ্দনে সে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল।

অকস্মাৎ লোকটি সজোরে ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়ে, গড়াইতে গড়াইতে বাবাজীর চরণসান্নিধ্যে উপস্থিত হয়। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় এবার বাবাজীর দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি সে চুষিতে থাকে।

বাবাজী মহারাজ তখন স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান। কোন্ অপ্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার সমগ্র চৈতন্য উধাও হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ-নিমীলিত, রক্তবর্ণ।

অঙ্গনে দণ্ডায়মান ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সবিস্ময়ে দেখিতেছে এক অদ্ভুত অলৌকিক দৃশ্য। ভূমিতে শায়িত ঐ লোকটির মুখের দুই কশ বাহিয়া দুগ্ধের মত শুভ্র রসধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

আত্মসম্বিৎ লাভ করিয়া বারবার সে পুলকাঞ্চিত দেহে বলিতে থাকে, "মায়ের ক্ষুদ্র শিশুটি হ'য়ে আবার আমি মাতৃস্তন্য আস্বাদন ক'রবো, এ অভিলাষ আজ তীব্র হ'য়ে জেগেছিল আমার মনে। মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তিবলে আমার সে বাসনা পূর্ণ হলো।"

নবদ্বীপের আর এক দিনকার এক লীলার কথা। স্থানীয় সরকারী অফিসার যোগেশ সান্যাল মহাশয়ের ভবনে রোজ কীর্ত্তন চলিয়াছে। সেদিন ভাবোন্মত্ত বাবাজীর দেহে ঘন ঘন ফুটিয়া উঠিতেছে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। এই সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের কথা তাঁহারা শুধু লোকমুখে শুনিয়াছেন, ভক্তিগ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন। আজ উহা সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

চারিদিকে কীর্ত্তনের রসস্রোত উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, আর প্রেম-বিহ্বল চরণদাসবাবাজীর মধ্যে দেখাযাইতেছে নানা বিচিত্রভাবোদয়। কখনো পরম পুলকিত দেহে, অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে কি এক দিব্য দর্শনের

কথা ইঙ্গিত করিতেছেন। কখনো বা অশ্রুজল ও ঘর্ম্মের ধারায় সর্ব্ব-দেহ সিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

বহুক্ষণ পরে বাহ্যদশা ফিরিয়া আসে। অঙ্গনের কোণে রহিয়াছে এক শান্‌বাঁধানো স্থান, সেখানে স্থাণুবৎ তিনি দাঁড়াইয়া পড়েন।

এক ভক্ত এসময়ে কাছে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করেন। উঠিয়াই দেখেন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! বাবাজীর একজোড়া পদচিহ্ন স্পষ্ট-রূপে ঐ বাঁধানো স্থানটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষের ঘর্ম্মজলে উহা সিক্ত।

ভক্তেরা তো হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর বারবার উত্তরীয় দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া এ পদচিহ্ন উঠানোর জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। দাগ তো উঠিলই না, বরং দুরপনেয় হইয়া দাঁড়ায়। শক্তিমান মহাপুরুষের এই অলৌকিক পদচিহ্নটি দর্শনের সৌভাগ্য সেদিন বহু লোকই লাভ করিয়াছিল।

চরণদাস মহারাজের শিষ্য, খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীরামদাস বাবাজী তাঁহার সম্পাদিত চরিত গ্রন্থে এই অলৌকিক ঘটনাটির বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন, "বহুকালের কথা নয়, তেইশ চব্বিশ বৎসর মাত্র হইয়াছে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষকারী অনেক লোক এখনও রহিয়াছেন। বার বৎসরকাল এই চিহ্নটি স্পষ্টই ছিল। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, বা আমাদের ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হউক, অথবা অনাচার বশতঃই হউক, মহাপুরুষের অপ্রকটের দুই তিন বৎসর পরে চিহ্নটি ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। বাড়ীটি কৃষ্ণনগর ছুতার পাড়ার মধ্যে। বাড়ীখানির মালিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।"

এই অলৌকিক ঘটনার তাৎপর্য্য জানিতে চাহিয়া বাবাজী মহাশয়কে ভক্তবৃন্দ চাপিয়া ধরেন। চতুর হাসি হাসিয়া মহাপুরুষ এ প্রশ্ন সেদিন এড়াইয়া যান। শুধু বলেন, "দেখ ভাই, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো কেন? নিতাইচাঁদ কি খেলা দেখাচ্ছেন, তিনিই জানেন। এ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করা তো উচিত নয়।"

কৃষ্ণনগর হইতে চরণদাসজী সে-বার দিগনগর গ্রামে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে শুনিলেন, নিকটেই এক অতি পুরাতন বিরাট বটবৃক্ষ রহিয়াছে। অনেকেই উহার নীচে ভক্তিভরে পূজা দিয়া থাকে! কিন্তু সম্প্রতি গ্রামবাসীদের মনস্তাপের কারণ ঘটিয়াছে। গ্রামের উপকণ্ঠে বহু মুসলমানের বাস, সেখানকার কয়েকটি দুর্ব্বৃত্ত কিছুদিন আগে এই প্রাচীন বৃক্ষের কতকগুলি শাখা ছেদন করিয়া ফেলে।

প্রতিবাদ করিতে গেলে তাহারা উত্তর দেয়, "গাছপাথর সব কিছু-কেই ঠাকুর দেবতার আস্তানা বললেই তো চলবে না। সত্যিকারের প্রমাণ কি তা দেখাতে পারো? যদি পারো, মানবো। নইলে গাছের গোড়া শুদ্ধ একদিন কেটে ফেলবো।"

সব শুনিয়া বড়বাবাজী প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা আপনারা মঙ্গলময় প্রভুকে ডাকুন, আর্ত্তি জানান। দুষ্টের দমন আর অন্যায়ের প্রতিবিধান যে শুধু তাঁরই হাতে।"

পরদিন ভোরে সঙ্গীগণসহ চরণদাস মহারাজ তাঁহার নিয়মিত নামকীর্ত্তনে বাহির হন। বহু ভক্ত গ্রামবাসীও ইহাতে যোগ দেয়। পুলকাঞ্চিত দেহে, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে চরণদাসজী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। পথঘাট লোকজন সবই অপরিচিত, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য দিব্য প্রেরণা যেন তাঁহাকে আজ চালিত করিতেছে।

প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে মুসলমান পল্লীর মোড়ল হারু মণ্ডলের বাড়ীর উঠানে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি ও ভাব-তন্ময়তার মধ্য দিয়া এক দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

হঠাৎ হারু মণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইয়া বড়বাবাজী এক হুঙ্কার দিলেন, তাঁহাকে নাম কীর্ত্তনে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত মণ্ডল তখনি শুরু করিল উদ্দণ্ড কীর্ত্তন। প্রেমানন্দে সে আত্মবিস্মৃত। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে, আর সকলে সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছে। সে এক চাঞ্চল্যকর দৃশ্য!

হারু মণ্ডলকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ভাবাবিষ্ট চরণদাসজী তখনি তাহার কর্ণে নাম প্রদান করিলেন।

ইহার পর নৃত্য করিতে করিতে তিনি সেই প্রাচীন বট বৃক্ষটির দিকে আগাইয়া যান। বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতে থাকে তুমুল কীর্ত্তন। চারিদিকের আকাশ বাতাস মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত নামগানে পরিপূরিত হইয়া উঠে।

ভক্তগণ অবিরত গাহিতেছেন—"ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" কীর্ত্তনীয়া ও শ্রোতা সকলেই এসময়ে এক দিব্য রসানুভূতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ জনমণ্ডলীর চোখে পড়ে এক অলৌকিক দৃশ্য! বট বৃক্ষের শাখাগুলি আর যেন জড় বস্তু নয়, নাম কীর্ত্তনের স্পন্দনে হইয়া উঠিয়াছে চৈতন্যময়। ছন্দে ছন্দে এগুলি নৃত্য করিতেছে।

বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীরা যে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নাম-সঙ্গীত করেন, তৎক্ষণাৎ তাহার উপরস্থ শাখা-প্রশাখা-পল্লব তালে তালে আন্দোলিত হয়, নৃত্যপরায়ণ হইয়া উঠে। পত্রগুচ্ছ হইতে ঝরিতে থাকে বিন্দু বিন্দু স্নিগ্ধ জলকণা।

নাম গানের মাধ্যমে আজ একি অপূর্ব্ব আলোকিক শক্তির সঞ্চার। বাবাজী মহারাজের এই অদ্ভুত কীর্ত্তনলীলা ও বিভূতির কথা অবিলম্বে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের এক সর্ব্বজনীন উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়। সেদিনকার এই আনন্দের হাটে জাতিবর্ণের বৈষম্য কোন্ মায়াবীর মায়াদণ্ডস্পর্শে যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অবিশ্বাসী দুষ্ট লোক কিছু সংখ্যায় সর্ব্বস্থানেই থাকে, এখানেও তাহার অভাব হয় নাই। নানা সন্দেহ ও কূটতর্ক তাহারা উঠায়। কেহ বলিতে থাকে, বড় বাবাজী প্রেত বশীকরণের মন্ত্র জানেন, তাই গাছের ডালপালা সেই মন্ত্র শক্তিতেই আন্দোলিত হইয়াছে। কাহারও বা

সন্দেহ, ডালপালা নাচানো আসলে ঐ বৃক্ষে লুক্কায়িত বাবাজীর অনুচর অথবা বানরদলের কাজ।

এসব কথা চরণদাসজীর কাণেও উঠিল! তিনি গর্জিয়া উঠিলেন, "কি! নামশক্তির ওপর সন্দেহ! তবে তো এ মুর্খদের আরো কিছুটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়।"

তাঁহার নিজের উপর বর্ষিত কটুবাক্য ও লাঞ্ছনা অপমান তিনি সহিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র, গুরু ও বৈষ্ণবের উপর অশ্রদ্ধা, নাম ও শ্রীমূর্ত্তির তাচ্ছিল্য তিনি কখনো সহ্য করিতে রাজী নন। তাই নিন্দুক ও অবিশ্বাসীদের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটানো হইল, চরণদাস মহারাজ দিগনগরের প্রাচীন বটগাছের নীচে কীর্ত্তন-যজ্ঞ করিবেন। সহস্র লোকের ভীড় জমিয়া গেল। এবারও সেই একই কাণ্ড! শাখা-প্রশাখা নামের যাদুমন্ত্রে আবার তেমনই নাচিতেছে! পর্য্যবেক্ষণের জন্য বৃক্ষ-শাখায় অনুসন্ধানকারী লোক চড়াইয়া দেওয়া হইল! চতুর্দ্দিকে বিরাট জনতার বেষ্টনী, আর এই বেষ্টনীর ভিতরে প্রত্যূষ হইতে শুরু করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃক্ষমূলে নাম কার্ত্তন চলিয়াছে। আর প্রতিদিনই অগণিত লোকের সমক্ষে, প্রকাণ্ড দিবালোকে বৃক্ষের ডালপালা নৃত্য করিতেছে।

নামশক্তির এই অলৌকিক প্রকাশ সাতদিন ব্যাপিয়া চলে।

ইতিমধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বাবাজী মহারাজের বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছে। একদিন সবাইকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "দ্যাখো, আমি এই বৃক্ষের নামকরণ ক'রে গেলাম, কল্পতরু। এর পবিত্র মূলে তোমরা দুধ-গঙ্গাজল দেবে ও ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানাবে। এতে মঙ্গল ও অভীষ্ট তোমাদের লাভ হবে।"

১৯০৩ সালের পৌষ মাস। বাবাজী মহারাজের প্রিয় শিষ্য নবদ্বীপদাস সে-বার একেবারে মরণাপন্ন। নিউমোনিয়ার আক্রমণের

ফলে সঙ্কট সেদিন চরমে উঠিয়াছে। চরণদাসজী কিন্তু নিতান্ত উদাস-ভাবেই বসিয়া আছেন।

কেহ রোগীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বলেন, "আমি এসবের কি জানি? নিতাইচাঁদের যা ইচ্ছে তাই ঘট্‌বে। বৃথা আন্দোলন ক'রে লাভ কি, বল? একান্ত হয়ে নাম কর। নাম হচ্ছে ভুবন-মঙ্গল।"

নবদ্বীপদাসের নাড়ী ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। গুরুদেবের শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্ত এবার বিদায় নিতে চান। বাবাজী কিন্তু একেবারে নির্ব্বিকার! শুধু মাঝে মাঝে 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন।

শেষ সময়। এবার সেবকেরা হতাশভাবে রোগীকে গৃহের বাহিরে নিয়া আসিল।

অঙ্গনে তখনো ভক্তদের নামকীর্ত্তন চলিতেছে। বাবাজী অকস্মাৎ এসময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া ছুটিয়া গেলেন, মরণোন্মুখ নবদ্বীপদাসকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সমগ্র দেহটি তাঁহার তখন আবেগভরে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

ভক্তেরা সবাই উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিছুক্ষণ মধ্যে দেখা গেল—মহাপুরুষের দেহের স্পর্শ পাইয়া মৃতকল্প নবদ্বীপদাস ধীরে ধীরে নয়ন মেলিতেছেন।

"বোল নিত্যানন্দ, বোল নিত্যানন্দ"—বলিতে বলিতে বাবাজী তখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ নবদ্বীপদাস প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাই ভক্তদের উল্লাসের আর সীমা নাই। সবাই কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপদাসকে আদেশ দিলেন, "যাও, এবার রজে গড়াগড়ি দাও! জেনো, নিতাইচাঁদ এ যাত্রা তোমায় রক্ষা ক'রলেন।"

নবদ্বীপের রোগক্লিষ্ট আননে তখন ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে বড় বাবাজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উত্তর দিলেন, "আমি

জানি দাদা, এসব তোমারই ইচ্ছা। তোমার প্রেমশক্তির সীমা নেই। তুমি রাখতে পারো, আবার মারতেও পারো।"

ঐদিন রাত্রিতে বাবাজী মহারাজের প্রবল জ্বর দেখা দেয়। এই সঙ্গে রহিয়াছে নিউমোনিয়ার তীব্র আক্রমণ। চিকিৎসাকারী প্রবীণ কবিরাজটি ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন, রোগ কমিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

বাবাজী মহারাজের গুরুতর পীড়ার সংবাদ অন্যান্য স্থানের ভক্তদের জানানো হইল। সেদিন কলিকাতার এক বিশিষ্ট শিষ্য তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে ঔষধ এবং সেবার উপকরণ। নানা রকমের ফল আচার মোরব্বা প্রভৃতিও তিনি সযত্নে বাঁধিয়া আনিয়াছেন। গুরুদেবের কখন কোন্ বস্তু দরকার হইবে বলা যায় না।

চরণদাসজীর অসুখ কিন্তু বাড়িয়াই চলিল, শেষটায় একদিন বুকের তীব্র ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রি। আশ্রমের সবাই ঘুমন্ত। বাবাজী মহারাজ হঠাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সেবারত ভক্তটিকে বলিলেন, "ওরে, ঐ যে ওপরে আচারের বড় দুটি হাঁড়ি রয়েছে, নামিয়ে আন্ তো।"

নির্দ্দেশ মত কাজ করা হইল। তিনি গম্ভীরভাবে হাঁড়ির সমস্ত আচার ও মোরব্বা বাহির করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। ভয়ে সেবক ভক্তটির তো চক্ষুস্থির! সঙ্কটাপন্ন নিউমোনিয়া রোগী একি সব কুপথ্য করিয়া চলিয়াছে!

অনুনয় করিয়া সে কহিল, "আজ্ঞে, আপনার শরীরটা মোটেই ভাল নয়, কবিরাজ হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন, এসময়ে এসব পথ্য করা কি সঙ্গত ?"

অবলীলায় তিনি উত্তর দিলেন, "তা আমার শরীর ভাল না থাকলে কি হবে ? নিতাইচাঁদের যে খেতে ইচ্ছে হয়েছে। তাঁর ভোগ না দিয়ে কি উপায় আছে রে ?"

থালার উপর থরে থরে এই কুপথ্যরাশি নামাইয়া এই গভীর রাত্রে সবটা তিনি উদরস্থ করিলেন। সুস্থ অবস্থায়ও কোনদিন এই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে চরণদাসজীকে কেহ দেখে নাই।

এ সংবাদ শুনিয়া শিষ্যদের আতঙ্কের সীমা রহিল না। কিন্তু বাবাজী মহারাজ স্বেচ্ছাময়—স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইবে, এমন সাহস কাহার ?

ভোরে উঠিয়াই তিনি বলিয়া বসিলেন, "আজ আমার শরীর বেশ সুস্থ বোধ হচ্ছে, আমি অবগাহন স্নান ক'রবো।" কবিরাজকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া আনা হইল।

বাবাজীকে পরীক্ষা করার পর বৃদ্ধ কবিরাজ বড় থতমত খাইয়া গেলেন। শিষ্যদের কহিলেন, "তোমরা শুধু শুধু ভেবে মরছো, বাবাজী মহারাজের নাড়ীতে কফের চিহ্নমাত্র নেই, বরং এখন গুরুতর বায়ুবৃদ্ধিই ঘটেছে। তাই বর্ত্তমান অবস্থায় শীতল জলে স্নানেও আমি কোন আপত্তির কারণ দেখ্‌ছিনে। গত মধ্যরাত্রির কুপথ্য কোন্ যাদু মন্ত্রবলে অমোঘ ঔষধে পরিণত হয়েছে, তা বল্‌বার মত বিদ্যে আমার সত্যিই নেই।"

নবদ্বীপের এক আখড়ায় বাবাজী মহারাজ দুই তিনজন সঙ্গীসহ সেদিন বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি ভক্ত বালক আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

বালকটির বয়স চৌদ্দ-পনের, দেহের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি।

ভক্ত নবদ্বীপবাসী তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। বালকের নাম রামদাস, ফরিদপুরের মহাপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুর সে অনুগ্রহভাজন। কীর্ত্তনে তাঁহার অপূর্ব্ব পারদর্শিতা, প্রেমভক্তির রসে সকলেরই হৃদয় সে উদ্বেল করিয়া তোলে।

বড়বাবাজী মহারাজকে রামদাস তাঁহার মনোহর সঙ্গীত শুনাইলেন।

বাবাজীর আনন্দ আর ধরে না। বারবার কহিতে লাগিলেন, "ভাই, আমায় তুমি আজ বড় আনন্দ দিলে! নিতাইচাঁদের চরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি তোমায় প্রেমধনে ধনী করুন।"

মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছিল। ভক্ত বালক তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করে, দীর্ঘদিন তাঁহারই ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে রামদাস বাবাজীরূপে।

বাবাজী মহারাজের প্রেমসাধনার এক বিশিষ্ট অঙ্গ নাম বিতরণ। তাঁহার কীর্ত্তনের প্রভাব, ব্যক্তিত্ব ও প্রেরণার ফলে দেশের দিকে দিকে প্রেমানন্দের ধারা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

এই সমর্থ বৈষ্ণব মহাপুরুষের অধ্যাত্ম-শক্তির ক্রিয়া চুম্বকাকর্ষণের মত। ভক্ত ও অভক্ত সকলকেই এই অমোঘ আকর্ষণে ইহা টানিয়া আনে। আস্তিক ও নাস্তিক, শাক্ত ও বৈষ্ণব তাঁহার করুণা ও প্রেমদৃষ্টির সম্মুখে সমান হইয়া যায়। সকলকেই তিনি নির্ব্বিচারে, পরম স্নেহে কাছে টানিয়া নেন, ঠেলিয়া দেন প্রেমভক্তির সাধন-পথে!

যেখানেই তিনি যান, নাম-গানকে কেন্দ্র করিয়া দিব্য আনন্দের সুধারস উপাচাইয়া পড়ে। তাঁহার প্রেমশক্তির ইন্দ্রজাল বলে কীর্ত্তনসভা পরিণত হয় কীর্ত্তন-শ্রীক্ষেত্রে।

সমসাময়িক খ্যাতনামা সন্ন্যাসী ও ভক্ত-সাধকের দৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজের অধ্যাত্মজীবনের মর্যাদা ছিল অসামান্য। নবদ্বীপের জ্ঞানানন্দ স্বামী অবধূত প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, "নামকীর্ত্তন শুরু হওয়া মাত্র চরণদাসজীর দেহে নিতাই গৌর দুই ভাই খেলা ক'রতে থাকেন, নিজের কোন অস্তিত্বই যেন থাকে না, এ অমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। আর তা নইলে কি যে-সে রকমের কয়েকটি মাত্র ভক্ত সঙ্গী নিয়ে কীর্ত্তনানন্দের এমন তরঙ্গ তুলতে কেউ পারে?"

জগন্নাথদেবের শিঙ্গারীপাণ্ডা, মাধব পশুপালককে গদগদ্‌ কণ্ঠে বলিতে শুনা যাইত, "বড়বাবাজী মহারাজ, আপনি পুরীতে না থাকলে

মনে হয়, জগন্নাথদেব যেন নিরানন্দে থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি প্রভুর এক অতি অন্তরঙ্গ জন।"

কীর্ত্তন-আসরে বসিয়া ভাবতন্ময় বাবাজী মহারাজ এক একটি দিব্য প্রেরণাবশে পদের পর পদ, আঁখরের পর আঁখর দিয়া, গাহিয়া যান। রসানুভূতির তরঙ্গ শ্রোতাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

আবার শ্রোতাদের হৃদয়ে আর্ত্তি ও ভাবপ্রবাহও এই অন্তর্য্যামী মহাপুরুষের অন্তরে জাগাইয়া তুলে অনুরণন, তাহাদের অন্তরের নানা জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বড়বাবাজীর কীর্ত্তনগানের মাধ্যমেই পায়, বিস্ময়ের তাহাদের সীমা থাকে না।

সেদিন পুরীর বিশিষ্ট উকিল হরিবল্লভবাবুর গৃহে চরণদাসজী পদার্পণ করিয়াছেন। বহু ভক্ত ও সজ্জন ব্যক্তিরও সেখানে নিমন্ত্রণ। অভ্যাগতদের মধ্যে রামকৃষ্ণমণ্ডলীর কয়েকজন সাধুও উপস্থিত।

সকলের আগ্রহে বড়বাবাজী তাঁহার নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের ইচ্ছা, তাঁহারা বাবাজী মহারাজকে প্রশ্ন করিবেন—তিনি বেদান্ত মানেন কিনা। অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়ও জিজ্ঞাস্য রহিয়াছে। তাঁহারা স্থির করিলেন, কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলেই একে একে তাঁহাদের বক্তব্য উত্থাপন করিবেন।

নামগান এবং উদ্দণ্ড নৃত্যের পর চরণদাসজী সদলবলে সভায় স্থির হইয়া বসিলেন। এবার পদকীর্ত্তনের পালা। কিন্তু ইহার বদলে বাবাজী আজ একি অদ্ভুত সব পদ গাহিতেছেন?

সাধারণতঃ তিনি কীর্ত্তনের পদসমূহ মুখস্থ করেন না। যে ভাব ও যে রসের যেমন স্ফুর্ত্তি হয়, তাহারই উপযুক্ত পদ কণ্ঠ হইতে অবলীলায় নিঃসৃত হয়। কিন্তু আজিকার আসরে তাঁহার কীর্ত্তনের পদবিন্যাসে দেখা গেল ভিন্নতর রূপ। পদাবলীর মাধ্যমেই গানে গানে তিনি শুরু করিলেন বেদান্ত বিচার।

ত্রিপদী, চৌপদী ও পয়ারছন্দে সাধক কীর্ত্তনীয়া নিজেই জটিল প্রশ্ন সব উত্থাপন করেন, আবার নিজেই তাহার উত্তর দেন পদ রচনার মধ্য দিয়া। এভাবে এক একটি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতেছে।

এ এক অভাবনীয় কাণ্ড! প্রেমিক-কণ্ঠের স্বতোৎসারিত এই দার্শনিক পদাবলী শ্রবণে সন্ন্যাসীদের অন্তরের প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে,সকল সন্দেহ ও বিতর্ক এতক্ষণে প্রেমাশ্রুধারায় ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বড়বাবাজীর এই লোকোত্তর শক্তির পরিচয়ে সমাগত বিদ্বজ্জন ও ভক্তসমাজ সেদিন মুগ্ধ হইয়া যায়।

জয়গোপাল চরণদাস-মহারাজের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত। সেবাব্রতকেই একান্তভাবে তিনি অধ্যাত্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। কীর্ত্তনে তাঁহার তেমন উৎসাহ নাই। বিগ্রহ, বৈষ্ণব ও গুরু-সেবা নিয়াই সদা ব্যস্ত থাকেন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় চরণদাসজী একদিন ইঁহাকে রাধারাণীর সখী বলিয়া জ্ঞান করেন, গোপীবেশে তাঁহাকে সাজানোর ইঙ্গিত দেন। তাই নূতন নামকরণ হয় ললিতা দাসী।

বাবাজী মহারাজ প্রায়ই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া কহিতেন, "শুধু এ বেশ ক'রলেই হবে না, বেশোচিত কাজ করা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার ক'রতে হলে সম্পূর্ণরূপে আত্মসুখ বর্জ্জন ক'র্‌তে হয়, নিষ্কাম গোপীদের ভাব ও স্বভাবের আনুগত্যে হৃদয় গঠন ক'র্‌তে হয়। তবেই না সাধনার ফলে তদবস্থা পেতে পারবে ?"

বাবাজী মহারাজের এই একনিষ্ঠ শিষ্য গোপীভজনের এক সার্থক সাধকরূপে পরিণত হন। নবদ্বীপের সমাজবাড়ীর ললিতাসখীরূপে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন।

লালাবাবুর ছত্রের ম্যানেজার সেদিন চরণদাস বাবাজীকে প্রসাদ

গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ছত্রে পৌঁছিয়াই তিনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ কীর্ত্তন শুরু করিলেন।

বড়বাবাজী মহারাজকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তুমুল নৃত্য-গীত চলিতেছে। ভাবানুরাগে সবাই গরগর মাতোয়ারা। এমন সময় হঠাৎ একটি প্রেমোন্মত্ত ব্রাহ্মণ যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভাগলপুরে তাহার বাড়ী, দেখিতে বড় রুগ্ন। হাতে একখানি বাঁশের লাঠি, বগলে ঘটি ও কম্বল। সকলের সঙ্গে সেও অশান্তভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছে, হাতের দ্রব্যাদি কখন কোথায় ছুটিয়া পড়িয়াছে। যুবক অবশেষে সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পড়িল।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে না। চরণদাসজী তখন বলিয়া উঠিলেন, "শিগ্‌গীর তোমরা ওর কাণে নাম শোনাতে থাকো।"

কিন্তু নাম শোনানো হইবে কাহাকে ? উচ্চকণ্ঠের কোন আওয়াজই যে তাহার কাণে পৌঁছিতেছে না। লোকটি একেবারে বধির !

বাবাজী মহারাজ যুবকটির নিকট উপস্থিত হইলেন। বামহস্ত দিয়া বক্ষ স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ তখনি তাহার কাণে মন্ত্র প্রদান করিলেন।

মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কম্পিত দেহে উঠিয়া দাঁড়ায়, তারপর দুই বাহু প্রসারিয়া "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহারাজের সম্মুখে আসিয়া লোকটি বলিল, "গুরুজী, অউর এক দফে হামকো বোল দিজিয়ে। দো এক বাত ম্যঁায় ভুল গিয়া।" অর্থাৎ, গুরুজী আর একবায় আমায় বলে দিন, দুই এক কথা আমার বিস্মরণ হ'য়েছে।

সকলে বুঝিল, এই নিরেট বধির বড় ভাগ্যবান। চরণদাস বাবাজীর শক্তি সঞ্চারিত মন্ত্র উহার কাণে ঠিকই পৌঁছিয়াছে। গুরুদত্ত মন্ত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য কর্ণরোগও তাহার নিরাময় হইয়া গিয়াছে !

বাবাজী মহারাজ এই নবাগত ভক্তকে ভেক দিয়া নূতন নাম দিলেন কুঞ্জদাস। জগন্নাথ মন্দিরের শ্রীচৈতন্য বিগ্রহের সেবায় তিনি তাহাকে অতঃপর নিয়োজিত করেন। প্রেমভক্তির সাধকরূপে উত্তরকালে চরণদাস বাবাজীর এই ভাগলপুরবাসী ভক্তটি অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বাবাজী মহারাজের কোন নির্দ্দিষ্ট মঠ বা বাসস্থান নাই। স্বেচ্ছামত যত্র তত্র তিনি বিচরণ করেন। অথচ ভক্তেরা তাঁহাকে এক স্থানে ধরিয়া রাখিতে চান। অনেকেরই মনে আকাঙ্খা জাগে, এই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া নিজস্ব এক স্বাধীন মঠ বা আশ্রয় তাঁহারা গড়িয়া তুলিবেন। এ সুযোগ শীঘ্রই আসিয়া যায়।

কয়েকজন বিশিষ্ট গৃহীভক্ত সেদিন বড়বাবাজীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা নিবেদন করিলেন, পুরীধামে ঝাঁঝপিটা নামে একটি পুরাতন মঠ আছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য, সেবাদাস-বাবাজী ঠাকুর মহাশয়েরই আদেশে এই মঠ স্থাপন করেন। বিগ্রহের নাম, শ্রীরাধাকান্ত। মঠটি 'বিরক্ত সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া পরিচিত।

আরো জানা গেল, বর্ত্তমানে মঠের সেবাধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী আর জীবিত নাই। বিগ্রহসহ মঠের অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি সরকারী রক্ষণাধীনে রহিয়াছে।

ভক্তেরা আজ বড় আশা করিয়া চরণদাসজীর কাছে আসিয়াছেন। একবার তিনি এই সেবা স্থাপনে সম্মতি দিন, তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের মত করাইয়া নিতে পারিবেন।

বাবাজী তো এ প্রস্তাব শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। দৈন্যভরে কহিলেন, 'বিরক্ত সিদ্ধমঠে' আমার মত আসক্তিপূর্ণ মানুষকে টেনে নেওয়া কেন, বাবা ? আত্মসুখলিপ্সা আমার এখনো যে যায়নি, সেবার অধিকার আমার কোথায় ? পূর্ণ অনাসক্তি নিয়ে বিগ্রহ সেবা না করলে যে অবনতিই হবে। তাছাড়া, ছাখো, নিতাইচাঁদের কৃপায় আমি এখন

বেশ স্বাধীনই আছি। মঠ, বিগ্রহসেবা এসব হ'লে তো অবাধ বিচরণ আর সম্ভব হবে না।"

উদ্যোক্তারা কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। কয়েকদিন পর ভক্ত কিশোরীমোহন সেন বড়বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, আমার অন্তরে আজ একটা বড় সন্দেহ জেগে উঠেছে। শ্রীবিগ্রহ আর ভগবানে কি কোন পার্থক্য আছে ?"

বাবাজী মহারাজ ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি ? এ দু'য়ে যে কোন ভেদজ্ঞান ক'রতে নেই। তাতে মহা অপরাধ হয় !"

"আচ্ছা বাবা, শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে আপনাদের কি সম্বন্ধ ?"

"আমরা যে রাধারাণীর দাসী, কাজেই শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ আমাদেরও প্রাণবল্লভ।"

বড়বাবাজী মহারাজের এই স্বীকৃতি পাইয়া সুকৌশল প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "প্রভু এটা কি আপনার মৌখিক না আন্তরিক কথা ? আপনি দেখছি স্নানাদি সেরে প্রসাদ পেতে যাচ্ছেন আর আপনার প্রাণবল্লভ, ঝাঁঝপিটা মঠের বিগ্রহ শ্রীরাধাকান্ত উপবাসী রয়েছেন। একমাস অবধি তিনি সরকারী থানার গুদামে রক্ষিত। সেবা পূজা তাঁর কিছুই হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আগামী পরশু এই মঠের স্থাবর সম্পত্তিসহ শ্রীবিগ্রহও নীলাম হ'য়ে যাবেন, কোন্ পাষণ্ডীর হাতে গিয়ে পড়েবেন তাই বা কে জানে ?"

চরণদাস বাবাজীর ধৈর্য্যের বাঁধ এক মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া পড়িল, বালকের মত তিনি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিগ্রহ সেবার ভার গ্রহণ না করিয়া আর উপায় রহিল না। মন্দির সংস্কারের পর ঝাঁঝপিটা মঠে বিগ্রহের নূতন অভিষেক বাবাজী সম্পন্ন করিলেন। রাধারাণী ও রাধাকান্তজীর নয়নাভিরাম মূর্ত্তিও সমারোহের সহিত আবার প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

সেবাধিকার দানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু রাধকান্তজী নিজের সব কিছু

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিজেই করিয়া নিতেছেন—বেশভূষা, ভোগরাগের বন্দোবস্ত নেপথ্যের কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে অনায়াসে সম্পন্ন হইতে থাকে।

সে-বার বড়বাবাজীর ভাবনা হইয়াছে—শ্রীরাধাকান্তের জন্য একটি মনোরম বাঁশী যোগাড় করিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহ এই কাঙাল বৈরাগীর আখড়ায় আসিয়াছেন। দীনদুঃখী বৈষ্ণবেরা একান্ত নিষ্ঠায় তাঁহার সেবার নানা বস্তু সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু পছন্দমত একটি বাঁশী এখনো তৈরী করানো যায় নাই। এটির জন্য রাধাকান্তজী শেষে নিজেই বুঝি ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

সেদিন প্রত্যুষে ঝাঁঝপিটা মঠে মঙ্গল আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। সকলেই বিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এমন সময় এক সাধু দীনভাবে অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও আর্ত্তির চিহ্ন তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নয়নে বহিতেছে অশ্রুধারা।

আরতি শেষ হইয়া গেল। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একটি মনোরম বাঁশী রাখিয়া প্রেম গদগদ কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়, তোমার কৃপা অপার। নিজেই তুমি আমার কাছে বাঁশী ভিক্ষা চেয়েছো। আজ এটি অঙ্গীকার ক'রে আমায় কৃতার্থ কর প্রভু। দাসের প্রতি তোমার এই কৃপা যেন চিরকাল থাকে।"

চরণদাস বাবাজীর পদতলে বসিয়া সাধুটি যে কাহিনী বলিল, তাহা শুনিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইনি রামাইৎপন্থী সাধক, পুরীধামের মাটিমণ্ডপসাহী অঞ্চলে ইঁহার বাস। প্রতিদিন গোপালের সেবা করেন, আর এই গোপালই তাঁহার পরম ইষ্ট। সাধুটি যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রব্য দেখেন, প্রাণপ্রিয় বিগ্রহের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আনেন।

প্রায় বৎসরকাল যাবৎ তিনি গোপালের জন্য এক বাঁশী প্রস্তুত

করাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বড় অভিলাষ, ইষ্টদেব গোপাল নয়ন-মনোহর বেশে একদিন তাঁহাকে দেখা দিন, অপরূপ ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়াইয়া এই বাঁশীটি শ্রীহস্তে ধারণ করুন।

এ যাবৎ এই বিশেষ কৃপারই তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাই এ বাঁশীটি এতদিন কুলুঙিতেই পড়িয়া আছে।

গতকাল রাতে এক কাণ্ড ঘটে। সাধুটি তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন —ঘুমের মধ্যে কে যেন তাঁহাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দেয়। তাকাইয়া দেখেন, নয়নাভিরাম বঙ্কিম ভঙ্গীতে কৃষ্ণজী সম্মুখে দণ্ডায়মান।

প্রভু তাঁহাকে কহিতেছেন, "আরে ঘরমে বাঁসুরী রাখ কর্ কেঁও মনমে দুখিত হো রহে হো? তুম্ বন্‌শী তো মুঝে দে দো।" অর্থাৎ ঘরের ভিতর বাঁশী রেখে, দুঃখ ক'রলে কি লাভ বলতো? আমায় এটি দিচ্ছই বা না কেন?

সাধু প্রতি প্রশ্ন করিলেন, "আপ কওন হ্যাঁয়? কাঁহা রহ্‌তে হেঁ?" —আপনি কে, কোথায় আপনার বাস?

উত্তর হইল, "মেরে নাম রাধাকান্ত, তুম নহী জানতে হো? ম্যঁয় তো ঝাঁঝা পিটা মঠমে রহনেওয়ালে হ্যায়।"

রামাইৎ সাধুটি তাই অতি প্রত্যূষেই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসেন, শ্রীবিগ্রকে বাঁশী দিয়া ধন্য হন।

বড়বাবাজীর প্রেম, ভক্তি ও সেবানিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রসরাজ রাধাকান্তজীর লীলারঙ্গও বেশী করিয়া প্রকট হইতে থাকে।

মহিমচন্দ্র নামে এক গরীব ভক্ত এ আশ্রমে থাকেন। একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়া ঠাকুর আব্দারের সুরে বলেন, "ওগো শুনছো, তুমি শিগগীর আমার মাখন-মিছরী ভোগের ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

এত কিছু ভোগরাগের মধ্যে লীলাময় ঠাকুরের বুঝি মনে পড়িয়াছে বাল্যলীলার কথা। তাই মাখন ভোজনের চিরমধুর স্মৃতিকে ভক্তদের সেবাকর্ম্মের মধ্যে টানিয়া আনিতে চান।

মহিমচন্দ্র সসঙ্কোচে নিবেদন করিলেন, "ঠাকুর, মাখন-মিছরী খাবার ইচ্ছে হয়েছে, সে তো ভাল কথা। কিন্তু আপনি বাবাজী মহারাজকে একথা এতদিন জানাননি কেন?"

উত্তর হইল, "না গো। জানো তো সে আমার জন্য কষ্টভোগ ক'র্‌ছে। আমার নিজেরও তো এগিয়ে এসে কিছু যোগাড় ক'রে নেওয়া উচিত। তুমিই এটা দাওনা।"

পরদিন মহিমচন্দ্র চরণদাসজীর কাছে স্বপ্নের সব কথা সবিস্তারে বলিলেন। মনে বড় দুঃখ হইয়াছে, তিনি আজ কপর্দ্দকহীন, বাছিয়া বাছিয়া রাধাকান্তজী শেষকালে কিনা তাঁহার মত কাঙালের কাছে এই ভোগের বস্তুটি ভিক্ষা চাহিয়া বসিলেন! কি করিয়া কোথা হইতে রোজ এ মাখন-মিছরি যোগাড় হইবে ভাবিয়া পান না।

চরণদাসজী উত্তর দিলেন, "মহিম, ঠাকুর কিন্তু আমার পরম দয়াল, নিজের সেবার দ্রব্য সংগ্রহ করতে নিজেই বেরিয়েছেন। তা ছাখো, ঠাকুরের জন্য রোজই আমি ভিক্ষে ক'রে মাখন-মিছরি ভোগ দেব। কিন্তু যখন তোমার কাছেই এটা মুখ ফুটে নিজে চেয়েছেন, তখন আজ তুমিই প্রথমে ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়।"

এক অখণ্ড পরমবোধের উপর বাঙালীর অধ্যাত্মজীবন প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতির্ম্ময় রসসত্তায় নিরন্তর এই সিদ্ধপুরুষের অবগাহন চলিয়াছে। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মের কোন বৈষম্যের তিনি ধার ধারেন না। এসময়ে তাই মুমুক্ষু ও জিজ্ঞাসুরা দলে দলে তাঁহার কাছে আসিয়া ভীড় করে, আর সিদ্ধপুরুষের সর্ববজনীন প্রেম-সাধনার বাণী তাহাদের সমস্ত কিছু বিতর্ক ও মনান্তরের মীমাংসা করিয়া দেয়।

এক সময়ে তিনি উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে নামকীর্ত্তনের দলসহ ভ্রমণ করিতেছেন। এক জায়গায় দেখা গেল, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে জোর বিবাদ চলিয়াছে। মহাপুরুষ চরণদাসজীর আগমনে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। উভয় দলই তাঁহার নিকট মীমাংসাপ্রার্থী

হইয়া উপস্থিত। শক্তি উপাসনা ও কৃষ্ণভজন এ দুইটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহাই সকলে জানিতে চান।

উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণের পর বাবাজী মহারাজ কহিলেন, —"ছাখো বাবা, হিংসাদ্বেষযুক্ত হৃদয়ে কোন বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের ধারণা কখনো হয় না। প্রকৃতপক্ষে পরম বস্তুতে কি কোন বিরোধ আছে? শক্তি ও শক্তিমানে সত্যই কি কিছু পার্থক্য আছে? অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তিকে ভিন্ন করার উপায় কই? ইষ্ট-ভজনের কথায় বলছি —আমি তো বহু অনুসন্ধান ক'রেও শাক্ত আর বৈষ্ণবের পার্থক্য দেখ্‌তে পেলুম না। ছাখো, বৈষ্ণবদের প্রধান অবলম্বনই যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবী। যোগমায়া দেবীর কৃপা না পেলে তো লীলায় প্রবেশের অধিকার হয় না? কাত্যায়নী ব্রত ক'রেই তো ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ ক'রেছিলেন। রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করেন অম্বিকাদেবীর আরাধনার ফলে। জননী যশোমতী হরগৌরীর উপাসনাদ্বারাই তাঁর গোপালকে পেলেন। বৃন্দাবনলীলা আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে যোগমায়ার আশ্রয় নিতে হয়েছিল—আর দেবী দশভূজাকে মাতৃসম্বোধন ক'রে তিনি কি তাঁর ক্ষীর ননী সর ভোজন করেন নি? জান তো, ত্রেতায় রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্রকে দেবী দুর্গাকেই প্রসন্না ক'রতে হয়েছিল!"

বাবাজী মহারাজ আরও বলিয়া চলিলেন, "আবার ছাখো, পুরাণে রয়েছে, দেবাদিদেব মহাদেব রামনামে উন্মত্ত হয়ে শ্মশানে নৃত্য কচ্ছেন। আর বিমলাদেবী বাস ক'রছেন নীলাচলের মন্দিরে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ গ্রহণেচ্ছু হয়ে। বাবা, আসল জায়গায় ভেদবিভেদ কিছু নেই। যা আছে তা আমাদের ক্ষুদ্র ও সীমিত মনের মধ্যে।

"যাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করেন তাঁরা বৈষ্ণব, আর যাঁরা শক্তির উপাসনা করেন তাঁরা শাক্ত—এর কি কোন গণ্ডি সত্যিই টানা যায়? আচ্ছা, শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবকে তোমরা শাক্ত বল্‌বে না বৈষ্ণব বল্‌বে? তাঁরা তো শক্তি-মন্ত্রের আরাধনা করেন! আবার ছাখো, মাধুর্য্যভাবের

ব্রজ উপাসকগণ রাধারাণীকেই ভজন ক'রে যাচ্ছেন। তাঁরাও তাহ'লে শাক্ত। যদি বল বিষ্ণু শক্তিকে ভজ্‌লেই বলা হবে বৈষ্ণব, আর অপর শক্তির বেলায় হবে শাক্ত, সে কথাও তো খাটে না। চণ্ডীতে কি পরাশক্তি মহামায়াকে নারায়ণী বলা হয়নি ?"

বাবাজী মহারাজ আরও বলিলেন, "শাস্ত্রে ব'লেছে, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হয়েছে শুধু সাধকেরই কল্যাণের জন্য। কাজেই যার যার ভার, অধিকার, রুচি অনুযায়ী ভগবৎপথে অগ্রসর হও। কিন্তু স্মরণ রেখো, প্রকৃত ভেদ-বৈষম্য উপাস্যগত নয়, আমাদের নিজেরই রুচিগত ও আচারগত।"

কয়েকটি খাঁটি বৈষ্ণব এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, প্রকৃত সাধনকামী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি তা আমাদের খুলে বলুন।"

বাবাজী তখন মহাপ্রভুর উক্তি উল্লেখ করিলেন—"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর, সবার নিকট মাগি লবে ইষ্টভক্তি বর।—এই সারা জগৎটাই হচ্ছে প্রকৃতি, আর সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ। জান তো ? উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির ক'রে দেন পিতামাতা। তাই শ্রীগোবিন্দকে পেতে হলে জনকজননী, শঙ্কর শঙ্করীকেও আরাধনা করা আবশ্যক। বৈষ্ণবের সাধনা বড় কঠিন—শুধু শিবদুর্গা কেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, তৃণলতাকে পর্য্যন্ত ভক্তির চোখে দেখতে হবে, পূজা ক'রতে হবে। নইলে প্রকৃত কৃষ্ণভজনের হানি হবে।"

সকলের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়া গেল। ভক্তিভরে তাঁহারা এই মহাপুরুষকে প্রণাম নিবেদন করিয়া একে অন্যকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

চরণদাস মহরাজ সে-বার নীলাচল হইতে কেন্দ্রাপাড়ায় আসিয়াছেন। এখানকার জমিদার শ্যামসুন্দরবাবু তাঁহার এক বিশিষ্ট ভক্ত। বাবাজী এখানে আসিয়াই অষ্টপ্রহর-নামকীর্ত্তন শুরু করিয়া দিলেন।

আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে, কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার কৃপাদত্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অনেকেই কৃতার্থ।

সেদিন স্বগণসহ বাবাজী মহারাজ দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। হঠাৎ কি জানি কেন খুব ব্যগ্র ও চঞ্চল হইয়া তিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। এই কৃষ্ণ হইতেছে জমিদার গৃহের দারোয়ান, কৃষ্ণমান সিংহ।

নীচতলায় বসিয়া সে গল্পগুজব করিতেছে। সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাকে চরণদাসজীর নিকট উপস্থিত করিল।

বাবাজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা কৃষ্ণ, ওটা তোমার মস্ত ভুল। প্রকৃত মন্ত্রদাতা যে নিতাইচাঁদ! তাঁর কাছে তো সকলেই সমান। বরং নিষ্কিঞ্চন ভক্তের ওপরই তাঁর করুণা বেশী।"

অতঃপর সাগ্রহে কৃষ্ণমান সিংহকে নিকটে আহ্বান করিয়া বড়-বাবাজী তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন, কর্ণে দিলেন নামমন্ত্র।

বাবাজী মহারাজের কৃপাস্পর্শের প্রভাব বড় অদ্ভুত! কৃষ্ণমানের দুই নয়নে তখন অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, আর তাহার সমগ্র দেহ হইয়া উঠিয়াছে পুলকাঞ্চিত।

বাবাজীর এই করুণালীলার প্রকৃত রহস্য জানার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব।

এবার স্মিতহাস্যে তিনি প্রকৃত ঘটনাটি বিবৃত করিলেন। কহিলেন, নীচতলায় কৃষ্ণমান তার বন্ধুদের কাছে খেদোক্তি কচ্ছিল, বড়বাবাজী মহারাজ কেবল বড়লোকদের কাণে মন্ত্র দিচ্ছেন। আমার তো, ভাই, কোন সহায় সম্পদ নেই, কাজেই মন্ত্র পাবার সৌভাগ্য হবে কেন?"

কৃষ্ণমানের মনিব তো মহা ক্রুদ্ধ! ধমকাইয়া কহিলেন, "ব্যাটা, সাহস তো তোর কম নয়। ওখানে ব'সে আর কি তোরা বলাবলি কর্‌ছিস, সব এখানে খুলে বল্।"

কৃষ্ণমান অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "মু তলে বসি ঠিক এহি কথা কহুথিলি। অন্তর্য্যামী প্রভু তো সবু জানি পারিলে। মু আউ কন

কহিবা।” অর্থাৎ, নীচে বসে আমি গোপনে এই কথাই বল্‌ছিলাম, অন্তর্য্যামী প্রভু তা সবই জেনে নিয়েছেন, আর আমি কি বল্‌বো ?

বড় বড় কীর্ত্তন আসরে মহাপ্রসাদকে কেন্দ্র করিয়া প্রায়ই প্রকটিত হইত বড়বাবাজীর নানা বিভূতিলীলা।

কয়েক শত ভক্তের উপযোগী প্রসাদান্ন হয়তো সেখানে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সকলে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিত, মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে অবলীলায় সহস্র লোকের ভুরিভোজন সম্পন্ন করাইতেছেন।

এ বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, “বাবা, এতে আমার কিছু কৃতিত্ব নেই, সবই নিতাইচাঁদের মহিমা, তাঁরই খেলা।”

ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে নিজের শক্তি বিভূতি এমনিভাবে তিনি গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদের জন্য চরণদাসজী প্রাণের আকুতি ছিল অপরিসীম। তেমনি তাঁহার নিকট পৌঁছিতে মহাপ্রসাদেরও ব্যগ্রতা বুঝি কম ছিল না।

বাবাজী সে-বার উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে নামসুধা বিতরণ করিয়া ফিরিতেছেন। একদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বার বার সঙ্গীদের বলিতে লাগিলেন, “গ্যাখো, আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। এমন দিন প্রায়ই আসে না।”

সঙ্গীরা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু আপনার এ শুভ-দিনের তাৎপর্য্যটা কি, খুলে বলুন তো। আপনি নিজেই মঙ্গলময়, তাই সব দিনই যে আপনার কাছে শুভ। তবে আজকের বিশেষত্বটা আবার কি ?”

বাবাজী মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কহিলেন’ “আসল কথাটি এখনি ভাঙ্‌ছিনে। তবে তোমরা সবাই জেনে রেখো, আজ প্রভাতে এখানে ঘটবে এক পরম পবিত্র সম্মেলন।”

কিসের সম্মেলন? কেনই বা তা এখানে ঘটিতে যাইতেছে? কিছুই কিন্তু বোঝা গেল না! ভক্তেরা চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—ভাবিলেন, দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

মধ্যাহ্ন কীর্ত্তনের পর বাবাজী সদলবলে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় এক বাহক বড় বড় দুইটি চাঙাড়ি সেখানে বহিয়া নিয়া আসিল। উহাতে জগন্নাথদেব ও আরও কয়েকটি বিগ্রহের মহাপ্রসাদ রহিয়াছে। কিছু পরেই দেখ গেল, নিকটস্থ নানা অঞ্চল হইতে ভারে ভারে বিভিন্ন বিগ্রহের প্রসাদান্নও আসিয়া উপস্থিত।

কেহই এ বিষয়ে কিছু জানে না এবং এগুলির জন্য আগে হইতে কোন ব্যবস্থাও করা হয় নাই। নানা দিগ্‌দেশের মঠ ও মন্দিরের এই পবিত্র ভোগপ্রসাদ যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আজ বাবাজী মহারাজের এই অস্থায়ী ডেরায় আসিয়া জুটিয়াছে।

"নিতাইচাঁদের কি করুণা!" বলিয়া চরণদাসজী আনন্দে অধীর। ভাবাবেশে নানা ভঙ্গীতে এই প্রসাদ-সম্মেলনের সম্মুখে তিনি এসময়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাপুরুষ বড়বাবাজী আসিয়াছেন, তাই না হয় স্থানীয় মঠ মন্দিরগুলি হইতে প্রসাদ পাঠানো হইয়াছে। কিন্তু সুদূর নীলাচল হইতে জগন্নাথের প্রসাদ কি করিয়া আসিল?

কৌতূহলী ভক্তেরা বাহককে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উত্তরে জানা গেল, কাল জগন্নাথদেবের শিঙ্গার ভোগ সম্পন্ন হইবার পর এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ বড়দেউলের এই ভারীর কাছে উপস্থিত হন। তাহাকে চাঙাড়ি দুইটি দিয়া বলেন, "ভাই, এগুলো তাড়াতাড়ি তুমি চরণদাস বাবাজীর কাছে পৌঁছে দাও। তিনি দক্ষিণদিকের গ্রামগুলোতে কীর্ত্তন পরিক্রমা ক'রতে বেরিয়েছেন, একটু খোঁজ ক'রলেই তাঁর সন্ধান পাবে, সেজন্য চিন্তা নেই। আর এই নাও তোমার এ কাজের পারিশ্রমিক।"

এই ভারীকে তিনি দূরপথের মালবহনের জন্য দুই টাকা অগ্রিম দিয়া দিয়াছেন।

ঐশী কৃপার এ কাহিনী শুনিয়া বাবাজী মহারাজের নয়নে তখন অবিরল ধারে পুলকাশ্রু বহিতেছিল।

জীবন-প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সাধক চরণদাসজী তাঁহার সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া আছেন। নিতাইচাঁদ যেমন প্রেমদাতা, তেমনি তিনি আবার মহাশক্তিধর। তাঁহার এই প্রেম ও শক্তির লীলাই বাবাজী মহারাজের জীবনে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে, নানা রঙে রূপে বিকশিত হইতেছে।

করুণা ও অলৌকিক শক্তির ধারা এই মহাবৈষ্ণবের জীবনের মধ্য দিয়া এবার ছড়াইয়া পড়ে বাংলা ও উড়িষ্যার দিকে দিকে। দিনের পর দিন তাঁহার কাছে ভীড় করিতে থাকে শরণাগত মুমুক্ষু, আর রোগ-শোক জর্জ্জরিত আর্ত্ত ভক্ত। মহাপ্রেমিকের পুণ্যস্পর্শে তাহাদের জীবনে জাগিয়া উঠে নূতনতর প্রাণস্পন্দন।

নিতান্ত দুর্ব্বিনীত পাষণ্ডীও কখনো বাবাজীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না, সাগ্রহে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দিতেন। শক্তিমান সাধকের প্রদত্ত নাম আনিয়া দিত নব জীবনের আস্বাদ।

চরণদাজী সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। কিন্তু এই শক্তি সদাই তিনি প্রকাশ করিতেন ইষ্টদেব নিতাইচাঁদেরই নামে।

এই নিরভিমান কাঙাল বৈষ্ণবের কৃপা সে সময়ে বহু মৃতকল্প মানুষকে বাঁচাইয়াছে, বহু অমানুষকে মানুষ করিয়াছে।

পুরীতে ঝাঁঝপিটা মঠে একদিন তুমুল কীর্ত্তন চলিয়াছে। হঠাৎ শোনা গেল মঠবাসী বৃদ্ধ বৈষ্ণব গদাধর দাসের আর্ত্ত চীৎকার। রাত্রিতে কূয়ার ধারে তিনি কাজ করিতে যান, এসময়ে এক বিষধর সাপ তাঁহার পায়ে দংশন করে। দংশিত স্থানের উপর রজ্জু দিয়া তখনি বাঁধা হয়, ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আনা হয় কীর্ত্তনাঙ্গনে।

বড়বাবাজী মহারাজ সেখানে সেদিন এক বিস্ময়কর কাণ্ড করেন। সর্পদষ্ট বৈষ্ণবটির পায়ের বাঁধন তিনি কাটিয়া ফেলেন, তারপর তাঁহাকে কীর্ত্তনক্ষেত্রের মধ্যস্থলে শোয়াইয়া দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বৈষ্ণবটিকে ঘিরিয়া নামকীর্ত্তন চলিতে থাকে।

চারিদিকে লোকের ভীড়। সকলের সম্মুখে গদাধর দাসের দেহটি নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে। সকলেই ভাবিতেছেন, নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া গিয়াছে।

সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে চরণদাস মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাঁহাকে এক অদ্ভুত আচরণ করিতে দেখা গেল, বৃদ্ধ বৈষ্ণব গদাধরের মস্তকে সজোরে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহার অব্যবহিত পরেই সর্পাঘাত-প্রাপ্ত বৈষ্ণবের দেহে ক্রমে চেতনা ফিরিয়া আসিতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসেন।

বাবাজী মহারাজের বিভূতি-লীলার শেষ এখানেই নয়। সমবেত জনতা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখে, কৃপালু মহাপুষের ডাক শুনিয়া বৈষ্ণবটি উঠিয়া বসিয়াছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকলের সঙ্গে সেও সেদিন কীর্ত্তনে যোগ দেয়।

নিতাইচাঁদ ও নিতাইগত-প্রাণ বড়বাবাজীর জয়ধ্বনিতে তখন চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে।

পুরীধামে একবার কলেরার বড় প্রকোপ দেখা দেয়। মহামারীর আশঙ্কায় নগরবাসী ভীত সন্ত্রস্ত। বাবাজী মহারাজ এসময়ে রোজই নামকীর্ত্তনে বাহির হইতেছেন।

সেদিন নগর পরিক্রমা সারিয়া আসিয়া শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের সম্মুখে তিনি কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হন। ভাববিভোর মহাভক্তের দেহে দেখা দেয় অশ্রু-স্বেদ-পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার। অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু প্রেমাবেশ আর কাটিতেছে না।

মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হইয়া 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেছেন।

এমন সময় ললিতা দাসী আসিয়া সংবাদ দিলেন, মঠের তরুণ ভক্ত ফণী কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন। চরণদাস মহারাজ কিন্তু নির্ব্বিকার চিত্তেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "তোমাদের একি কথা? লোকের অসুখ ভালো করা, মোকদ্দমায় জেতা, নিজের সাধুগিরি ফলানো—এ সবার জন্যই বুঝি নামের ব্যবহার ক'রতে হবে?"

ললিতা দাসী কাঁদিয়া কহিলেন, "আপনি নিজে একবার ইচ্ছে ক'রলেই তো সব কিছু হয়। আপনার ইচ্ছে হলে শ্রীভগবান তা পূরণ ক'রতে বাধ্য। আপনি দয়া ক'রে একবার ওখানে চলুন। তা হ'লেই ফণী বেঁচে উঠবে।"

বাবাজী মহারাজ কিন্তু অগ্রসর হইতেছেন না। এদিকে রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত।

শক্তিমান মহাপুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া চোখের সম্মুখে এই তরুণ ভক্তের মৃত্যু হইবে, এ চিন্তা ললিতা দাসীর অসহ্য। ধৈর্য্যের বাঁধ তাঁহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার সাক্ষাতে আজ যদি এর এভাবে মৃত্যু হয়, তবে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, মঠের সকলের কণ্ঠীমালা ছিঁড়ে ফেলে আবার তাদের গৃহস্থ-আশ্রমে ফেরৎ পাঠাবো। নামপ্রেমিক মহাপুরুষের কোন শক্তি নেই, একথা আমি চারদিকে ঘোষণা ক'রে বেড়াবো।"

ফণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে যাইবে, এমন সময় বড়বাবাজী তাঁহার শিয়রে পদ্মাসন করিয়া বসিলেন। নয়ন দুইটি নিমীলিত, দেহ একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ। তারপর হঠাৎ 'জয় নিতাই' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রোগীর শিরে স্পর্শ করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। বাবাজীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল অপূর্ব্ব-আনন্দের-আভা।

সে-বার চরণদাসজী বরানগরে এক বাগানে কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছেন। গণেশ নামে একটি উড়িয়া বালক সেখানকার ভৃত্য। অঙ্গনে বসিয়া কাজ করার সময় এক বিষাক্ত সর্প তাহাকে দংশন করে। অচেতন অবস্থায় বালকটিকে ধরাধরি করিয়া কীর্ত্তন সভায় আনয়ন করা হয়।

অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য, কৃষ্ণানন্দজী সেদিন সেখানে উপস্থিত। বড়বাবাজী তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিলেন, "ছাখো ভায়া, এই ছেলেটিকে সঙ্কীর্ত্তন-দলের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে রাখ।"

কৃষ্ণানন্দ ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "দাদা, এর দেহে যে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। সমস্ত শরীর একেবারে হিম হয়ে গিয়েছে। দাঁড়াবেই বা কি ক'রে?"

"তোমার কাজ তুমি এক মনে ক'রে যাওনা কেন ভাই! সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়ন্তা নিতাইচাঁদ। যা কিছু করবার, দয়াল নিতাই-ই যে ক'রে থাকেন।"

মহাপুরুষের মুখে একথা শোনার পর আর কোন তর্ক চলে না। কৃষ্ণানন্দজী সর্পদষ্ট বালকটিকে নিজের স্কন্ধে ঝুলাইয়া কোন মতে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন।

চারিদিকে তখন উচ্চ রবে নামকীর্ত্তন চলিয়াছে। প্রায় এক ঘণ্টা এইভাবে কাটিয়া গেল। কৃষ্ণানন্দজী আর এই বালককে বহন করিতে পারেন না—অবশেষে তাহাকে কক্ষমধ্যে শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

সংজ্ঞাহীন দেহটি ঘিরিয়া বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার ভক্তদের তুমুল নৃত্য ও কীর্ত্তন চলিতেছে। কিছুকাল পর মহাপুরুষ অকস্মাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া গণেশের মস্তকে তাঁহার চরণ দিয়া সজোরে প্রহার করিতে লাগিলেন। এক একটা পদাঘাত পড়ে, আর বালকের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া সে বাবাজী মহারাজের চরণে লুটাইয়া পড়ে।

আর একবার কলিকাতায় বাস করার কালে চরণদাস মহারাজের লোকাতীত শক্তির এক বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিতে দেখ যায়।

নিমতলার শ্মশানঘাটে, প্রকাশ্য দিবালোকে শক্তিধর মহাপুরুষের এই বিভূতিলীলাটি প্রকটিত হয়। বাবাজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রামদাসজীর লেখায় ইহার এক মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। —একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া চরণদাসজী ফণী ও রাধাবিনোদ এই দুই ভক্তকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তারপর আদেশ দিলেন, "ত্যাখ, তোরা দুজন দৌড়ে এখনি গঙ্গাতীরে নিমতলার দিকে যা। আমরা একটু পরে সেখানে যাচ্ছি।"

শিষ্যদ্বয় তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে বড়বাবাজী সদলবলে গঙ্গাতটে গিয়া উপস্থিত।

ঘাটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে তোরা এখানে আস্‌বার সময় পথে কি দেখ্‌লি ?"

"আজ্ঞে দেখলাম—একদল মাড়োয়ারী একটি স্ত্রীলোকের শব নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছে।"

বাবাজী মহারাজ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "শিগ্‌গীর নিমতলা শ্মশানে ছুটে যা, এখনি ঐ শবদাহ বন্ধ কর্। দেখিস্ আমি না যাওয়া অবধি যেন সৎকার করা না হয়।"

ভক্তেরা তখনি ঘাটের দিকে ধাবিত হইলেন।

স্নানাদি সারিবার পর চরণদাসজী নিমতলা শ্মশানে পৌঁছিলেন। মৃতের আত্মীয়স্বজন তখন তাঁহার জন্যই প্রতীক্ষমান। নূতন আশায় তাহারা বুক বাঁধিয়াছে। ভাবিতেছে, হয়তো এই মৃতা নারী আজ প্রাণ পাইতেও পারে। তাহারা যে ভক্তদের কাছে শুনিয়াছে, এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ মহাশক্তিধর, কৃপার সঞ্চার হইলে অনেক কিছু অলৌকিক কাণ্ড তিনি মুহূর্ত্তে ঘটাইতে পারেন।

চরণদাস মহারাজের নির্দ্দেশে মৃতদেহটি তখনি চিতার উপর হইতে নামাইয়া সম্মুখস্থ একটি কক্ষে নিয়া যাওয়া হইল। শবের

চারিপাশে এবার শুরু হইল উদ্দণ্ড নামকীর্ত্তন। বাবাজী নিজে তখন মৃতা স্ত্রীলোকটির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছেন, আর ভাবাবিষ্ট হইয়া অস্ফুট স্বরে নামগান করিতেছেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে চরণদাসজী মৃতার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ধরিয়া 'জয় নিতাই' রবে সজোরে এক ঝাঁকুনি দিলেন। স্ত্রীলোটিকে অমনি চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখা গেল।

চারিদিক তখন হরিনামের জয়ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তা নারীটি বিস্মিত হইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতেছে। আর তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ তো বিস্ময় ও আনন্দে তখন একেবারে অভিভূত!

চরণদাসজী স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করিলেন, "ইয়ে সব আদমীয়োঁকে আপ্ পহ্চান্তে হেঁ?" অর্থাৎ, আপনি এসব আত্ম-পরিজনদের চিন্‌তে পারছেন কি?

রমণী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

চারিদিকে ততক্ষণে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে। প্রাণপ্রাপ্ত নারী ও তাহার প্রাণদাতা সাধুকে দেখিবার জন্য সেখানে এক জনসংঘটের সৃষ্টি হইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর স্বেচ্ছাময় বড়বাবাজী এই লীলাখেলার উপর অকস্মাৎ এক বিষাদান্ত যবনিকা টানিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটির পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এতক্ষণ তিনি স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, এবার হঠাৎ তাহা ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, স্ত্রীলোকেটি চিরতরে নয়ন মুদিয়াছে। সারা দেহ তাহার একেবারে অসাড়, প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই।

মৃতার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আবার নামিয়া আসিল শোকের কালো ছায়া! বাবাজী মহারাজের কাছে আর্ত্তস্বরে তাহারা বারবার মিনতি জানাইতে লাগিল।

স্থান ত্যাগের জন্য চরণদাসজী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় মৃতার স্বামী চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। কাঁদিয়া কহিতে থাকে, "বাবা যদি আজ একে কৃপা ক'রলেন, তবে আবার তা ফিরিয়ে নিলেন কেন? দোহাই আপনার, একে বাঁচিয়ে দিন।"

চরণদাস কহিলেন, "বাবা মহাপ্রভু যা করেন নি, আমাদের তো সেটা করা উচিত নয়। তিনি ইচ্ছে ক'রলে শ্রীবাস পণ্ডিতের ছেলেকে কি বাঁচাতে পারতেন না? কিন্তু তা করেননি। কারণ বিধির বিধান রদ ক'রলে মর্য্যাদা হানি ঘটে। নিতাইচাঁদেরও তা অভিপ্রেত নয়। তবে নাম-শক্তির বলে যে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারে, নিতাইচাঁদ কৃপা ক'রে গঙ্গাতীরে আজ সকলকে তাই দেখালেন।"

জনতার ভীড় এড়াইয়া ভক্তগণসহ চরণদাসজী আর এক ঘাটে চলিয়া আসিয়াছেন। এখানে গঙ্গাস্নান সারিয়া সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিবেন।

স্নানের সময় প্রিয় শিষ্য রামদাসকে কহিলেন, "রাম, আজ্‌কের এ ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রে তোমার কি মনে হ'ল?"

রামাদাস বাবাজী অপর সকলের মতই বিস্ময় বিহ্বল হইয়া আছেন। উত্তর দিলেন, আমি আর এসব কি বুঝবো? আপনাদের খেলা আপনারাই জানেন।"

প্রশান্ত কণ্ঠে চরণদাসজী তাঁহাকে বলিলেন, "ছাখো, একমাত্র নামের লীলাখেলা ছাড়া এর ভেতর অন্য কোন কিছু নেই। নাম সত্যই অসাধ্য সাধন করতে পারে—কারণ, তা যে সর্ব্বশক্তিমান। আর এ তো তার পক্ষে অতি সামান্য কাজ। মনে রেখো, নামের সঙ্গে সঙ্গে যে নামীও বর্ত্তমান! তাই একমাত্র নামে বিশ্বাস হ'লে সব কিছু হ'তে পারে। আর এই নামের কৃপা না হ'লে প্রকৃত প্রেমলাভ হবেনা, অতীন্দ্রিয় ভাবময় রাজ্যে প্রবেশও সুদূরপরাহত। কৃপার প্রত্যক্ষ ফল বিভূতিলীলা কিছুটা না দেখ্‌লে জীব ধর্ম্মপথে দৃঢ়

বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাই তো মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে প্রভু নিতাইচাঁদের এই সব শক্তি লীলা!"

নাম আর শ্রীবিগ্রহকে বাবাজী মহারাজ নিত্য ও পরমবস্তু বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তমহলেও এ তত্ত্বটি তিনি নিজ আচরণ দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন।

ঝাঁঝপিটা মঠের যত্র আয় তত্র ব্যয়। কোথা হতে কি করিয়া যে বিগ্রহের ভোগ-রাগ ও উৎসবের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইতেছে কেহই জানে না। রোজই শত শত বৈষ্ণব মূর্ত্তি আসিয়া জড়ো হয়, আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদান্ন ভোজনের পর তাহারা বিদায় গ্রহণ করে। সব ব্যবস্থাই যেন কোন্ ঐন্দ্রজাল বলে সাধিত হইতেছে। ইহা যে সব তাঁহারই লীলা!

একবার মঠে টাকাকড়ি ও আহার্য্য কোন কিছুরই যোগাড় নাই। ললিতা দাসী এবং অন্যান্য ভক্তগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। চরণদাস মহারাজকে এ অর্থ সঙ্কটের কথা নিবেদন করা হইল।

তিনি নির্ব্বিকারভাবে কহিলেন, "বাজার ক'রতে হবে, অথচ আজ তোমাদের হাতে কানাকড়িও নেই। বেশ তো! কিন্তু একথা আমায় বলার কি প্রয়োজন বল তো? যাঁর সংসার তাঁকে জানাও। প্রভু নিতাইচাঁদের কাছে নিবেদন ক'রছো না কেন?"

ললিতা দাসী উত্তর দিলেন, "আমরা প্রত্যক্ষ বস্তু ছেড়ে, আপনাকে ছেড়ে অনুমানকে কোথায় খুঁজতে যাবো? বেশ কথা আপনার তাই যদি ইচ্ছে হয়, এবার বলে দিন—কোথায় কেমন ক'রে আমাদের বক্তব্য আমরা জানাবো।"

"কেন, আমি তো একথা বহুবার তোমাদের বলেছি যে শ্রীমূর্ত্তি নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, সেবকও নিত্য। তবে আর ভাবনা কেন? মন্দিরে গিয়ে না হয় ঠাকুরকে আমারই নাম ক'রে বল—তিনি বলতে পাঠিয়েছেন, আপনার সংসারে দুবেলা প্রায় চার পাঁচ শত লোক

উপস্থিত থাকে, অথচ বাজার খরচের জন্য কিছুই নেই। এবার যা ক'রতে হয় আপনি করুন।”

নির্দ্দেশমত ললিতাদাসী তখনি শ্রীবিগ্রহের কাছে গিয়া কথাগুলি নিবেদন করিলেন। তাঁহার মনের শঙ্কা কিছুতেই যায় না, মুখে রহিয়াছে অপ্রসন্নতার ছাপ। ভাবিতেছেন, বাবাজী মহারাজ এমন উদাসীনভাবে চলিতে থাকিলে এই বিরাট মঠের ব্যয়, ভক্ত ও অতিথি অভ্যাগতদের সেবা কি করিয়া চলিবে?

কিছুক্ষণ পরে ললিতাদাসী দেখিলেন, এক অজানা ব্যক্তি নিতান্ত দীনভাবে যুক্ত করে বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিয়া আছেন। সম্মুখে শতাধিক টাকা থাক্ করিয়া সাজানো রহিয়াছে। নবাগত ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, “প্রভু আমার বড় ইচ্ছে, এ টাকাটা মঠে সমাগত বৈষ্ণব ও কাঙালীদের সেবায় খরচ করা হোক্।”

অতঃপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ললিতাদাসী এবারে ধীরপদে বাবাজীর কাছে আসিয়া দাঁড়ান। মন তাঁহার বড় ভারাক্রান্ত। সখেদে কহিলেন, “আজ্ঞে আমি কিন্তু শ্রীবিগ্রহের কাছে ঐ কথাগুলো তেমন ভক্তিভরে নিবেদন করিনি, গতানুগতিক ভাবেই বলেছি। আপনার উদাসীনতা দেখে আমার একটু রাগও হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাতেও তো ঠাকুরের কৃপার লাঘব ঘটেনি!”

বাবাজী মহারাজ স্মিতহাস্যে কহিলেন, “আমার নিতাইচাঁদ যে বাঞ্ছাকল্পতরু। ছাখো তো, অবহেলাভরে বলেও যখন এই কৃপা ও কল্যাণ লাভ করা যায়, তখন বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে বললে কি না হতে পারে? জীবের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি আর অবিশ্বাসই যে তার নিজের যতকিছু দুঃখের কারণ। জেনে রেখো, এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি থেকেই ক্রমে ভগবদ্‌বিমুখতা আসে, মানুষ নেমে যায় অকল্যাণের পথে?”

আশ্রম বিগ্রহের সেবায় শিষ্যদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হইবার

কখনো যো ছিল না। চরণদাস মহারাজের দৃষ্টিতে শ্রীমুর্ত্তি চিন্ময়, নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তাই ইঁহার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদাহানি তাঁহার কাছে এক গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত।

একবার ললিতাদাসীকে উপলক্ষ করিয়া তিনি মঠবাসী ভক্তদের এ তত্ত্বটি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ললিতাদাসী বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত-পা ধুইতেছেন অসাবধানতার ফলে ঠাকুরের প্রসাদান্ন রাখার পাত্রটিতে তাঁহার পায়ের জল গড়াইয়া পড়ে। বাবাজী তখন নিকটেই দণ্ডায়-মান। ললিতাদাসী নিজের এ অসাবধানতার জন্য লজ্জিত হন। কিন্তু পরে এ ঘটনা আর তাঁহার স্মরণ নাই।

সেই রাত্রিতেই দেখা গেল, তাঁহার ডান পায়ে এক তীব্র বেদনার সৃষ্টি হইয়াছে। দিনের পর দিন ইহা বাড়িয়াই চলে, উপশমের কোন চিহ্নই নাই। তিন দিনের দিন এই ব্যথার তীব্রতা চরমে উঠে এবং জীবনের আশা প্রায় ত্যাগ করিতে হয়।

রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু ডাক্তারেরা এখনো রোগ নির্ণয় করিতে পারে নাই, সব ঔষধ ব্যর্থ হইতেছে। মঠবাসীরা সকলেই এ সঙ্কটে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ এসময়ে ললিতাদাসীর মনে সেদিনের পাদ-প্রক্ষালনের দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠে, শুরু হয় তীব্র অনুশোচনার দহন। সত্যিই তো, কি গুরুতর অপরাধ তিনি করিয়াছেন!

বিস্ময়ের বিষয়, এ অনুতাপের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পায়ের বেদনারও উপশম ঘটিতে থাকে। সেদিনই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ললিতাদাসী স্পষ্ট বুঝিলেন, ঔষধ নয়—অপরাধের এই অনুশোচনাই আজ তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে।

সেদিন নিভৃতে বড়বাবাজী মহারাজের নিকট এ কথাই তিনি নিবেদন করিলেন।

উত্তর হইল, "ভাখো, তোমার সেদিনকার সেবাপরাধের কথা

আমি জানি। তোমাকে একথা আগেই জানাতে পারতাম, কিন্তু তাতে তো তোমার এ আত্মানুশোচনা হতো না। এটা যে প্রভুর কৃপা-দণ্ড! আর এ দণ্ডকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া এ অপরাধের আর তো কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই!"

ভক্তদের কাছে বাবাজী সেদিন বৈষ্ণবীয় সেবাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন, "স্মরণ রেখো, ভক্তিরাজ্যে শ্রীবিগ্রহের সেবার উপকরণ পরম পবিত্র। নিত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবার সাহার্য্যকারী বলেই ঐ সব দ্রব্য এতো উচ্চগুণসম্পন্ন। শুধু তাই নয় বাবা, ভগবৎ সেবার আনুকূল্যকারী সব পদার্থই যে চিন্ময়। বৈষ্ণবের পক্ষে এদের অবজ্ঞা করা তো কখনো চলতে পারে না।"

চরণদাস মহারাজ তখন কলিকাতার উপকণ্ঠে বাস করিতেছেন। একদিন ভক্তপরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় সেখানে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রচারক—নাম শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ, বেদান্তরত্ন।

নানা তত্ত্বপ্রসঙ্গের পর বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। চারিদিকে ভাবাবেগের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সমস্ত সত্ত্বাও সেদিন তাহাতে ডুবিয়া গেল।

অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় গলদশ্রুলোচনে বাবাজীর চরণ ধরিয়া তিনি মিনতি করিতে লাগিলেন, "প্রভু আজ আমায় কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন। আমি পাপী, বড় বিদ্যা-অভিমানী।"

কাব্যতীর্থকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার কাণে তখনি মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই মন্ত্রের এক একটি বর্ণ পণ্ডিতের কাণে প্রবেশ করিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রু পুলক-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাববিকার।

কিছুক্ষণের মধ্যে দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন! ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আনা হইল।

পরের দিন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মনে জাগিয়া উঠে এক সংশয়। ভাবিতে থাকেন, বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত গৌরমন্ত্রে যেন ব্যাকারণ-গত অশুদ্ধি রহিয়াছে। এই সন্দেহের কথা দু-একজনের নিকট এসময়ে তিনি প্রকাশও করিলেন।

কয়েক দিন গত হইয়াছে। চরণদাসজীর কীর্ত্তন-আসরে কাব্যতীর্থ সেদিন আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার মুখখানি আরক্তিম, নয়ন দুইটি রসানুভূতিতে ঢুলু-ঢুলু, দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।

বাবাজী মহারাজের চরণ সমীপে আসিয়াই তিনি বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। কহিলেন, "প্রভু, আমি ঘোর পাতকী। বিদ্যা-অভিমানে মত্ত হয়ে আমি গৌরমন্ত্রের শুদ্ধতায় সন্দেহ ক'রেছিলাম। গত রাত্রে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ঘটেছে। স্বপ্নে দেখলাম, আপনি রোষকষায়িত নেত্রে সামনে উপস্থিত হয়ে ভৎসনা ক'রে বলছেন,—'ওরে মূর্খ, সামান্য দু'পাতা পড়ে তুই বিদ্যামদে মত্ত হয়েছিস? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখনিঃসৃত মন্ত্রের উপর তোর সন্দেহ! হতভাগা, তোর অহঙ্কার পরিত্যাগ কর্।'—তারপর আপনি আমার গালে কৃপাদণ্ড প্রয়োগ ক'রেছেন। এই দেখুন তার চিহ্ন।"

এই অলৌকিক দণ্ড-নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখা গেল, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গণ্ডে সত্যই চপেটাঘাতের শাসন-চিহ্ন বর্ত্তমান।

চরণদাসজীর শিষ্যদের গুরুনিষ্ঠা ও আত্ম-নিবেদনের মধ্যে কোন ফাঁক, কোন ত্রুটিই থাকিবার যো ছিল না। অন্তর্য্যামী মহাপুরুষের সতর্ক দৃষ্টি এ ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিত। তারপর তিনি তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতেন কঠোর শাসন ও নিষ্করুণ আঘাতের দ্বারা। তাঁহার জীবনলীলায় হইার নানা নিদর্শন রহিয়াছে।

বাবাজী ছিলেন লোকোত্তর স্বতন্ত্র পুরুষ, তাই সাধারণ ভক্তদের দৃষ্টিতে তাঁহাকে অনেক সময় দুর্ব্বোধ্য ঠেকিত। লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা

তাঁহার আচরণের মর্ম্ম বুঝাও মোটেই সহজ ছিল না। সে-বার শিষ্যগণ এ চেষ্টা করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়েন।

সে বৎসর বড়বাবাজীর এক খেয়াল হয়, তিনি পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবেন। প্রয়োজনীয় উপচারাদি সংগ্রহের পর সব কাজ বিধিমতে সম্পন্ন হইয়া গেল।

রামদাস প্রভৃতি শিষ্যদের কিন্তু একটু ধোঁকা লাগিয়াছে। তাঁহারা বিচার বিতর্ক করিতে থাকেন, কর্ম্মকাণ্ডের দিকে বড়বাবাজী মহারাজের এমন ঝোঁক কেন? তাছাড়া, ভেক নিবার পর বৈষ্ণবদের আর পূর্ব্বাশ্রমের সহিত সম্পর্ক রাখাও তো সঙ্গত নয়!

শিষ্যদের মনের এ সংশয় ও আন্দোলনের কথা অন্তর্য্যামী বাবাজী মহারাজের অজানা থাকে নাই।

পরদিন ঝাঁঝপিঠা মঠের অঙ্গনে বসিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে রামদাস প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্যকে তিনি কাছে ডাকিলেন। তারপর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "কিগো, তোমাদের কি সব নিন্দা সমালোচনা হচ্ছিল? কর্ম্মকাণ্ডের ওপর আমার ঝোঁক, আমার পতন—এই সব কথা বলা হচ্ছিল, না? যখন আমার পতনই হয়েছে, তখন এ পতিত জীবের সঙ্গে তোমাদের মত মহাত্মাদের আর থাকা কেন? গুরু ব'লে গ্রহণ ক'রে আবার এ সন্দেহের উদয় কেন? আর সন্দেহই যদি হয়ে থাকে, আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রলেই হয়। নেপথ্যে এসব সমালোচনা করা কেন? যাও, তোমাদের মত চঞ্চলচিত্ত অনুগামীদের আমি মুখদর্শন ক'রতে চাইনে।"

বহু অনুনয় এবং মার্জ্জনা ভিক্ষার পর অনুতপ্ত শিষ্যগণ সে যাত্রা কোনক্রমে বাঁচিয়া যান।

নবদ্বীপদাস ছিলেন বাবাজী মহারাজের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও অভিন্নহৃদয় ভক্ত। কিন্তু গুরুর সম্বন্ধে প্রচার আতিশয্যের জন্য বাবাজী তাঁহাকেও বর্জ্জন করতে দ্বিধা করেন নাই।

পরম ভক্ত নবদ্বীপদাস চরণদাসজীকে দেখেন—নিতাই-গৌরের এক মিলিত রসময় বিগ্রহরূপে, আর এই তত্ত্বকেই তিনি দিকে দিকে প্রচার করিতে চান।

বাবাজী মহারাজের ইহা মোটেই পছন্দ নয়, ভক্তির এ আতিশয্যকে প্রায়ই তিনি তিরস্কার করেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া এই পরম ভক্তকে একদিন দূরে সরাইয়া দিলেন।

গুরু ও শিষ্যের এই বিচ্ছেদে মঠবাসী ভক্তেরা মহা দুঃখিত। বহু চেষ্টায় সে-বার তাঁহারা উভয়কে একত্রিত করিলেন, যদি কোনমতে আবার মিলন ঘটানো যায়।

নবদ্বীপদাস কিন্তু তাঁহার নিজস্ব বিশ্বাস ও ভাবকল্পনা কিছুতেই ছাড়িতে রাজী নন। কহিলেন, "আমার দাদা ছিলেন রসময় বিগ্রহ, পরম কৃপাময়, কোমলপ্রাণ এক বালকের মত। আর প্রেমানন্দের ধারা সব সময় তাঁর ভেতর থেকে ঝরে পড়তো। আজ তিনি হয়েছেন মহাগম্ভীর, মর্য্যাদাবিধি-নিষ্ঠাপরায়ণ পরম বৈষ্ণব। কাজেই আমার সে দাদা আর নেই, এখন তিনি গৌরহরি দাস মোহান্তের চেলা—আখড়ার এক বাবাজী ?"

চরণদাসজীও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন, "ওকে আমি কি ক'রে গ্রহণ ক'রবো, বলো ? যে নবদ্বীপ আমার সুখে সুখী ছিল, সে আজ আত্মসুখী হয়ে পড়েছে ; অর্থাৎ, এখন সে আমাকে অবতাররূপে দাঁড় করিয়ে তার আত্মাভিলাষ পূরণ ক'রতে চায়। তার নিজ তত্ত্ব, নিজ মতবাদ স্থাপনের জন্য সে অযথা আস্ফালন ক'রে বেড়াচ্ছে। কাজেই আমার সে নবদ্বীপ আর তো নেই !"

যে নবদ্বীপদাস তাঁহার বুকের পাঁজর, কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা ও ইষ্টনিষ্ঠার দিকে চাহিয়া চরণদাস বাবাজী আজ তাঁহাকেও বিসর্জ্জন দিলেন।

বৈষ্ণবীয় ভজন সম্বন্ধে চরণদাসজীর ত্যাগ ও দৈন্যের বিধান বড় কঠোর ছিল।

সে-বার তিনি কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। একদিন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া প্রসিদ্ধ সাধক হরিচরণ দাস বাবাজীর ভজন কুটিরে গিয়া উপস্থিত। বড়বাবাজী মহারাজের আগমনে সেখানকার বৈষ্ণবদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

পূর্ব্বাচার্য্যদের ত্যাগনিষ্ঠা কৃচ্ছ্রব্রত সম্বন্ধে বলিতে বলিতে হরিচরণ বাবাজীকে তিনি বলিলেন, "ভাই তোমার এই শ্রীকুণ্ডে বাস, মাধুকরী বৃত্তি এবং নিষ্কিঞ্চন ভাব দেখে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু ভাই, এক কলসী দুধের ভেতর একবিন্দু গোমূত্র পড়লে যেমন সব নষ্ট হয়ে যায়, তোমার দশাও তেমনি ঘটেছে। এতে আমি মনে বড় ব্যথা পেয়েছি।"

হরিচরণ বাবাজী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "দাদা আমি তো কিছুই জানিনে। আপনি নিজে কৃপা ক'রে আমার যা কিছু দোষ ত্রুটি আছে, দেখিয়ে দিন।"

"ভাই, তুমি সুপণ্ডিত, তোমাকে আর কি ব'লবো? তুমি শ্রীবিনোদের মন্দিরে মাধুকরীর জন্য গিয়েছিলে। আমি দেখে দুঃখিত হ'লাম—তুমি সেখান থেকে এক দোনা অন্ন ও এক দোনা তরকারি নিলে। কিন্তু এক স্থান থেকে এতটা আহার্য্য নেওয়া কি সাধকের পক্ষে উচিত? মাধুকরীবৃত্তির মানে তো তা নয়। মধুকরেরই মত নানা স্থান থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হবে। উদর-ঝোলা আর করপাত্র নিয়ে কোনমতে আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করাই তো নিয়ম! তাছাড়া, যে গৃহে তোমার প্রতিপত্তি আছে, সেখানে মাধুকরী করাও তো ঠিক নয়! তাকে তো বৈষ্ণবের ভিক্ষা বলা যায় না। তাছাড়া, জানতো, প্রভু নিজ মুখে বলে গিয়েছেন—'যেই জন ভজে মোরে অনন্য হইয়া, তারে ভিক্ষা দেই মুক্তি মাথায় বহিয়া।'

বৈষ্ণবের জীবনব্রত যে প্রধানতঃ একনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন কাঙালেরই ব্রত, বড়বাবাজীর মুখনিঃসৃত বাণী সেই কথাটিকেই সেদিন স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়া ধরিল।

সাধনার সর্ব্বাঙ্গীন প্রস্তুতি—দেহ মন ও অধ্যাত্ম-সত্তার বিকাশ সাধনের উপর বাবাজী মহারাজ সদাই অত্যধিক জোর দিতেন। তত্ত্বোপদেশ দানের বেলায় এটিকেই তিনি বড় করিয়া তুলিতেন।

বৃন্দাবনে এক রাত্রিতে তিনি দাউজী মন্দিরের সম্মুখস্থ এক বকুল তলায় শয়ন করিয়া আছেন। ভক্ত শ্যামদাস তাঁহার পদ সম্বাহনে রত। অকস্মাৎ সেবানিরত ভক্তপ্রবর চমকিয়া উঠিলেন।

বাবাজী মহারাজের দিকে তাকাইতেই দেখিলেন,—তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতির ধারা নির্গত হইতেছে, আর উহার তেজে শ্যামাদাসের নয়নদ্বয় ঝলসিয়া যাইতেছে।

বিস্ময়বিহ্বল ভক্তের ক্রোড় হইতে বাবাজীর পা দুখানি পড়িয়া গেল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজীর অলৌকিক বিভূতির দর্শন সেদিন তাঁহার মনে এক বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছে।

শ্যামদাস কাঁদিয়া অস্থির। বার বার চরণদাসজীকে মিনতি করিতে লাগিলেন, নিতাই-গৌর দর্শন তাঁহাকে কৃপা করিয়া করাইতেই হইবে, বাবাজী যে মহাশক্তিধর তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন!

বাবাজী বলিতে লাগিলেন, "ছাখ্, নিতাই-গৌর, রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। তাঁরা তো নিরন্তর তোদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হৃদয় মধ্যে উপযুক্ত আসন তৈরী না হ'লে বসাবি কোথায় বল্‌তো? আগে আধার তৈরী হওয়া প্রয়োজন। চাই নিজের প্রস্তুতি, নইলে আস্বাদন ক'রবে কে? জান্‌বি, আচার্য্যগণ যত কিছু সাধন-ভজনের উল্লেখ ক'রেছেন, তা হচ্ছে শুধু দেহ ও মনকে প্রস্তুত কর্‌বার জন্য। যোগ্য দেহ হ'লে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ দর্শন হবেই হবে।"

কৃপা প্রাপ্তির পূর্ব্বে চাই সাধন-প্রস্তুতি, এ কথাটি সেদিন এই অনুগত শিষ্যের মর্ম্মমূলে প্রবিষ্ট হয়।

বৈষ্ণবীয় ভজন সম্বন্ধে বাবাজী মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার ও সর্ব্বজনীন। ভক্ত সাধনার্থীদের প্রায়ই তিনি বলিতেন, "ছাখো, নবদ্বীপ

লীলাও নিত্য, নীলাচল লীলাও নিত্য। যার যেটি প্রিয় সেইটির উপাসনাই সে করুক। কিন্তু কোন বিশেষ লীলা মানিনে—এ কথায় বৈষম্য দোষ ঘটে। ইষ্টবস্তুর বহু নাম, বহু ধাম। যার যাতে রুচি তাই গ্রহণ করাই কি সঙ্গত নয়? আমি যেটি ভজি, তা আমারই পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই উদার ভাবটি ধরে রাখা দরকার।"

একদল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক আছেন যাঁহারা নগর চূড়ামণি, রসময় গৌরকিশোরের মূর্ত্তি ছাড়া অপর কিছুই মানিবেন না। বড়বাবাজী মহারাজ ইঁহাদিগকে বুঝাইতেন, "নিজে নাগর ভাব অবলম্বন ক'রে নাগরীদের সঙ্গে যাবতীয় রসাস্বাদন করা—শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাভাবিক ভাব। গৌরাঙ্গদেবের পক্ষে একে অনুকরণের প্রয়োজন কোথায়? বরং শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার ক'রে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরম মাধুর্য্য আস্বাদন করাই হোল গৌর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা যদি অনুরূপ ভাবে তাঁকে না ভজি তাহলে আমাদের সেই ভজনে তাঁর কি প্রকৃত আনন্দ হ'তে পারে?"

চরণদাসজীর মতে, শুধু নাগরেন্দ্র গৌরকিশোর নয়—সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে, কৃষ্ণবিরহী শ্রীচৈতন্যকেও মানিতে হইবে। লীলাকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে লীলাময়কে মানা হয় কই? শ্রীচৈতন্য ছিলেন মহাভাবে বিভাবিত। তাই এই মহাভাবের সহায়ক যে সব পরিকর, তাঁহারাই ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গতম। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের মত এমন প্রিয় আর কাহাকে তিনি ভাবিতেন? রাধাভাবে উদ্বেল মহাপ্রভুকে এই দুই পরিকরই তো সদা প্রবোধিত করিতেন।

বাবাজী বলিলেন, "এমন কোন ভাব নেই যা আমার শ্রীগৌরাঙ্গে নেই। তবে এই ভাব-বৈচিত্র্যে মূল কথা—'ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গে ভাবের শাবল্য, সব ভাব হইতে রাধাভাবের প্রাবল্য।' যে সাধক নিজ সিদ্ধ দেহে গোপীভাব আরোপ ক'রে শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলায় প্রবেশ ক'রতে যাচ্ছেন, তিনি যদি রাধাভাব-বিভাবিত গৌরকে মেনে না নেন তবে লীলায় প্রবেশ যে তাঁর পক্ষে কঠিন হবে! মহাপ্রভু

নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার ক'রে জগতের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। তাঁর পূর্ব্বলীলার চেয়ে যে উত্তর-লীলায় মাধুর্যের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বেশী, তা অস্বীকার করার উপায় কই ?

বৈষ্ণবের ধাম সম্বন্ধেও বাবাজীর মতবাদের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার মতে বৃন্দাবনকে শুধু মাধুর্য্যের ধাম বলিয়া চিহ্নিত করা ঠিক নয়। পুতনা বধ হইতে শুরু করিয়া কালীয় দমন ও গোবর্দ্ধন ধারণ অবধি যে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ রহিয়াছে তাহার প্রতি তিনি বৈষ্ণব সাধকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আরাধ্য ধাম সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত বড় সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বলিতেন, "গৌর-উপাসকদের পক্ষে নীলাচলধাম সর্ব্বোপরী। তাছাড়া, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এ ধামকে এবং ধামেশ্বরকে যেরূপভাবে দর্শন, স্পর্শন ও অনুভব ক'রেছেন তাঁর অনুগামীদেরও তাই করা উচিত হবে। মহাপ্রভু এই ধামেই আঠারো বৎসর কাল যাবৎ মহাভাবে বিহ্বল থেকেছেন, স্বরূপ ও রায় রামানন্দসহ ব্রজরস সাস্বাদন ক'রেছেন। আমাদের আস্বাদ্যও সেই রস। তা'হলে সেই ধামে বাস ক'রে, মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার ক'রে তবেই তো পরম বস্তু সহজে লাভ করা যাবে ? মহাপ্রভুর অনুগামী বৈষ্ণবদের পক্ষে তাই তাঁর প্রেমলীলার শ্রীক্ষেত্রই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধাম।"

একবার কলকাতায় থাকাকালে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের নিমন্ত্রণে বাবাজী মহারাজ নাটক দেখিতে যান। চৈতন্যলীলা এ নাটকে রূপায়িত করা হইয়াছে।

চরণদাসজী প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নাটক দেখিতেছেন। কিন্তু মাধাই যখন কলসীর কানা হাতে নিয়া নিতাইকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভাবাবেগে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। দর্শকদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

সেদিন প্রেক্ষাগৃহে দেখা গেল বাবাজীর অলৌকিক শক্তির এক

বিশেষ প্রকাশ সন্বিৎ-হারা হইয়া তিনি ভূতলে গড়াগড়ি দিতেছেন আর যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে, সে-ই আনন্দবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছে। লোকের বিস্ময়ের আর অন্ত নাই।

বাবাজী মহারাজকে কোনমতে সুস্থ করিয়া উঠাইয়া গিরিশ ঘোষ করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু আমার মনে কিছু অভিমান ছিল, এই সমস্ত লীলার ব্যাখ্যা ও বিন্যাস আমি ভালো ক'রেই আমার নাটকে দেখিয়েছি। আপনার কৃপা-সঙ্গ পেয়ে আজ দেখ্‌ছি, আমি এর কিছুই বুঝতে পারিনি।"

চরণদাসজীর কলিকাতা প্রবাসকালে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। এ সময়ে প্রায়ই সঙ্গে আসিত তাঁহার এক বালক পৌত্র।

বড়বাবাজী সহাস্যে একদিন রসিকতা করিয়া বলেন, "শিশিরবাবু যখনই আসেন, নাতিটি তাঁর সঙ্গে থাকে গাঁটছড়া-বাঁধা।"

ঘোষ মহাশয় উত্তরে বলেন, "বাবাজী মহারাজ, আসল কথা কি জানেন, আপনার কাছে এলে সত্য সত্যই গৃহের আকর্ষণবোধ আর থাকে না, মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পাছে ঘরের কথা একেবারে ভুলে যাই সেজন্যই এটিকে রোজ সাথে ক'রে আনি, যেন এর টানে বাড়ীর কথা মনে পড়ে।"

এমনই ছিল বাবাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব!

নীলাচল-ধাম ছিল চরণদাস মহারাজের পরম প্রিয় স্থান। ধামেশ্বর জগন্নাথদেবের সহিত তাঁহার নিবিড়তম সম্পর্ক। নীলাচলের নানা উৎসব, বিশেষতঃ রথযাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া এই মধুর সম্পর্কটি এক অলৌকিক ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিত।

দারুব্রহ্মরথে আরোহণ করিলেই বাবাজী আনন্দে মত্ত হইয়া যান,

সাঙ্গোপাঙ্গসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলেন। এ কয়দিন তাঁহার রাজপথেই অতিবাহিত হয়!

চারিদিক সাজসজ্জা, পত্র-পুষ্পের অপূর্ব্ব সমারোহ! উৎসবমত্ত জনতার মধ্য দিয়া রথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আর চরণদাস বাবাজী প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে স্বরচিত কীর্ত্তন ধরিয়েছেন—

আসিছে কালিয়া হেলিয়া দুলিয়া
রসময় গুণধাম।
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর
নবীন নাটুয়া ঠাম।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে কিনিকিনি
পীতবাস পরিধান।
গলে বনমালা করিয়াছে আলা
রসিক নাগর কাহ্নু।

এই কীর্ত্তন নর্ত্তনের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সকলেই লক্ষ্য করে, বাবাজী যেই চঞ্চল চরণে কীর্ত্তনদলসহ চলেন, জগন্নাথের রথও দ্রুত অগ্রসর হয়। আবার তিনি যখন সদলবলে বিশ্রাম করেন অথবা ভাবাবেগে সম্বিৎ হারাইয়া রাজপথে পতিত হন, রথের গতি তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়।

নীলাচলের ভক্ত সমাজ এই নিগূঢ় ব্যাপারটির কথা জানিতেন। তখনকার দিনে পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ ব্ল্যাকউড। বাবাজীর এ অলৌকিক শক্তির কথা তাঁহারও অজানা ছিল না। তাই রথ টানার পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "বাবাজী, আপনি আপনার কীর্ত্তন নিয়ে রথের আগে আগে নেচে চল্‌বেন। আমি লক্ষ্য ক'রেছি, আপনার কীর্ত্তন দলের গতির সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথের রথের গতি বেড়ে যায় আর কমে আসে।"

বাবাজী হাসিয়া উত্তর দিতেন "সাহেব, এটা আমার কীর্ত্তনের প্রভাব নয়, এ হচ্ছে আমার প্রভু নিতাইচাঁদের এক রঙ্গ!"

চরণদাসজী যখন ঝাঁঝপিটা মঠের সেবার ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার এই ধারণাই ছিল যে, মঠটির বিষয় সম্পত্তি আর কিছু নাই। তাঁহার মত কাঙাল বৈষ্ণব তো ইহাই চান। কিন্তু পরে ক্রমে প্রকাশ পায়, মঠের সম্পত্তি ও দেনা দুই-ই রহিয়াছে।

একদিন সকাতরে শ্রীবিগ্রহকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি সত্য সত্যই এক খাঁটি গোয়ালার ছেলে, আর আমার মতই নিষ্কিঞ্চন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তা মোটেই নয়, তুমি বেশ একটি ছোটখাটো জমিদার। তা ভাল কথা, তোমার জমিদারী তুমি বসে বসে ভোগ কর। আমি চিরদিনের কাঙাল বৈষ্ণব। আমার দ্বারা জমিদারী করা পোষাবে না। আশ্রমের ঋণ পরিশোধ অবধিই আমার দায়িত্ব, তারপরই কিন্তু আমি মুক্ত!"

দুই তিনটি বিশিষ্ট গৃহী ভক্ত এ সময়ে সানন্দে মঠের বৈষয়িক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর চরণদাসজীকে দ্বিগ্বিদিকে বিচরণ করিতে দেখা যায় মুক্ত বিহঙ্গের মত।

ইহার পর ধীরে ধীরে বাবাজীর জীবননাট্যের উপর আসে নূতনতর এক পট পরিবর্ত্তন। রাগানুগা সাধনার মধ্য দিয়া যে রসবস্তু এতকাল সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, এইবার তাহা উপচিয়া পড়িতেছে। দিব্যোন্মাদ ও মহাভাবের মধ্য দিয়া লোক-লোচনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এক অপূর্ব্ব রূপান্তর!

প্রেমাসিদ্ধ মহাবৈষ্ণবের সর্ব্ব সত্তা সদাই এক অপার্থিব আনন্দ-ধারায় তরঙ্গিত হইতেছে, প্রেমানন্দের উত্তাল সাগরে একবার ডুবিতেছে আবার ভাসিতেছে। এ সময়ে কখনো একেবারে উলঙ্গ থাকেন, কখনো বা থাকেন ডোর কৌপীনধারী।

সে-বার বরানগরে বাস করার কালে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একদিন তিনি সর্ব্বদেহে বিষ্ঠা মাখিয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন। ভক্ত গোবিন্দ এই দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠেন, হাঁকডাক শুরু করিয়া দেন।

বাবাজী হাসিয়া বলেন, "হ্যাঁরে গোবিন্দ, বিষ্ঠা কোথায় ?"

সকলে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই চন্দনের মনোরম সুবাস তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইতে থাকে।

বাবাজী মহারাজের তখন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার এক অদ্ভুত খেয়াল হইয়াছে, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সোনার ঘড়ি, চেন, আংটি প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু নিকটস্থ পুকুরে ফেলিয়া দিতেছেন।

সেদিন শিষ্য কাব্যতীর্থ মহাশয় সখেদে ভাবিতেছেন, বাবাজীর এ উন্মত্ততা কবে কমিবে কে জানে ? এতো সব মূল্যবান জিনিসপত্র তিনি অযথা নষ্ট করিতেছেন। তাছাড়া, লোকেই বা কি ভাবিতেছে ?

বাহ্যিকভাবে উন্মত্ত অবস্থায় থাকিলেও মহাপুরুষ কিন্তু কাব্যতীর্থের মনোগত ভাবটি বুঝিলেন। কহিলেন, "কিহে কাব্যতীর্থ, এতগুলো দামী জিনিষের অপচয় হচ্ছে। তাই মনে বড় দুঃখ, না ? আচ্ছা !"

এ কথার পরই ছুটিয়া গিয়া তিনি বাগানের পুকুরে দিলেন ঝাঁপ। উঠিয়া আসার পর দেখা গেল, এযাবৎ যা কিছু জলগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সবই তিনি একসঙ্গে তুলিয়া আনিয়াছেন।

বাবাজী ইতিপূর্ব্বে এগুলি স্বেচ্ছামত জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানেও ফেলেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একটি স্থান হইতেই সব কিছু সেদিন উত্তোলিত হইল।

এই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় চরণদাসজীর মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক করুণাঘন রূপ। শুধু মুমুক্ষু ভক্তই নয়, এ সময়ে বহু পাষণ্ডীরও উদ্ধার-সাধন তিনি করেন। তাঁহার স্পর্শ-শক্তিতে ইহাদের দেহে স্ফুরিত হইতে থাকে নানা সাত্ত্বিক ভাব বিকারের লক্ষণ। অলৌকিকভাবে কত দুরারোগ্য ব্যাধিও তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন !

সেদিন বিশিষ্ট ভক্ত বড় বড় অক্ষরে ছাপানো কৃষ্ণনামাঙ্কিত

কতকগুলি কাগজ নিয়া আসিয়াছেন। বাবাজীর কি খেয়াল হইল, আদেশ দিয়া তখনি সেগুলি নিকটস্থ পুকুরে ডুবাইয়া দিলেন।

পরিব্রাজক গোবিন্দানন্দ সেখানে দণ্ডায়মান। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার খেদের সীমা রহিল না। বাবাজী মহারাজকে কহিলেন, "বাবা আপনি হচ্ছেন নাম মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, আর আপনিই কিনা এই নামকে আজ জলে ডুবিয়ে দিলেন!"

মৃদু হাসিয়া মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁরে, নাম যদি চিন্ময় হয় তবে তার বিনাশ হবে কি ক'রে? নাম কি কখনো ডুব্‌তে পারে?"

পর দিবস ভোরবেলায় বাবাজী মহারাজ ভক্ত ও সঙ্গীগণসহ বসিয়া আছেন। গোবিন্দানন্দজীর সাথে আগের দিন যে কথা হইয়াছে তাহা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন, "ওরে গোবিন্দ, একবার ঘাটে গিয়ে দেখে আয় তো, নাম নিত্য, সত্য ও অখণ্ড কিনা!"

সকলে তাড়াতাড়ি পুকুরের ধারে ছুটিয়া গেলেন। একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! নামাঙ্কিত যে কাগজগুলি আগের দিন নিমজ্জিত হইয়াছিল একযোগে ঘাটের কাছে তাহা ভাসিয়া উঠিয়াছে।

নামের ধারক ও বাহকরূপে চরণদাসজীর আবির্ভাব! আর এই নামেরই প্রচার করিতে করিতে ঘটে তাঁহার তিরোধান।

সাধনপন্থারূপে নাম কীর্ত্তনের যে পরম শিক্ষা, যে প্রেরণা এই মহাবৈষ্ণব দান করেন বাংলার জনজীবনে তাহা কম সঞ্জীবিত করে নাই। অগণিত ভক্ত সাধক আজিও তাঁহার নির্দ্দেশিত পন্থা আশ্রয় করিয়া আছে।

পরম লগ্নটি এবার আসিয়া গিয়াছে, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার আর বেশী দেরী নাই। এ সময়ে চরণদাসজী একদিন ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভক্তদের তাঁহার নিকটে ডাকিলেন।

করুণাময় মহাসাধকের আননে এসময়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে এক স্বর্গীয় জ্যোতির আভা। ভাবাবিষ্ট হইয়া শেষের দিনটিতে তিনি রাখিয়া গেলেন এক জনকল্যাণের বাণী। কহিলেন, "স্মরণ রেখো প্রেমভক্তি,

রসলীলা ও রাসবিলাসাদি প্রেম সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। অধিকারী ভেদে এ সব তত্ত্ব উপদিষ্ট না হ'লে অনর্থই ঘটে থাকে। এর নিগূঢ় তত্ত্ব কেবল সমর্থ গুরুমুখেই শ্রবণ ক'রতে হয়। সর্ব্বকালের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য রয়েছে কেবল—নাম, নাম আর নাম!"

চৈতন্যদাসবাবাজী

শিশু জগবন্ধু তাহার পিতৃব্য গৌরনাথের নয়নমণি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈদ্যনাথ ও তাঁহার স্ত্রী অকালে দেহত্যাগ করিলে গৌরনাথ পরম স্নেহে এ ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরেন। নিজে তিনি নিঃসন্তান। এই শিশুটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সংসার জীবনের যত কিছু সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা আবর্ত্তিত হইয়া চলে।

ময়মনসিংহ জেলার ভাদ্রা গ্রামের ঘোষ-রায় বংশের প্রসিদ্ধি বহুদিনের। জাতিতে ইঁহারা কায়স্থ, বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ভক্তির দিক দিয়া ইঁহাদের তুলনা বিরল। পূর্ব্বপুরুষেরা নবাব সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উপার্জ্জন যেমন যথেষ্ট করিতেন সদ্ব্যয়ও তেমনি তাঁহারা কম করেন নাই।

জগবন্ধুর পিতামহ গোবিন্দনাথ চিরকাল ঘোষ-রায় বংশের এ বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার স্থাপিত গোবিন্দ-রায় বিগ্রহের মন্দির বহু ভক্তজনের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। দেবার্চ্চনা ও বৈষ্ণব সেবার ঐতিহ্যের ধারাটিও নিজ জীবনে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যান।

জগবন্ধুর বয়স তখন সাত বৎসর, বালক এ সময়ে একদিন মারাত্মক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। ধনী সংসারের একমাত্র পুত্র সে, রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রাণসংশয়ও হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়, স্নেহময় পিতৃব্য এ সঙ্কটে কোন চিকিৎসককেই ডাকিতে গেলেন না! শ্রীবিগ্রহের শরণই তিনি একান্তভাবে নিলেন, বালককে শুধু চরণামৃত পান করাইয়া রহিলেন একেবারে নিশ্চিন্ত। যাই হোক্ জগবন্ধুর রোগ কিন্তু এ যাত্রায় নিরাময় হইয়া গেল।

সেদিনকার এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার পর হইতেই বালকের অন্তরে জাগিয়া উঠে অপূর্ব্ব ভক্তি বিশ্বাস। ঠাকুরের প্রসাদের উপর হয় তাহার প্রবল আস্থা, অনিবেদিত কোন বস্তুই কখনো তাহাকে আর গ্রহণ করানো যাইত না।

বড় অদ্ভুত এ বালকের আচরণ! জলখাবারের জন্য যে সামান্য পয়সা তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা জমাইয়া সে হরিলুট দিবার ব্যবস্থা করে। কীর্ত্তনের সময় তাহার দেহে দেখা দেয় আশ্চর্য্য ভাববিকার। ভাবভঙ্গী দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পূর্ব্বজন্মের এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়াই যেন সে জন্মিয়াছে।

জগবন্ধু বারো বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, এবার লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত করা দরকার। পিতৃব্য তাহাকে এক মুন্সীর শিক্ষাধীনে কয়েক বৎসর রাখিয়া দিলেন। মেধাবী বালক বাংলা ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই অল্পসময়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিল।

ঘোষ-রায়দের গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণব সাধু ও আচার্য্যদের সমাগম হয়। তরুণ জগবন্ধু উৎকর্ণ হইয়া ইঁহাদের আলাপ আলোচনা শ্রবণ করে—পাঠ, কথকতা এবং কীর্ত্তনের ভাবাবেগে মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়।

সংসার বিরাগের সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌গত হয় গৌরভজনের অনুরাগ। রোজই একবার চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ না করিয়া শুদ্ধাচারী তরুণ জলটুকও গ্রহণ করিতে পারে না। ধীরে ধীরে জীবনে তাহার বৃদ্ধি পায় মুমুক্ষা ও আর্ত্তির তীব্রতা, অজানা পথের হাতছানি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে থাকে।

ঠিক এমনি সময়ে পিতৃব্য এক শেল নিক্ষেপ করিলেন। জগবন্ধু এখন বড় হইয়াছে, সংসারের দায়িত্ব বহনের জন্য এবার প্রস্তুত না হইলে চলিবে কেন? অথচ সব কিছু সম্পর্কে তাঁহাকে দেখা যায় একেবারে উদাসীন। এ বৈরাগ্যস্রোতকে বাধা দেওয়া বড় কঠিন!

ভাবিয়া চিন্তিয়া গৌরনাথ এবার তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন!

এ সংবাদ শুনিয়াই জগবন্ধুর মাথা ঘুরিয়া গেল! না। সাধ করিয়া এমন শিকল তিনি কিছুতেই পরিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও বিলম্ব হইল না, নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে বিষয়বিরক্ত যুবক সেদিন গৃহত্যাগ করিলেন।

দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করার পর তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হন। অধ্যাত্ম-জীবনের নিজস্ব পন্থাটি খুঁজিয়া পাইতেও বেশী দেরী হয় নাই। বৈষ্ণবীয় দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন, আর এই বৈরাগ্যময় সাধন-জীবনে তাঁহার নব নামকরণ হয়, চৈতন্যদাস।

সাধনা, পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবীয় দৈন্য—সকল দিক দিয়া চৈতন্যদাস অচিরে নবদ্বীপে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ত্যাগ বৈরাগ্য ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। সাধন-নিষ্ঠা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি তখন চারিদিকে। কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সম্বলের মধ্যে দেখা যাইত শুধু এক টুকরা ছিন্ন কন্থা, নারিকেলের মালা ও একটি মাটির করোয়া।

কৃচ্ছ্র ও ত্যাগবৈরাগ্যময় এ সাধন-আধারের মধ্যে টলমল করিত অপূর্ব্ব প্রেমরস। বাহিরের ভঙ্গীটি যত কঠোর, যত দৈন্যময় থাক্ না কেন, প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদাসের সাধন ছিল রাগানুগা। নিজেকে তিনি সদাই রাখিতেন গৌরনাগরী ভাবে বিভাবিত।

প্রেমাবেশ হইলেই দেখা যাইত তিনি নাগরী বেশে সজ্জিত হইয়া গৌরবিগ্রহের পাশে দাঁড়াইয়া ব্যজনরত। বেশভূষা ও প্রেমরসের ব্যঞ্জনায় হইয়া উঠিয়াছেন অপরূপ। আবার বাহজ্ঞান আসিলে দেখা যাইত, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবসাধকরূপে দীনাতিদীনভাবে, ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন।

চৈতন্যদাস বাবাজী নিরন্তর জপ-সাধন করেন 'গোরা' নাম। লক্ষ 'গোরা'-নামাঙ্কিত একটি পবিত্র পুঁথি প্রতিদিন পূজা না করিয়া তাঁহাকে জলগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। জাগ্রত অবস্থায় প্রায় সব সময়ই ধ্যানাবেশে তাঁহার অতিবাহিত হয়।

এই আবেশের বৈচিত্র্যও নিতান্ত কম নয়। সে-বার শ্রীখণ্ডে বাস করার সময় বাবাজী মহারাজ স্বহস্তে ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করিতে গিয়াছেন। সম্মুখের ফুটন্ত হাঁড়িতে প্রসাদান্ন সিদ্ধ হইতেছে, পাশেই একটি শিলার উপর চূর্ণ-করা হরিদ্রা ছড়ানো। কিছুটা হরিদ্রা হাঁড়ির অন্নে মিশানোর সঙ্গে সঙ্গে উহা গৌরবর্ণ হইয়া গেল। ইহা দর্শনমাত্র গৌররূপের ভাবাবেশে তিনি প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন।

আর একদিনের কথা। ক্ষৌরকার সেদিন চৈতন্যদাস বাবাজীকে কামাইতে বসিয়াছে। হঠাৎ এ সময়ে তাহার হাঁচি পায় এবং সে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠে, 'গৌর—গৌর'। তখনি দেখা যায় এক বিচিত্র দৃশ্য! বাবাজী মহারাজ অমনি ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়ান, প্রেমভরে দুই হাত তুলিয়া উদ্দণ্ড নামকীর্ত্তন শুরু করিয়া দেন। ভাবপ্রমত্ত এই সাধককে তখন বহু কষ্টে শান্ত করা হয়।

একবার গ্রহণের সময় চৈতন্যদাস বাবাজী গঙ্গায় স্নান করিতে নামিয়াছেন। চারিদিকে অগণিত পুণ্যার্থী নরনারীর ভীড়। আচার্য্য ও পুরোহিতের দল বহু লোককে মন্ত্র পড়াইতে শুরু করিয়াছেন। এ সব অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতন্ত্রের দিকে বাবাজীর কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমানন্দে তিনি তাঁহার নিজস্ব মন্ত্র ভক্তিভরে পড়া শুরু করিলেন—"গৌরাঙ্গ-নাগরী হবো, গৌরাঙ্গ-নাগরী হবো।"

শুনিয়া তো সকলে অবাক! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবাজী মহাশয়, একি অদ্ভুত মন্ত্র আপনি পড়ছেন? স্নান-তর্পণের ঘাটে এ তো কেউ কখনো শোনেনি!"

চৈতন্যদাস উত্তর দিলেন, "ভাই, তোমাদের মন্ত্র তোমরা পড়ে যাও,

আর আমি আমার নিজেরটা পড়ছি। যার যেমন ভাবনা, সিদ্ধি তো তার তেমনই হবে!"

নবদ্বীপের এক ঘাটে বাবাজী মহারাজ সেদিন স্নানে নামিয়াছেন। স্নান সমাপন করিয়া তিনি কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিতে যাইবেন, এমন সময় বায়ুর ঝাপ্‌টায় তাঁহার কৌপীনটি হঠাৎ হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। এই বৈষ্ণব সাধকের ভাব-তন্ময়তার কথা কাহারো অজানা নাই, তাঁহার নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া স্নানের ঘাটের মহিলারা চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিলেন।

জগদীশ মৈত্র নামে এক ব্রহ্মণ ঐ সময়ে ঘাটে স্নান করিতেছেন। লোকটি যেমন উগ্র প্রকৃতির, তেমনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "ব্যাটা লম্পট, স্নানের ঘাটে এসে কুলবধূদের সামনে তুই উলঙ্গ হয়েছিস্। শিগ্‌গীর এখান থেকে সরে পড়্, নইলে মেরে তাড়াবো।"

বাবাজী মহারাজ মিনতির সুরে কহিতে লাগিলেন, "বাবা হঠাৎ বায়ুর ঝাপ্‌টা এসে পড়াতেই হাত থেকে কৌপীনটা পড়ে গিয়েছে আমার এ অপরাধ মাপ কর।"

কিন্তু সে কথায় কে কর্ণপাত করে? মৈত্র মহাশয় আরও সুর চড়াইয়া গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, "ছাখো, লম্পট বেটা নিজের দোষ লুকিয়ে এখন হাওয়ার ওপর দোষ চাপাচ্ছে?"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিতভাবে চৈতন্যদাসের গালে সজোরে তিনি এক চপেটাঘাত করিয়া বসিলেন।

গঙ্গার ঘাটের সবাই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এই বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধককে এমনভাবে গায়ে পড়িয়া অপনান করা কেন? যে দোষ হইয়াছে তা তো সত্যই তাঁহার ইচ্ছাকৃত নয়!

বাবাজী কিন্তু নির্ব্বিকার! জোড় হাত করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি আমার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পেলাম। আপনি আমায় শিক্ষা দিয়ে আমার শিক্ষাগুরু হলেন! আর কখনো এমন অপরাধ হবে না।"

অতঃপর ধীরে ধীরে স্নানের ঘাট ত্যাগ করিলেন।

তিন দিন পরের কথা। পূর্ব্বোক্ত জগদীশ মৈত্র মহাশয় হঠাৎ সেদিন জ্বরবিকারে মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। বিকারের ঘোরে কেবলি বার বার বলিতেছেন, "বাবাজী মহাশয়! আমি মহা অপরাধী, মহা-পাপিষ্ঠ। কৃপা ক'রে আমায় আপনি ক্ষমা করুন।"

বার বার এই কথা বলিতে বলিতে রোগীকে অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে দেখা গেল। আত্মীয়স্বজনেরা ভীত হইয়া চৈতন্যদাস বাবাজীর কাছে আসিয়া শরণ নিলেন।

বলা বাহুল্য, বাবাজী মহারাজ লোকটির অপরাধের মার্জ্জনা বহু আগেই করিয়া বসিয়াছেন। এবার শরনার্থীদের হাতে গৌরবিগ্রহের চরণতুলসী দিয়া কহিলেন, "যাও, কোন ভয় নেই। রোগীকে এই পরম ঔষধি সেবন করিয়ে দাও—অচিরে আরোগ্য লাভ ক'রবে।"

উগ্রস্বভাব ব্রাহ্মণটি আরোগ্যলাভ করেন, অতঃপর তাঁহার জীবনে সাধিত হয় এক রূপান্তর। বাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি এক বৈষ্ণব সাধকে পরিণত হন।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মন্দিরে এক নির্জ্জন কুটিরে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাস করেন। রাগানুগা ভক্তির উচ্ছ্বাসে তিনি প্রায়ই থাকেন একেবারে মাতোয়ারা। নদীয়া-নাগরী-ভাবের তন্ময়তা যখন বাবাজীকে পাইয়া বসে, রূপসী ও গৌরাঙ্গ তরুণী দেখিলেই সখীভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গৌরানাগরের বিরহ বিলাপে অবিরলধারে তাঁহার দুই চোখে কেবলি অশ্রু ঝরিতে থাকে।

গৌরাঙ্গ মন্দিরের চত্বরে সেদিন সাড়ম্বরে পালাকীর্ত্তন চলিতেছে। ভক্ত কীর্ত্তনীয়া ভাবগদগদকণ্ঠে গোরচন্দ্রিকার গান ধরিলেন—'নদীয়া ছাড়িয়া গেলা গৌরাঙ্গ সুন্দর।'

এই করুণ বিরহ-গীত কাণে যাওয়ামাত্র সিদ্ধ চৈতন্যদাস এক লাফে কীর্ত্তন গায়কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ালেন। গৌর বিগ্রহের দিকে

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তেজিতভাবে কহিতে লাগিলেন, "ঐ তো নবদ্বীপচন্দ্র—বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ, ঐ জীবন্ত দাঁড়িয়ে আছেন! আবার যদি তাঁর নদীয়া ছাড়বার কথা মুখে আনো তো, তোমাকে এখনি এখান থেকে মেরে তাড়াবো।"

কীর্ত্তনের আসরে ততক্ষণে এক মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গিয়াছে। ভীত হইয়া কীর্ত্তনীয়া মাথুর ত্যাগ করিয়া নূতন পালাগান আরম্ভ করিলেন। গৌরভক্তিসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর এই ভাবময়তার কথা স্মরণ রাখিয়া কীর্ত্তনীয়ারা নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মন্দিরে বহুদিন মাথুর পালা আর গান করেন নাই।

কাল্‌নার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর সহিত চৈতন্যদাসের অন্তরের বড় নিগূঢ় যোগাযোগ ছিল। উভয়েই রাগানুগা ভজনে সিদ্ধ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের দুই বৃহৎ স্তম্ভরূপে উভয়ে সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু বহিরঙ্গ আচরণের দিক দিয়া দুই বৈষ্ণব মহাপুরুষের ভঙ্গী ও আচরণ ছিল ভিন্নরূপ।

ভগবানদাস বাবাজী ছিলেন স্বভাবগম্ভীর—প্রেম সাধনার ধারাটি তাঁহার মধ্যে ছিল অন্তঃসঞ্চারী। আর, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর সাধনজীবন ছিল রাগানুগা ভক্তির উচ্ছ্বলতায় ভরপুর, গৌরনাগরের প্রেমের জোয়ারে তাঁহার ভিতর ও বাহির উভয়ই হইয়া উঠিয়াছিল রসোদ্বেল। এই দুই মহাবৈষ্ণবের মধ্যে গৌর-প্রেম নিয়া কপট প্রেম-কলহও কম হইত না।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী সেবার বৃন্দাবনধামে যাইতেছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, চৈতন্যদাস বাবাজীকেও সঙ্গে নিয়া যান। কিন্তু প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম নবদ্বীপ ছাড়িয়া 'গৌর-নাগরী' চৈতন্যদাস এক পদও অগ্রসর হইতে সম্মত নন।

কিন্তু সে-বার ভগবানদাস বাবাজীর বহু অনুনয় বিনয়ের পর তিনি বাধ্য হইয়া বৃন্দাবনে যাইতে রাজী হইলেন।

যাত্রার দিন কিন্তু সব ব্যবস্থা বিপর্য্যয় হইয়া যায়। গৌরবিগ্রহের নিকট বিদায় চাহিতে আসিয়া চৈতন্যদাস মন্দিরের দ্বারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। গৌরাঙ্গ-মন্দির প্রাঙ্গণে সেদিন শোকাকুল ভক্তপ্রবরকে ঘিরিয়া জনতার ভীড় জমিয়া যায়।

অতঃপর বহুক্ষণ নামকীর্ত্তনের পর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। ভগবানদাস বাবাজী বুঝিলেন, তাঁহার সব চেষ্টাই একেবারে বৃথা— নদীয়া ও নদীয়া-নগর ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদাস প্রাণ থাকিতে কোথাও যাইতে পারিবেন না। তিনি কহিলেন, "কাজ নেই তোমার বৃন্দাবন যাত্রায়। সত্যিই তো, নবদ্বীপই তোমার বৃন্দাবন!"

সিদ্ধ চৈতন্যদাস স্বস্থানেই রহিয়া গেলেন।

নবদ্বীপের শাস্ত্রবিদ্ আচার্য্য ও জনসাধারণ সকলেরই দৃষ্টিতে চৈতন্যদাস বাবাজী ছিলেন এক অসামান্য সিদ্ধ-পুরুষ। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকলেই অধ্যাত্মজীবনের নানা প্রশ্ন, নানা প্রার্থনা নিয়া পরম সম্ভ্রমভরে এই নিষ্কিঞ্চন মহাবৈষ্ণবের চরণতলে সমবেত হইতেন। তাঁহার উপদেশ ও নির্দ্দেশ জিজ্ঞাসুদের কল্যাণ সাধন করিত, সাধন-পথে তাঁহাদের পরিচালিত করিত।

সে-বার ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। শিশিরকুমার ভক্তিভরে প্রশ্ন করেন, "বাবাজী মহারাজ, ভক্তি কিসে হয়, তা আমায় দয়া ক'রে বলুন।"

উত্তর হইল, "কেন গো, দু'পয়সায় তো ভক্তি লাভ হয়।"

"সেকি কথা? দু'পয়সায় ভক্তি লাভ! বাবাজী মহারাজ কি আমায় উপহাস কচ্ছেন?"

"হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! সত্যিই আমি কোন উপহাস করিনি, ঠিকই বলেছি! দু'পয়সা দিয়ে বটতলার ছাপানো নরোত্তম ঠাকুরের একখানা প্রার্থনা-পুস্তক কিনে পড়ুন। ভক্তিলাভ ঐ প্রার্থনা আর আর্ত্তির ভেতর দিয়েই হবে!"

গৌরপ্রেমের সাধনায় প্রাণের আর্ত্তি আর প্রার্থনাই ছিল বাবাজীর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা।

গোস্বামী বিজকৃষ্ণ একবার সিদ্ধ বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। গোস্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ও মুমুক্ষা তাঁহার অন্তরে চিরদিনই জাগরূক রহিয়াছে। তাই কিছুটা কৌতূহলী ও কিছুটা জিজ্ঞাসু হইয়াই সেদিন তিনি এই বৈষ্ণব মহাপুরুষের ভজন কুটিরে আসিয়াছেন।

কথা প্রসঙ্গে গোস্বামীপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''বাবাজী মহারাজ! প্রকৃত ভক্তির অধিকারী আমি কি ক'রে হতে পারি সেই গূঢ় কথাটি আমায় আজ শিখিয়ে দিন।"

প্রশ্নটি শুনিবামাত্র সিদ্ধবাবা চৈতন্যদাস বিজয়কৃষ্ণের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, মহাপুরুষের সমস্ত দেহটি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে—ক্রমে মস্তকের শিখাটি পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল।

অতঃপর বাবাজী দিলেন এক হুঙ্কার! আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্লে গোঁসাই? তুমি জিজ্ঞেস কর্‌ছো ভক্তি কিসে হয়?"

সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ বৈষ্ণব-পুরুষের দেহে দেখা দিল, অশ্রু পুলক-কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার!

বিজয়কৃষ্ণ তো এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে হতবাক! ভজন কুটিরে উপস্থিত ব্যক্তিদের চোখেও সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছে পরম বিস্ময়। এ ধরণের প্রেমলক্ষণ দর্শন করা অনেকেরই ভাগ্যে বেশী ঘটে নাই, তাই নির্নিমেষ নেত্রে সকলে চাহিয়া আছেন।

এই অলৌকিক প্রেমোন্মত্ততা প্রশমিত হইলে চৈতন্যদাস বাবাজী বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। তারপর প্রবীণ বৈষ্ণব করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, ভক্তির কথা বল্‌ছেন? সে দুর্ল্লভ বস্তুর সাক্ষাৎ আমি অভাজন কোথায় পাবো? আপনি আশীর্ব্বাদ

করুন, যেন নিষ্কিঞ্চিন কাঙাল হ'তে পারি, তার আগে তো ভক্তির নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না! প্রভু, একটা কথা আজ আমি এখানে বলে দিচ্ছি শুনুন। এখন আপনি যেভাবেই চলাফেরা করুন না কেন, আপনার তিলক ও কণ্ঠীমালা যে আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। ভক্তি হচ্ছে আপনাদেরই ভাণ্ডারের ধন। আপনি যে অদ্বৈত বংশের সন্তান। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে, প্রভু?"

গোস্বামীজী সম্পর্কে চৈতন্যদাস বাবাজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরজীবনে ফলিয়া গিয়াছিল।

গৌরাঙ্গ মন্দিরের এক কোণে বসিয়া চৈতন্যদাস প্রতিদিন তাঁহার সাধনভজন অনুষ্ঠান করিয়া চলেন। নামজপ কীর্ত্তনের পর্ব্ব শেষ হয়, তারপর গভীর নিশীথে রাগানুগা ভক্তিসাধনার গভীরে সাধক নিমজ্জিত হইয়া যান। প্রহরের পর প্রহর প্রাণবল্লভ গৌরের সাথে মিলন-বিরহের নানা রঙ্গ, নানা রসালাপ তাঁহার চলিতে থাকে। মন্দিরের পূজারী ও বৈষ্ণব সাধকেরা এক একদিন তাঁহার এই রসোজ্জ্বল সংলাপ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যান।

ভীম নামে নবদ্বীপে এক দুর্দ্ধর্ষ, দুরাচার ব্যক্তি বাস করে। জাতিতে গন্ধবণিক, ধর্ম্মবুদ্ধির লেশমাত্র তাহার মধ্যে নাই। বৈষ্ণবদের উপর তাহার বড় আক্রোশ, দেখিলেই মারমুখী হইয়া উঠে। নানাজনের মুখে সে সিদ্ধ চৈতন্যদাসের এই গৌর-প্রেমালাপের কথা শুনিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তের মনে বড় সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, আসল ব্যাপারটা কি? নিশ্চয় ভিতরে কোন গূঢ় রহস্য আছে! প্রকৃত তথ্য তাহাকে উদ্‌ঘাটন করিতেই হইবে।

একদিন গভীর রাত্রে সে মন্দিরের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাবাজী মহারাজের ক্ষুদ্র কুটিরটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রেমিক সাধক তখন ভাবাবিষ্ট, মনে মনে দয়িতের সহিত প্রেমালাপে মত্ত, হৃদয়ের আকুতি বার বার তিনি উঘারিয়া বলিতেছেন।

ভীমের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, চৈতন্যদাস বাবাজী নিশ্চয় তাঁহার কোন প্রেমিকার সহিত রঙ্গরস করিতেছেন, রাগানুগা সাধন ভজনের ব্যাপার সব মিথ্যা। গৃহমধ্যে নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোক রহিয়াছে, এখনি ঢুকিতে পারিলে বাবাজীর কপটতা ধরিয়া ফেলা যায়। পদাঘাতে তখনই সে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

কুটিরে পা বাড়াইয়াই ভীম কিন্তু বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া যায়। দেখে, বাবাজী মহাশয় সম্মুখে নিষ্পন্দভাবে ধ্যাননিমগ্ন, তাঁহার দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতি নির্গত হইতেছে—সারা ঘর পুষ্পগন্ধে আমোদিত। কিন্তু কই? আর কেহ তো কোথাও নাই।

সেই মুহূর্ত্তে সেখানে ভীম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইবার পর বিস্ময় আরো বাড়িয়া যায়। দেখে বাবাজীর ভজনগৃহের কপাট ভাঙ্গার কোন চিহ্নই নাই।

ভীমের অন্তরে এবার শুরু হয় তীব্র অনুশোচনা আর মর্ম্মদাহের জ্বালা। এ জ্বালা সহ্য হয় না, অবশেষে একদিন সে সিদ্ধবাবার চরণে লুটাইয়া পড়ে। সাশ্রুনয়নে মিনতি জানায়, "বাবাজী, আপনি আমায় উদ্ধার করুন, দয়া ক'রে আপনার চরণে আশ্রয় দিন।"

স্নেহালিঙ্গন দান করিয়া চৈতন্যদাস কহিলেন, "ভীম, ওঠো বাবা, কোন ভয় নেই। আজ থেকে তুমি গৌরদাস হ'লে। হরিনাম ও বৈষ্ণব-সেবা নিষ্ঠা সহকারে ক'রে যাও, কৃপা অচিরেই মিল্‌বে।"

বাবাজী মহারাজের এ করুণা, আর দুর্দ্দান্ত ভীমের এ রূপান্তর দর্শনে নবদ্বীপবাসীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

সাধন জীবনের শেষ পর্য্যায়ে সিদ্ধ চৈতন্যদাস দিনের পর দিন কেবলি গৌরধ্যানে ডুবিয়া যাইতেছেন। আত্মনিবেদন ও আত্মসাৎ-এর পালাটি এবার আসিয়া পড়িয়াছে শেষ অঙ্কে।

শুভলগ্ন সমাগত। সারা দিনরাতই বাবাজী সেদিন ভজনরসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। হঠাৎ গভীর রাতে ভাবতন্ময় অবস্থায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া

বসেন, গৌরনাগরী বেশে নিজেকে করেন সুসজ্জিত। তারপর তিনি প্রেমরসে ডগমগ হইয়া প্রাণপ্রিয় গৌর বিগ্রহের বামে গিয়া দাঁড়ান, প্রাণের পরম কথাটি অনুচ্চস্বরে গাহিয়া উঠেন—

আমার ভজন হ'ল সারা,
আমার পূজন হ'ল সারা।
নদের চাঁদের কান্তা আমি,
কান্ত আমার গোরা।—

গাহিতে গাহিতে মহাপুরুষের দেহে প্রকাশিত হয় এক অপূর্ব্ব দিব্য-কান্তি। প্রেমাবিষ্ট নয়ন দুইটি গৌরবিগ্রহের নয়নে নিবদ্ধ হয়। নিত্যলীলার জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্মটি ধীরে ধীরে সেদিন উন্মুক্ত হইয়া যায় এই মহাবৈষ্ণবের সম্মুখে।

৩৯২ গৌরাব্দের অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার এই প্রয়াণ-লগ্নটি আজো অগণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অন্তরে শোকের ছায়াপাত করে!

সাইবাবা

ষোল বৎসর বয়স্ক তরুণ ফকির। পরিধানে তাঁহার ধূলিমলিন ছিন্ন বাস, মাথায় জড়ানো রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্র চাদর। আননে অপূর্ব্ব প্রশান্তির ছাপ। নয়ন দুইটি স্বপ্নালু, ভাবময়—কোন্ অতীন্দ্রিয় রহস্যের গভীরে কেবলি ডুবিয়া যাইতে চায়। লোকালয়ের কাছে এ ফকিরকে প্রায়ই বেশী ঘেঁষিতে দেখা যাইত না, নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিতেই সে ভালবাসে।

আমেদাবাদ জেলার শিরডি গ্রামে সে নবাগত। কোথা হইতে কবে আসিয়াছে, কাহারো তাহা জানা নাই, জানিতে কেহ তেমন উৎসুক বলিয়াও মনে হয় না। ছন্নছাড়া ভবঘুরে বা পাগলের সম্পর্কে আগ্রহ কাহারই বা থাকে।

গ্রামের একটা দিক জঙ্গলাকীর্ণ। ইহারই কোণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এক বিশাল নিম গাছ। এই গাছের গুঁড়ির প্রকাণ্ড কোটরটিই আপাততঃ ফকিরের বাসস্থান।

সারাদিন স্বেচ্ছামত সে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। ভিক্ষা করা মোটেই তাহার স্বভাব নয়, অজাচিতভাবে যে দু'এক টুকরা রুটি জুটিয়া যায়, তাহা দিয়াই কোনমতে উদরপূর্ত্তি করে! দিন শেষে বৃক্ষকোটরে নিভৃতে শুরু হয় তাহার সাধন-ভজন।

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, ইতিমধ্যে তরুণ ফকিরেরও কম পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

নিম্ববৃক্ষের আশ্রয় ছাড়িয়া এখন সে স্থান নিয়াছে শিরডির মসজিদে। এতদিনে গ্রামের লোকের সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা না হোক, জানাশোনা বেশ কিছুটা ঘটিয়াছে।

অতঃপর হঠাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এক চিহ্নিত দিনে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই নবীন সাধকের নূতনতর রূপ!

গুটিকয়েক উদাসীন আর সংসারত্যাগী মানুষ এই মসজিদে বাস করে, আর ইহাদের সান্নিধ্য হইতেছে গ্রামের একদল মানুষের প্রাণ জুড়াইবার জায়গা। মাঝে মাঝেই তাহারা দল বাঁধিয়া আসে, ধর্ম্ম-কথা ও গ্রাম্য-কথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। তারপর একরাশ গাঁজা, তামাক পোড়াইয়া গভীর রাত্রে গৃহে ফিরে।

সে রাত্রেও এমনি একদল লোক উপস্থিত। ফকিরকে সবাই ঘিরিয়া বসিয়াছে।

তরুণ সাধকের আননে আজ এক অপূর্ব্ব ভাবময়তা, নয়নে উদ্দীপনা দীপ্তি। সকলকে নিয়া ধর্ম্ম-কথায় সে মত্ত। বড় বড় সাধকদের বিস্ময়কর সিদ্ধাই, প্রসিদ্ধ ফকিরদের কেরামৎ-এর কাহিনী একের পর এক সে বলিয়া চলিয়াছে। বক্তা ও শ্রোতা কাহারো আজ ক্লান্তি নাই, হুঁসও নাই।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল। কক্ষের এক কোণে জীর্ণ লণ্ঠনটি জ্বলিতেছে কিন্তু তেল উহাতে বেশী নাই, আলোর শিখা ক্রমেই স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

ফকিরের মনের দুয়ার আজ কি জানি কেন খুলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আলোচনায় এখনি ছেদ টানিয়া দিতে সে রাজী নয়। আসন হইতে উঠিয়া হঠাৎ সে লণ্ঠনটির কাছে গেল। ঝাঁকুনির ফলে বুঝা গেল, কেরোসিন নিঃশেষিত। তা হোক্, ঘরে জল তো রহিয়াছে। লোটা হইতে বেশ খানিকটা জল ফকির ঐ লণ্ঠনে ঢালিয়া দিল, আবার শুরু হইল তাহার ধর্ম্মকথা। শ্রোতারা সকলেই মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে।

সে রাত্রে যতবারই এ লণ্ঠনে তেলের প্রয়োজন হইয়াছে

ততবারই ফকরি উহাতে ঢালিয়া দিয়াছে তাহার লোটার জল, আলোর শিখা বার বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমনিভাবে রাত্রি পোহাইয়া গেল।

উপস্থিত গ্রামবাসীদের মনে সেদিনকার এ ঘটনাটি বিস্ময় না জাগাইয়া পারে নাই। কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে জল এমন করিয়া দাহ্য তেলে রূপান্তরিত হয়? অদ্ভুত সিদ্ধাই এ নবীন সাধকের!

পরদিন শিরডি গ্রামের সর্ব্বত্র এই অলৌকিক কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। ফকিরকে লোকে দেখিতে শুরু করে নূতনতর দৃষ্টিতে, নূতনতর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত।

কি সাধনা এই যুবক সাধক করিয়াছে, কোথায় তাঁহার মুরসেদ বা গুরু, সাধনার কোন্ স্তরে তিনি আজ পৌঁছিয়াছেন তাহা কেহ জানে না। কিন্তু তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা, সাধনার সাফল্যের কথা সহজ বিশ্বাসে সকলে মানিয়া নেয়। এ ফকির হইয়া উঠে তাহাদের এক বড় অবলম্বন। দুঃখে-দুর্দ্দৈবের দিনে তাই তাঁহারই কাছে আসিয়া আর্ত্ত নরনারী নয়নজল ফেলে, উপদেশ গ্রহণ করে। সঙ্কট মোচনের জন্য তাঁহারই কাছে মিনতি জানায়।

তরুণ সাধকের সম্মুখে সদাই জ্বলিতে দেখা যায় এক ধুনী। রোগ শোক, অন্তরের ব্যাথা বা অশ্রুজল নিয়া যাহারাই আসিয়া আশ্রয় নেয়, তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই মিলে ধুনীর একমুষ্ঠি ভস্ম—আর্ত্তের দুঃখ ও বেদনা নাশের মুষ্টিযোগ।

দীনের শরণ, আর্ত্তের ত্রাতা এ ফকিরই ক্রমে সাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন সাইবাবা নামে। শুধু শিরডির এই নগণ্য গ্রামটিতেই নয়, শক্তিবান মহাপুরুষরূপে তাঁহার নাম ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র মারাঠা দেশে, তারপর সমগ্র দাক্ষিণাত্যে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, সকল ধর্ম্মসমাজের ভক্ত ও বিশ্বাসী মানুষ এই মহাত্মার আকর্ষণে দিনের পর দিন ছুটিয়া আসে।

একনিষ্ঠ ভক্তরূপে গোড়ার দিকে আসিয়া উপস্থিত হন—নানা-

সাহেব চন্দোরকার, চিৎনীস্, কীর্ত্তনকার দাস-গন্নু ইত্যাদি ভক্তদল। আর আগ্রহাকুল দর্শনার্থীদের মধ্যে দেখা যায় মহামনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক হইতে শুরু করিয়া দাক্ষিণাত্যের গণ্যমান্য ইংরেজ রাজপুরুষ ও দেশীয় রাজরাজড়াদের।

নিম্ববৃক্ষ কোটরের পাগ্‌লা ফকিরের জীবননাট্যে দেখা দেয় পট পরিবর্ত্তন। নব রঙ্গমঞ্চে নব অভিনয় শুরু হয়।

ছিন্নবাস পরিহিত সে ভিক্ষুক ফকিরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এরার তিনি সর্ব্বজনবরেণ্য, সকলের পরমাশ্রয়—সাইবাবা। রাজার মতই তিনি যেন এক দরবার-কক্ষে বসিয়া গিয়াছেন। আর পরম দৈন্যভরে তাঁহার কাছে আনুগত্য দেখাইতেছে দূরদূরান্ত হইতে আগত সহস্র সহস্র নরনারী। দক্ষিণা, উপঢৌকন ও নজরানা তাঁহার সম্মুখে হইতেছে স্তূপীকৃত।

বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনেই বা কত জৌলুষ ও জাঁকজমক। রৌপ্য শিবিকায় মহাসমারোহে সাইবাবাকে আরোহণ করানো হয়। আর তাঁহার সঙ্গে চলে জরীর ঝালর-দেওয়া ছত্র ও আশাশোটা নিয়া অগণিত ভক্ত ও আশ্রিতের দল।

এই ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের অন্তরালে, সাইবাবার অন্তর্জ্জীবনে কিন্তু বহিয়া চলে ত্যাগ-তিতিক্ষার এক মহনীয় সাধনা। বৈরাগ্য-দীপের নিষ্ফল শিখা জ্বালাইয়া শক্তিমান সিদ্ধ পুরুষ একান্তে সেখানে থাকেন আত্মসমাহিত।

প্রতিদিন ভোরে দর্শনের জন্য তাঁহার দুয়ার খোলা হয়। দৈনন্দিন জীবন তিনি শুরু করেন এক নিষ্কিঞ্চন ফকিররূপে। একটি ক্ষুদ্রতম তামমুদ্রাও তখন তাঁহার আশেপাশে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সারাদিন সম্মুখের গালিচাটিতে জমিতে থাকে সহস্র সহস্র দর্শনী-মুদ্রা ও দুর্ল্লভ খাদ্যবস্তু। তারপর খোলামকুচির মত অবলীলায় তিনি এগুলি প্রার্থীদের মধ্যে নিঃশেষে বিলাইয়া দেন।

বেলাশেষে কৌপীনবন্ত পরমত্যাগী সাধক মসজিদ ছাড়িয়া একবার বহির্গত হন নিজের আহারের জন্য। দুই টুক্‌রা শুষ্ক রুটি ও তরকারী কোন গৃহস্থ বাড়ী হইতে মাগিয়া নেন। ভোজনের পর্ব্ব রোজ এই ভাবেই তাঁহার শেষ হয়।

দিনের পর দিন শত শত দর্শনার্থী ব্যাকুল প্রাণে কেন এ নগণ্য গ্রামে ছুটিয়া আসে? কেন এই উন্মাদ সাধকের কাছে ভীড় জমায়? দর্শনমাত্র কেনই বা তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অহমিকা, পদমর্য্যাদা ও ধনৈশ্বর্য্যের গরিমা ভূতলে লুটাইয়া পড়ে?

তাহারা যে জানে, এই রহস্যময় ফকির যেমন কৃপালু, তেমনি তিনি শক্তিধর!

কক্ষের এক পাশে সাইবাবা তাঁহার দেহখানি এলাইয়া দিয়া বসিয়া থাকেন। সম্মুখে বিস্তারিত একটি পুরাতন গালিচা। দর্শনার্থীরা ইহার উপর বসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা তাহাদের অন্তরের আবেদনটি বুঝিতে পারেন—দুঃখ শোক ও আকাঙ্ক্ষার মূল ধরিয়া তিনি টান দিয়া ফেলেন।

সদাজাগ্রত ও সর্ব্বগামী তাঁহার এ অলৌকিক দৃষ্টি, নিমেষমধ্যে ইহা দর্শনার্থীর অন্তরের দূরতম স্তরে গিয়া পৌঁছে। বিস্মৃতপ্রায় জীবনতথ্যকে অবলীলায় গোপনতার গভীর হইতে তিনি টানিয়া বাহির করেন।

বিস্মিত হইয়া সকলেই ভাবিতে বসে, অন্তর্য্যামী মহাপুরুষের কাছে কোন কিছুই কি অজানা নাই?

শুধু দূর-সন্ধানী দৃষ্টিই নয়, দূরপ্রসারী শক্তিও তাঁহার রহিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীরা সাশ্রুনয়নে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করে, বাবার অন্তর করুণায় উদ্বেল হইয়া উঠে, তিনি আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে সম্ভব।

এ আশীর্ব্বাদ কোন স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে না, ধর্ম্ম, সমাজ বা সম্প্রদায়ের অপেক্ষা রাখে না। শক্তিমান সিদ্ধ পুরুষের কৃপার মঙ্গলধারা দিক্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

করুণার এই প্লাবন, শক্তির এই গতিবেগ কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। বিশিষ্ট আগন্তুকদের মনীষা ও বিদ্যাবত্তা এক মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া যায়। পাগলা ফকিরের লোকোত্তর সত্তা ও ব্যক্তিত্বের কাছে নির্ব্বিচারে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন, কৃতার্থ হন।

সাইবাবার নাম ও মাহাত্ম্য প্রচারে যাঁহারা মাতিয়া উঠেন, নারায়ণ গোবিন্দ চন্দোরকার ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। নানাসাহেব নামেই সকলে তাঁহাকে অভিহিত করিত।

এক সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মারাঠী ব্রাহ্মণ বংশে নানা সাহেবের জন্ম। বরাবরই তিনি ছিলেন মেধাবী ও কর্ম্মঠ। সরকারী কাজে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে রাজস্ব বিভাগের এক বিশিষ্ট পদাধিকার তিনি অর্জ্জন করেন।

১৮৮৭ সালের কথা। নানাসাহেব সেদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে কোপার গাঁও-এ আসিয়া তাঁহার তাঁবু ফেলিয়াছেন, শিরডির এক কর্ম্মচারী তাঁহাকে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "হুজুর, আমাদের গাঁয়ের সাইবাবা আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন, একবার তাঁর সাথে দেখা ক'রতে বলেছেন।"

নানাসাহেবের চোখে-মুখে খেলিয়া গেল এক বিদ্রূপের হাসি। বক্রোক্তি করিয়া কহিলেন, "কোনদিন যাঁর নাম শুনিনি, সাক্ষাৎ হয়নি, তিনি আবার আমায় ডাকতে যাবেন কেন হে? আমার সাথে তাঁর কি দরকার? তাঁকে দিয়ে যে আমার দরকার নেই, একথা তো না বললেও চলে।"

বলা বাহুল্য, সাইবাবার বার্ত্তা নিয়া যে লোকটি আসিয়াছিল, নীরবে সে স্থান ত্যাগ করে।

পর পর আরো দুইবার এমনিভাবে সাইবাবার আমন্ত্রণ আসে।

অবশেষে তৃতীয়বারে নানাসাহেবকে শিরডিতে উপস্থিত হইতে হয়।

প্রণাম করিয়া ফকিরকে প্রশ্ন করেন, "বাবা, আমাকে আস্‌বার জন্য তাগিদের পর তাগিদ দিচ্ছিলেন। এবার বলুন তো, আমাকে দিয়ে কি আপনার প্রয়োজন ?"

উত্তর হইল, নানা, এ পৃথিবীতে তো অগণিত লোকই রয়েছে। কিন্তু তাদের কাউকে কি এমন ক'রে আমি ডাকতে পাঠাই ? তোমার সাথে যে রয়েছে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। অবিশ্যি তোমার পক্ষে একথা জানা সম্ভব নয়, কিন্তু আমি তো তা জানি। অবসর হ'লে মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেয়ো।"

প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগে নানাসাহেবের মনে। আধুনিক শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত। সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে পদমর্য্যাদাও কম নয়। কিন্তু এই ফকির তাঁহার সহিত বড় অদ্ভুত ব্যবহার করিতেছেন। ইনি যেন তাঁহার এক পুরাতন মনিব!

পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ তাঁদের! এটাই বা কি? ফকিরের কথা কয়টি দিনের পর দিন তাঁহাকে ভাবাইতে থাকে। তাঁহার প্রসন্ন উজ্জ্বলমূর্ত্তি, স্নেহ-মধুর দৃষ্টি বার বার নানাসাহেবকে টানিয়া নিয়া যায় শিরডিতে।

সাইবাবার সহিত নানা সাহেবের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইয়া উঠে, এই ফকিরকে তিনি গ্রহণ করেন অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শক ও অভিভাবকরূপে।

কিছুদিন পরের কথা। নানাসাহেব তাঁহার কি একটি কাজে এক সঙ্গীসহ হরিশ্চন্দ্র পাহাড়ে গিয়াছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। রুক্ষ, প্রস্তরাকীর্ণ এই পাহাড়ে জল সংগ্রহ করা বড় কঠিন। মধ্যাহ্নে রৌদ্রতাপ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। শ্রান্তক্লান্ত নানাসাহেব আর এক পাও নড়িতে পারিতেছেন না। সঙ্গীটিও চারিদিকে দৌড়ঝাঁপ কম করিলেন না। কিন্তু পানীয় জলের সন্ধান কোথাও মিলিল না।

হতাশ হইয়া উভয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেখানে এক পাহাড়িয়া ভীল আসিয়া উপস্থিত। ব্যগ্র হইয়া নানা কহিলেন, "ভাই, তৃষ্ণার যে ম'রে যাচ্ছি। একটু জল এখানে কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারো ?"

ভীল হাসিয়া কহিল, "যে জন্য ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরছো, তা যে তোমার পায়ের নীচেই আছে। যে পাথরের ওপর বসেছো, সেটা একবার একটু সরিয়ে দ্যাখো।"

উভয়ে তখনি প্রস্তরখণ্ডটি একদিকে ঠেলিয়া দিলেন। তারপর বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন, ভীল ঠিক কথাই তো বলিয়াছে! এই পাথরেরই নীচ দিয়া এক ক্ষীণকায় পার্ব্বত্য ঝরণা ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করার পর সেদিন নানা সাহেবের জীবন রক্ষা পায়।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে তিনি শিরডিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সাইবাবা স্মিতহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "কি হে নানা তৃষ্ণার সময় পাহাড়ে সেদিন জল তো মিলেছিলো ? দ্যাখো! ভগবানের কৃপা থাকলে পাথরের ভেতর থেকেই জল বেরোয়। পরিশ্রম ক'রে কুয়ো খুঁড়তে আর হয় না।"

সম্মুখে উপবিষ্ট ভক্তেরা জানাইলেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে এক দ্বিপ্রহরে বাবা হঠাৎ বার বার বলিতেছিলেন, "তাই তো! কি করা যায়, বলতো ? আমাদের নানা যে তৃষ্ণায় ম'রে যাচ্ছে!"

ভক্তেরা সেদিন তাঁহার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, এ রহস্যপূর্ণ উক্তি শুনিয়া একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন। এবার নানা সাহেবের কাছে সমস্ত কথা শুনিবার পর বাবার সেই উক্তির মর্ম্ম বুঝা গেল।

চিহ্নিত ভক্তদের সাইবাবা নিজেই অনেক সময় আকর্ষণ করিয়া আনিতেন। তাহাদের সাংসারিক এবং পারমার্থিক কল্যাণের ভার

দুই-ই গ্রহণ করিয়া বসিতেন। ধীরে ধীরে ভক্ত সাধকদের জীবন তাঁহার দিকে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিত। একনিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া জীবনে ঘটিত বহুপ্রার্থিত আধ্যাত্মিক রূপান্তর।

সাইবাবার এই করুণা-লীলার ধারা কখনো প্রবাহিত হইত লৌকিক স্নেহ-ভালবাসার মধ্য দিয়া, কখনো বা ইহা নামিয়া আসিত অলৌকিক ঘটনা বা অতীন্দ্রিয় দর্শনের পথে।

উত্তর ভারতের এক প্রবীণ জজের জীবনে তাঁহার করুণা একদিন অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়াই দেখা দেয়। ভদ্রলোকটি বড় ধর্ম্মপরায়ণ। নারায়ণ মূর্ত্তি ছিল তাঁহার পরম প্রিয়, বার বৎসর যাবৎ এই মূর্ত্তিকেই তিনি ইষ্টরূপে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, দিনের পর দিন ইঁহারই ধ্যান করিয়াছেন।

একদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবে তাঁহার জীবনে ঘটিয়া গেল এক অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। আর সেদিনকার এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সাইবাবা তাঁহার হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বসিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন; "সেদিন নিজের শয্যায় শুয়ে আছি। হঠাৎ হ'লো আমার এক অলৌকিক দর্শন। দেখলাম, আমার দেহটি যেন আমার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে আছে, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভু নারায়ণ। প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে কেটে গেল। তারপর আমি দেখলাম, নারায়ণ মূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একটি মহাপুরুষ। এঁকে আমি আর কখনো দেখিনি। প্রভু নারায়ণ ঐ নবাগতের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে বললেন, 'এই হচ্ছে শিরডির সাইবাবা—তোমার অধ্যাত্মজীবনের পরিচালক। এর কাছেই তুমি আশ্রয় নাও।'

"এর পর উন্মোচিত হলো আর এক বিচিত্র দৃশ্য। আমি তখন শূন্যমার্গ দিয়ে ভেসে যাচ্ছি। কোন্ এক শক্তি যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে শিরডির মসজিদে সাইবাবার সম্মুখে এনে ফেল্‌লো। সম্মুখে পা দু'খানি প্রসারিত ক'রে মহাপুরুষ বসে আছেন। আমায় তিনি

বল্লেন, 'কিগো আমায় দর্শন ক'রতে এসেছো ? তা ভাল। আমি যে তোমার দেন্‌দার গো ! আগেকার জীবনের দেনা রয়েছে, তা যে আমায় মেটাতে হবে'।"

অতঃপর বাবাকে তিনি চাক্ষুষভাবে দর্শন করিতে আসেন। দেখিয়াই বুঝিলেন, এই স্থান ও এই মহাসাধকের মূর্ত্তিই সেদিন তিনি ভাবগ্রস্ত অবস্থায় দেখিয়াছেন। বাবার চরণে পরম ভক্তিভরে তিনি প্রণিপাত করিলেন।

মহাপুরুষ অমনি কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কি ? মানুষের পায়ে এরকম ক'রে মাথা খুঁড়ে মরবার কি দরকার ? মানুষ কেন মানুষকে ভজনা করবে ?"

দর্শনার্থী ভক্তের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এ ফকীর যে অন্তর্য্যামী ! কোন কথাই ইঁহার কাছে লুকাইবার উপায় নাই। মনীষা ও ব্যক্তিত্বের সাথে জজ সাহেবের মধ্যে রহিয়াছে আধুনিক শিক্ষার গরিমা। তাই বরাবরই তিনি ভাবিয়া আসিয়াছেন, কোন মানুষকে ভজনা করার বা তাঁহার চরণে মাথা নত করার প্রয়োজন নাই। আজ তাঁহার সেই নিজস্ব মতবাদকে লক্ষ্য করিয়াই সাইবাবা ঐ তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাণীটি নিক্ষেপ করিয়াছেন।

দর্শনার্থী ভক্ত এবার ভাবিতে লাগিলেন, সত্যিই তো, এই মনোভাব নিয়া সাইবাবাকে দর্শন করিতে আসা তাঁহার উচিত হয় নাই। এটা মোটেই তাঁহার সততার পরিচায়ক নয়।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। মসজিদ তখন প্রায় জনশূন্য। জজ সাহেব কিন্তু কক্ষের এক প্রান্তে নতমস্তকে বসিয়াই আছেন। বাবার কাছে আগাইবার সাহস নাই, খেয়ালী মহাপুরুষ কখন ক্রুদ্ধ হইয়া কি বলিয়া বসেন, কে জানে ?

একান্তে পাইয়া বাবা কিন্তু এবার তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ওরে, তুই যে আমার সন্তান—আমার স্নেহের পুত্তলি। ঘরের ভেতর যখন একগাদা

অপরিচিত লোক গিস্‌গিস্ করে তখন কি আর পিতাপুত্রের দেখাশুনা সম্ভব হয় রে? তখন যে আমি ইচ্ছে ক'রেই আমার নিজের ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখি। আয়, এবার আমার কাছে বোস্।"

ভক্তের নয়নে তখন পুলকাশ্রুর ধারা বহিতেছে।

শত শত লোক সাইবাবার আশীর্ব্বাদে প্রাণ পাইয়াছে, মারাত্মক ব্যাধির যন্ত্রণা এড়াইয়াছে। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় সন্তান লাভ করার পর কত গৃহে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে।

বন্ধ্যা নারীরা দূর দূরান্ত হইতে আসিয়া বাবার চরণে কাঁদিয়া পড়িত। কৃপালু সাইবাবার আননে দেখা দিত প্রসন্নমধুর হাসি। খেয়ালী মহাত্মা কোন কোন নারীর অঞ্চলে খেলাচ্ছলে একটি নারিকেল গড়াইয়া দিতেন। এ নারিকেল ছিল বাবার আশীর্ব্বাদের প্রতীক। অতঃপর বন্ধ্যা নারীর খেদ ঘুচিতে বিলম্ব হইত না, অঙ্ক জুড়িয়া আসিত বহুপ্রার্থিত পুত্রসন্তান।

এক এক সময়ে বাবার এই কৃপার দানরূপে এক একটি বিশিষ্ট সাধককে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে। শান্তারাম বলবন্ত নাচ্‌নের স্ত্রী এক সময়ে সাইবাবার আশীর্ব্বাদে এমনই একটি পুত্ররত্ন লাভ করেন।

বন্ধ্যা নারীকে আশীর্ব্বাদ দানের সময় কিন্তু দেখা গেল, বাবার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। সেদিন কেহ ইহার কারণ না বুঝিলেও পরে তাৎপর্য্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। নবজাত পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরেই প্রসূতি প্রাণত্যাগ করে।

এই শিশুর নাম দেওয়া হয় কালুরাম। পাঁচ বৎসর হইতেই যে বৈশিষ্ট্য, যে অধ্যাত্মপ্রবণতা এ শিশুর মধ্যে ফুটিয়া উঠে তাহা সকলকে বিস্মিত না করিয়া পারে নাই।

ভোর হইতে না হইতেই কালুরাম গৃহের এক কোণে একান্তে উপবেশন করে, শিবনেত্র হইয়া ধ্যানের গভীরে সে নিমজ্জিত হয়।

তারপর ধ্যান শেষে কক্ষের দেওয়ালে টাঙানো সাইবাবার আলোক চিত্রটির আরতি করিয়া উহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। দিনের অবশিষ্টকাল 'রাম, হরি রাম' গাহিয়া কাটাইয়া দেয়।

পূর্ব্বজন্মের এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া এ শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই প্রায় সারাদিনই তাহার এভাবে ভজন পূজায় কাটিয়া যায়! মাঝে মাঝে প্রভু কৃষ্ণজীর দর্শনের যে অলৌকিক কাহিনী সে বর্ণনা করে, আত্মীয়স্বজনেরা হতবাক্ হইয়া যায়।

কালুরামের বিস্ময়কর কাহিনী তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই গাড্‌গি বাবা নামে এক বিশিষ্ট আচার্য্য সেবার এ শিশু সাধককে দেখিতে আসেন।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি তো মহাক্রুদ্ধ। শান্তারাম নাচ্‌নেকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন। কহিলেন, "তোমার একি অদ্ভুত মনোবৃত্তি বল তো? এই ছোট শিশুটিকে শেষকালে এক মুসলমান ফকীরের উপাসনা শেখাচ্ছো!"

শিশু কালুরাম তখনি আগাইয়া আসে, এ কথার উত্তর দেয়। হাতে তাহার গ্রামোফোন কোম্পানীর এক বিজ্ঞপ্তিপত্র। একটি গ্রামোফোনের চোঙের সম্মুখে ধ্বনি শ্রবণে উন্মুখ এক কুকুরের ছবি ইহাতে চিত্রিত রহিয়াছে। কালুরাম এটি ধরিয়া কহিল,—"পণ্ডিতজী, এই কুকুরের মতন এমনি ক'রেই রোজ নিবিষ্ট হ'য়ে সাইবাবার ফটোর কাছে আমি বসি, আর তাঁর কথা শুনতে পাই।"

গাড্‌গি বাবার বিস্ময়ের সীমা নাই! কহিলেন, "আচ্ছা কি ক'রে তাঁর কথাবার্ত্তা তুমি শোন, আমাদের তা বলো দেখি।"

কালুরাম উত্তর দিল, "এ কথা ব'লে বোঝানো যায়না, এ বুঝে নিতে হয়।"

গাড্‌গি বাবাকে এবার নিরস্ত হইতে হয়।

এই শিশু সাধক বেশীদিন নরদেহে বাস করিতে পারে নাই, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়।

অন্তিম মসয়ে পিতাকে নিকটে ডাকিয়া কালুরাম নিজের গলায় ঝোলানো লকেটটি তাঁহার হাতে দেয়। এ তাহার এক মহামূল্যবান সম্পদ—সাইবাবার একটি ক্ষুদ্র ছবি ইহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে। এ লকেটটি দিয়া সে বলে, "বাবা, এ বস্তু গলায় রাখবার প্রয়োজন আর নেই—আমার শেষের দিন এসে গিয়েছে। তুমি গীতার ভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' আমার সামনে বসে খানিকটা পড়। ত্রয়োদশ অধ্যায়টিই পড়ে যাও, আমি শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করি।"

সকলে অবাক হইলেন! অবোধ শিশু পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানেশ্বরীর কি বুঝিবে? পিতা সাশ্রুনয়নে উহা পাঠ করিতে থাকেন।

কালুরাম নিবিষ্ট মনে ইহা শ্রবণ করে, তারপর সাইবাবার আরতি সমাপন করিয়া অমরধামে চলিয়া যায়।

আর্ত্তজনেরা ভীড় করিলেই সাইবাবা উগ্রমূর্ত্তি ধরিতেন, রুক্ষ ব্যবহার ও উচ্চ কণ্ঠের ভৎর্সনায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত। পরবর্ত্তী পর্ব্বটি অবশ্য কাহারো অজানা ছিল না। শরণার্থীদের করুণ আবেদন ও আর্ত্তি কৃপালু মহাপুরুষকে গলাইয়া ফেলিত, দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটিত এক মুহূর্ত্তে। দুশ্চিকিৎস্য রোগ একমুষ্টি উধি বা ধুনীর ভস্মে নিরাময় হইয়া যাইত।

এ সব ছিল শিরডির বাবার দরবারের নিয়মিত ঘটনা, ইহার শুধু দু'একটি কাহিনী আমরা এখানে বর্ণনা করিব।

পুণা জেলার জুন্নের গ্রামে ভীমাজী পেটেলের বাড়ী। নিদারুণ যক্ষ্মারোগ ও অগ্নিমান্দ্যে ভুগিয়া তিনি মৃতকল্প হইয়াছেন, এক পা চলিবারও তাঁহার সাধ্য নাই। খ্যাতনামা ডাক্তারদের চিকিৎসা, দৈব ঔষধ ব্যবহার ও পূজা-মানৎ সব কিছুই করা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

সাইবাবার মসজিদ প্রাঙ্গণে সেদিন একটি টাঙ্গা আসিয়া থামে, মৃতকল্প পেটেলজীকে ধরাধরি করিয়া নামানো হয়।

বাবা তো তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, "ওরে এ চোরটাকে এখানে কে টেনে আন্‌লে? ছ্যাখ্‌তো আমায় আবার কি এক দায়িত্বের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে!"

ভীমাজী পেটেল ধুঁকিতে ধুঁকিতে বাবার শয্যার পাশে আসিয়া বসিলেন! মস্তকটি তাঁহার চরণে রাখিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবা, শুনেছি আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আমার মত আশ্রয়হীন দুর্ভাগা আর কে আছে? আপনি আমায় কৃপা করুন।"

সাইবাবার গলার স্বর ও মুখভঙ্গী এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সব দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকো। প্রারব্ধের ভোগ তোমার এবার কেটে এসেছে—শিরডির মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এটা ঘটেছে। ঈশ্বর এবার তোমার দুর্গতি মোচন ক'রবেন।"

ধুনী হইতে খানিকটা উধি নিয়া বাবা তাহার মাথায় মাখাইয়া দিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, মৃতকল্প, ন্যুব্জদেহ রোগী সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, রোগের গ্লানি অনেক কম।

ভীমাজী পেটেল সেদিন রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, —রোষকষায়িত নয়ন এক ভীমকায় পুরুষ হঠাৎ তাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। আর তাঁহার হাতে রহিয়াছে একটা ভারী মুগুরের মত বস্তু। এইটি দিয়া সে তাঁহার ব্যাধিজীর্ণ দেহটি একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া গেল।

পরের দিনই ভীমাজী পেটেলের ব্যাধির উপসর্গ কমিয়া যায়। তারপর কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সেবার শিরডি অঞ্চলে খুব প্লেগ দেখা দিয়াছে। সাইবাবার ভক্ত জি, এস, খাপার্দে তাঁহার দর্শনের জন্য এ সময়ে সপরিবারে সেখানে আসিয়াছেন।

এ রোগে একেবার আক্রান্ত হইলে আর রক্ষা নাই। চারিদিকে সেদিন মহা আতঙ্ক! খাপার্দের পুত্র বলবন্তের সেদিন রাত্রে প্রবল জ্বর দেখা গেল। দেহের গ্রন্থিগুলি সব স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তীব্র বেদনায় সে প্রায় অচেতন। মারাত্মক বুবোনিক প্লেগের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাত হওয়া মাত্র খাপার্দের স্ত্রী ছুটিয়া বাবার কাছে গেলেন। পুত্রের চিকিৎসার জন্য এখনি তাহাকে বড় শহরে পাঠানো দরকার নতুবা আর তাহাকে বাঁচানো যাইবে না। কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা এখনি আমরা শিরডি ত্যাগ ক'রে চলে যাবো, আপনি দয়া ক'রে অনুমতি দিন।"

বাবা গম্ভীর বদনে একেবারে চুপচাপ বসিয়া আছেন। ধীরকণ্ঠে, রহস্যময় ভঙ্গীতে পরে বলিতে লাগিলেন, "কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে আকাশে, এর পর ঝরবে বৃষ্টি। শস্য জন্মাবে ক্ষেতে। তারপর ফসল তোলা শুরু হবে। আকাশ থেকে মেঘ যাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। কেন বৃথা এত ভয় পাচ্ছো?"

মায়ের মন শান্ত হইতে চাহে না, কিন্তু সাইবাবাকে অমান্য করার সাহসও নাই। অগত্যা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াই খাপার্দে গৃহিণী যাত্রা স্থগিত রাখিলেন।

মহা উৎকণ্ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের কাটিতেছে। দ্বিপ্রহরে সাইবাবা শ্রীমতী খাপার্দাকে নিকটে ডাকাইয়া আনেন, শিশুর মত অবলীলায় নিজের কৌপীনটি খুলিয়া উলঙ্গ হন। দেখা যায়, কুঁচকী দুইটি খুব স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, শরীরে তীব্র জ্বরের উত্তাপ!

স্মিত হাস্যে মহাপুরুষ কহিলেন, 'মা, ছাখো, তোমাদের জন্য এ দেহে কত কিছু টেনে আনতে হয়।"

সেই দিনই কিন্তু বলবন্তের মারাত্মক প্লেগ রোগ প্রশমিত হয়। দুই এক দিনে সে একেবারে সুস্থ হইয়া উঠে।

ভক্ত ও শিষ্যদের বুঝিতে বাকী রহিল না, কৃপাময় সাইবাবা নিজ

দেহে ঐ প্রাণান্তকর রোগ টানিয়া আনিয়া খাপার্দের তরুণ পুত্রটিকে এবার বাঁচাইয়া দিলেন।

১৯১৬ সালের কথা। বাবার ভক্ত বিঠ্ঠল রাও দেশপাণ্ডে সে-বার একদিন শিরডির মসজিদে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে আছেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ। বৃদ্ধটি একেবারে অন্ধ। দীর্ঘদিন বিশিষ্ট ডাক্তারদের দিয়া তাঁহার চিকিৎসা করানো হইয়াছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরিয়া পান নাই।

পৌত্রের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বৃদ্ধ এবার শিরডির শক্তিধর ফকীরের কাছে শরণ নিয়াছেন। বিঠ্ঠলরাও এবং তাঁহার পিতামহ উভয়েই সাইবাবার কাছে কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন।

মহাপুরুষের অন্তর গলিয়া গেল। কহিলেন, "আচ্ছা, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, কিন্তু তার আগে আমার চার টাকা দক্ষিণা দাও।"

সাইবাবার এ দক্ষিণা চাহিবার ব্যাপারটি আগন্তুকদের কাছে ছিল বড় রহস্যজনক। অথচ তাহার সঙ্গীসাথীরা জানিতেন, এই দক্ষিণা তিনি চাহিতেন শরণার্থীকে ত্যাগ ব্রতে দীক্ষিত করার জন্য। অনেকে আবার ভাবিত, ইহা বাবার দরবারের নজরাণা।

দেশপাণ্ডে তৎক্ষণাৎ সাইবাবার হাতে টাকা কয়টি গুঁজিয়া দিলেন। নিতান্ত সহজ কণ্ঠে অন্ধ ভদ্রলোকটিকে তিনি বলিলেন, "যাও ব'সে ব'সে তোমার আর কান্না-কাটি করার দরকার নেই। এবার থেকে দুই চোখেই তুমি ঠিক মত দেখতে পাবে। এখনি এখান থেকে এই উধি নিয়ে চট্‌পট্ স'রে পড়।"

ঐ উধি নিয়া দুই চোখে স্পর্শ করানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধটি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আপনার শক্তি, আপনার করুণার সত্যই সীমা নেই। আমি যে দুই চোখেরই দৃষ্টি আজ ফিরে পেয়েছি।"

কৃপালু সাইবাবার জয়ধ্বনিতে তখন সারা প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

এ অলৌকিক শক্তি ও করুণালীলা দেখিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। কিন্তু সাইবাবা ছিলেন তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণকামী, প্রকৃত পথ-প্রদর্শক—তাই তাঁহাদের দৃষ্টিকে তিনি সদাই সঞ্চালিত করিতেন এই শক্তি ও করুণারই উৎসটির দিকে। ঈশ্বরের প্রতাপ ও মহিমা, কালচক্রের অমোঘ বিধানের কথা সুযোগ পাইলেই ভক্তদের অন্তরে গাঁথিয়া না দিয়া তিনি ছাড়িতেন না।

যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিতে থাকেন, "গ্যাখো, যে মূল্যবান অধ্যাত্ম-সম্পদ আমি প্রাণ ভ'রে ঢেলে দিতে পারি, তা আমার কাছে কেউ চাইতে আসে না। চাইতে আসে তাই, যা দিতে মন আমার সায় দেয় না।"

কথা কয়টি বলার সময় সেখানে ভক্তপ্রবর নানা সাহেব সস্ত্রীক বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পরিবারের উপর সম্প্রতি এক শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে।

নানা সাহেবের কন্যাটি সে-বার সন্তানসম্ভবা ছিল। প্রসবের সময় তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। মফঃস্বলের এমন এক স্থানে নানা সাহেব তখন রহিয়াছেন যেখানে ডাক্তারের সাহায্য পাইবার কোন আশা নাই।

এ বিপদের সময় সাইবাবা হঠাৎ নিজে হইতেই মেয়েটির কথা স্মরণ করেন। একজন অনুগত ব্যক্তিকে দিয়া নিজের ধুনীর কিছুটা উধি সেখানে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দেন। বড় আশ্চর্য্যজনকভাবে সেদিন এ সঙ্কটে কন্যাটির জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবজাত শিশুটি বেশীদিন বাঁচে নাই। ইহার পরই আর এক বিপদ। মেয়েটির স্বামী হঠাৎ পরলোকে চলিয়া যায়।

কন্যার দুঃসহ শোকের কথা নানা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। সেদিন বিষাদখিন্ন হৃদয়ে উভয়ে বাবার চরণতলে আসিয়া বসিয়াছেন। অনেকক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা সরিতেছে না।

সাইবাবা বলিয়া উঠিলেন, "কি গো তোমারা সবাই এমন চুপচাপ বসে রইলে কেন ?"

নানা সাহেব এবার সখেদে উত্তর দিলেন, "বাবা, কি আর ব'লবো। দুঃখের কাহিনী সবই তো আপনি জানেন। কিন্তু বাবা, মনে শুধু একথা ভেবে দুঃখ হয় যে, আপনার আশ্রয় পেয়ে, আপনার অভিভাবকত্বে বাস ক'রে শেষকালে এসব দুর্দ্দৈব আমাদের পরিবারে ঘটলো! মেয়ের দিকে আমি যে তাকাতে পারিনে।"

"হ্যাখো নানা, ছেলে, মেয়ে বা জামাই-এর কথা ভেবে, তারা বেঁচে থাক্‌বে, ভাল থাক্‌বে একথা ভেবে যদি আমার কাছে এসে থাকো, তবে কিন্তু বড় ভুল করেছো। কারুর সন্তানের জন্ম, জামাই-এর মৃত্যু এসব ব্যাপারে আমার হাত নেই। সে শক্তিও আমার নেই। এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় প্রত্যেক মানুষের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম দিয়ে। এমন কি ঈশ্বর যিনি, অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি ক'রেছেন তিনিও এগুলোর পরিবর্ত্তন ক'রতে আসেন না। তুমি কি মনে কর, তিনি খামখেয়ালীর মত সূর্য্য ও চন্দ্রকে ডেকে, বলবেন, 'ওরে, তোরা তোদের জায়গা থেকে আরো দূরে সরে গিয়ে ঘুরতে থাক্‌' ? একথা তো তিনি বলতে পারেন না। তা'হলে যে সারা সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে, মহা গোলযোগ বাধবে।"

"যদি একথা সত্যি হয়, তা হলে বাবা, আপনি কি ক'রে বলে বসেন, 'ওরে, যা তোর এবার সন্তান হবে, ওরে যা তোর ভয় নেই, ভাল চাক্‌রী এবার তুই পেয়ে যাবি।' আর সত্যই তো দেখতে পাই, আপনার বাণী নিশ্চিতরূপে ফলে উঠে। একি আপনার নিজেরই আলৌকিক শক্তির প্রকাশ নয় ?"

"না, নানা, আমি সত্যই কখনো কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটাই নে। তোমাদের তো জ্যোতিষী আছে ? কিছুটা আগে থেকেই তার আসন্ন ঘটনার কথা গণনা ক'রে ব'লে দেয়। আমিও এমনি ধারা ভবিষ্যদ্বাণী করি। তবে, আমি ভবিষ্যতের কথা ব'লে দিই আরও

অনেক বেশী আগে থেকে। আমার কাজ অনেকটা তোমাদের ঐ ভবিষ্যদ্‌বক্তা জ্যোতিষীর মত। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারো না। আমার কথা তোমাদের প্রাণে অলৌকিক বাণীর মত মনে হয়, কারণ, তোমরা সব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আমার যোগবিভূতি খুঁজতে লেগে যাও, আমার পূজো শুরু ক'রে। আর আমার দিক দিয়ে আমি তোমাদের এই পূজোকে এগিয়ে দিই ঈশ্বরের দিকে, যাতে ক'রে তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ হয়।"

সাইবাবার সেদিনকার এ কথাগুলিতে তাঁহার জীবনদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। অলৌকিক শক্তিবিভূতির অধিকারী এই মহাপুরুষের অন্তর্জ্জীবনের দিক্‌দর্শনও ইহাতে মিলে।

দৈহিক ও জাগতিক লাভ ক্ষতিকে অতিক্রম করিয়া সাইবাবার আশীর্ব্বাদ মানুষকে সদাই ঠেলিয়া দিত তাহার প্রকৃত কল্যাণের দিকে। তাই দেখা যায়, অনেক সময় তাঁহার প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়াই প্রার্থীর জীবনে আসিত পরম কল্যাণ।

সাইবাবার বিশিষ্ট ভক্ত, অধ্যাপক জি, জি, নার্‌কে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯১৪ সালের কাছাকাছি কোন বৎসর। এ সময়ে হার্দার এক ধনবান শেঠ সপরিবারে শিরডিতে আসিয়া উপস্থিত। ভদ্রলোকটি যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছেন। সমস্ত কিছু চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর এবার তিনি সাইবাবার আশ্রয় নিতে আসিয়াছেন।

রোগীর অবস্থা একদিন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই। বাবা কিন্তু সেদিকে মোটেই কোন মনোযোগ দিতেছেন না।

রোগীর গৃহের মহিলারা খুব কান্নাকাটি শুরু করিয়া দেন, এই ক্রন্দন শুনিয়া অধ্যাপক নার্‌কের মনও করুণার্দ্র হইয়া উঠে। সাই-

বাবাকে তিনি ধরিয়া পড়েন, মিনতি করিয়া কহেন, "বাবা, এরা বড় হতাশ হ'য়ে পড়েছেন, রোগীর অবস্থাও বড় মর্ম্মান্তিক, তার দিকে আর তাকানো যায় না। আপনি এদের কৃপা করুন। আপনার ধুনীর উধি কিছুটা দিয়ে দিন।"

"উধি! উধি দিয়ে এ রোগীর কোন্ কাজ হবে? আচ্ছা বেশ, চাচ্ছো যখন নিয়ে যাও।"

বাবার সর্ব্বরোগহর ধুনীভস্ম নিয়া তো রোগীর গায়ে তখনি তিনি লেপন করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই হইল না। অবস্থা বরং ক্রমেই আরো সঙ্কটাপন্ন হইতেছে।

সে রাত্রে রোগীর অন্তিম দশা উপস্থিত। একটি আত্মীয় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বাবাকে এ সংবাদ দিল।

উত্তরে তিনি কহিলেন, "ভয় পেয়োনা, সে তো মরতে পারে না! দেখ্‌বে, কাল সকালেই সে নব জীবন লাভ ক'রেছে।"

বাবার নিজের মুখের কথা, কিছু অবিশ্বাস করিবার নাই। লোকটি আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

পরবর্ত্তী সংবাদ কিন্তু বড় মর্ম্মান্তিক। শোনা গেল, ভোর না হইতেই রোগী ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

হার্দার শেঠজী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। সাইবাবা তাঁহাদের প্রার্থনা তো মঞ্জুর করেন নাই, বরং মিথ্যা আশা দিয়া ভুলাইয়াছেন।

এখন হইতে বাবাকে দর্শনের উৎসাহ তাঁহাদের অন্তর্হিত হয়, প্রায় তিনবৎসর শিরডিতে তাঁহারা আর আসেন নাই।

ইহার পর হঠাৎ একদিন মৃত ব্যক্তিটির এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাবাকে স্বপ্নে দর্শন করেন।—গম্ভীর বদনে তিনি দণ্ডায়মান। সম্মুখে যক্ষারোগে মৃত লোকটির দেহ পড়িয়া আছে, আর সাইবাবা তাহার বক্ষের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইতেছেন। রোগীর দেহের ফুসফুসটি একেবারে গলিয়া পচিয়া গিয়াছে। সে এক বীভৎস

দৃশ্য ! সাইবাবা তখন তাঁহাকে বলিতেছেন, "এবার বুঝতে পাচ্ছো তো, কি প্রাণান্তকর যন্ত্রণার হাত থেকে ওকে আমি সেদিন মুক্তি দিয়েছি।"

স্বপ্নদর্শনকারীর মনে পড়িল, মৃত্যুর আগে সাইবাবা আশ্বাস দিয়াছিলেন—রোগী নবজীবন লাভ করিবে। এবার তিনি বুঝিলেন, যে জীবনের কথা বাবা বলিয়াছেন, তাহা মানুষের জৈব-জীবন নয়, সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও বিরতির উর্ধ্বে কার শাশ্বত জীবন।

মরজীবনের কত সমস্যা নিয়া অমর জীবনের কত পথ-নির্দ্দেশের আবেদন নিয়া সাইবাবার কাছে আর্ত্ত মানুষেরা ছুটিয়া আছে। সদাই তিনি তাহাদের ঠেলিয়া দেন প্রকৃত কল্যাণের দিকে, অধ্যাত্মজীবনের সংগঠন ও পূর্ণতার দিকে। যে যেমন সাধনার উপযুক্ত সেই সাধনাই তাহাকে প্রদান করেন।

কিন্তু মুমুক্ষা ও পারলৌকিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়া কয়জনই বা উপস্থিত হয় ? যাহারা আসে, তাহাদের মধ্যে রোগ শোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ, ঐহিক-সুখ প্রত্যাশী দুর্ব্বল মানুষই বেশী।

বাবাকে প্রায়ই আক্ষেপ করিতে শুনা যেত, "আমার কাছে ছুটে আসে কাকের মত দু'টুক্‌রো নোংরা পচা পরিত্যক্ত মাংসের লোভে, আসে তাদের ঐহিক সুখের জন্য। কই, রাজহংসের মত জ্ঞান-মুক্তোফল কুড়োতে কয়টি লোক এখানে আসে ? অধ্যাত্মলোকের পরম শান্তি, আনন্দ ও জ্ঞানের প্রত্যাশী হ'য়ে আস্‌তে ক'জনকে দেখা যায় ?"

কৌতূহলী দর্শনার্থী ও ত্যাগ-তিতিক্ষাহীন জিজ্ঞাসুরাই বেশী ভীড় জমায়। আর বাবাও বার বার দক্ষিণা চাহিয়া ইহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। এই দক্ষিণা বা প্রণামী গ্রহণের উদ্দেশ্যটি নিজেই তিনি একবার ব্যাখ্যা করেন। ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া বলেন, "একটা কথা তোমরা জেনো, কারুর কাছ থেকে যদি এক টাকা দক্ষিণা আমি

গ্রহণ করি, এর বদলে তাকে দশ টাকা ফিরিয়ে দিতে আমি বাধ্য। ফেরৎ দেবার সম্ভাবনা না থাকলে কোন অর্থ আমি কখনো নিইনে। আমি কিন্তু নির্ব্বিচারে যার-তার কাছ থেকে দক্ষিণা দাবী করিনে, ঈশ্বর যার কাছ থেকে নিতে বলেন, শুধু তার কাছ থেকেই নিই। ঈশ্বরের কাছ থেকেই যে এ দক্ষিণার টাকা পাওয়া যায়। জেনে রেখো, যা কিছু যখনই তুমি দান ক'রবে তাই হবে ক্ষেতে বীজ বপন করার মত। প্রচুর ফসল এতে ফলবেই।

"বিত্ত বিষয় ও টাকাকড়ি যে শুধু ধর্ম্মকর্ম্মেরই জন্য। যদি কেউ নিজ প্রয়োজনেই কেবল এসব খরচ করে, তবে যে ধনপ্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হয়ে যায়। আর একথাও সত্য যে, আর এক জন্মে তুমি টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়েছ বলেই এবার দক্ষিণার দাবী তোমার ওপর করা হচ্ছে। বড় দান আগে ক'রেছ বলেই না দক্ষিণা দেবার অধিকার এবার জন্মালো! তা ছাড়া, এই দক্ষিণা দানকে উপলক্ষ ক'রেই কি বৈরাগ্য এগিয়ে আসে না? এই বৈরাগ্য থেকেই তো পাওয়া যায় প্রকৃত ভক্তি আর জ্ঞানের আস্বাদ।"

কপটাচারী জিজ্ঞাসুদের বাহিরের মুখোসটি অনেক সময় তাঁহার দক্ষিণার চাপে খসিয়া পড়িত। এ কাজ তিনি করিতেন শুধু দর্শনার্থী ও ভক্তদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর করার জন্য।

সে-বার বোম্বাই হইতে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি সাইবাবার দর্শনে আসিয়াছেন।

কাছে বসিয়া আব্দারের সুরে বার বার তিনি বলিতেছেন, "বাবা, বড় আশা ক'রে, বহু কাজকর্ম্মের ক্ষতি ক'রে, এতদূর থেকে আপনার কাছে এলাম। শুনেছি, আপনার যোগশক্তির সীমা নেই। আপনার প্রসাদে আশ্রিত ভক্তদের নাকি তাড়াতাড়ি ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়। কৃপা ক'রে আমায় আজ ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দিন।"

ভদ্রলোকটির নাকি বড় ত্বরা, যে টাঙ্গা-গাড়ীতে আসিয়াছেন

দরজার পাশেই তাই রাখিয়া দিয়াছেন। মনে আশঙ্কা, এখানে যত বেশী দেরী হইবে টাঙ্গার ভাড়াও তত বাড়িবে। তাই কিছুক্ষণ পর পরই তাগাদা দিতেছেন, "বাবা, তা'হলে আমার দিব্য দর্শনটি এবার সম্পন্ন করিয়ে দিন।"

সাইবাবা প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ বেটা, সেজন্য চিন্তা নেই, এখনি আমি তোমায় ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দিচ্ছি। আর বেশ পরিষ্কার-ভাবেই সব কিছু তুমি দেখতে পাবে। সত্যই তো! কত লোক এখানে যাতায়াত করে; কিন্তু তারা সবাই আসে শুধু টাকাকড়ি, ক্ষমতা, সম্মান, স্বাস্থ্য এসবের লোভে। বেটা, তোমার মত কেউ আসল বস্তুটি পেতে এমন ব্যাকুল হয় না।"

সাইবাবা এবার ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা সুরু করিলেন। —সৃষ্টির মূলে শুধু রহিয়াছেন তিনিই। এ জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহারই মায়ার খেলা। এ মায়ার বন্ধন কাটানো, পুনর্জ্জন্ম এড়ানো, গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের অবতারণাও একটির পর একটি তিনি করিতেছেন।

নবাগত ধনী দর্শনার্থী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না। কখন তাঁহার কথা শেষ হইবে অধীর হইয়া তাহাই শুধু ভাবিতেছেন।

হঠাৎ একটি বালককে ডাকিয়া সাইবাবা কহিলেন, "ওরে, এখনি আমার পাঁচটা টাকার বড় দরকার। যা তো, ছুটে গিয়ে নন্দলাল মাড়োয়ারীর কাছ থেকে টাকা ক'টা নিয়ে আয়।"

বালকটি ফিরিয়া আসিয়া জানায়, নন্দলালকে পাওয়া যায় নাই, সে কোথায় কার্য্যান্তরে গিয়াছে। বাবা তখনি গ্রামের আর একটি সম্পন্ন লোকের কাছে টাকার জন্য পাঠাইলেন। এভাবে আরো বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া গেল।

ভদ্রলোকটির আর অপেক্ষা করার উপায় নাই। টাঙ্গাওয়ালা বার বার খবর দিতেছে। বলা বাহুল্য, ভাড়ার অঙ্কও বিলম্বের অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

সাইবাবার যত অদ্ভুত কাণ্ড! অনর্থক পাঁচটা টাকার জন্য হৈ-চৈ শুরু করিয়াছেন এ টাকাটা নিজের পকেট হইতে দিয়া দিবেন কিনা ইহাও ভদ্রলোক চিন্তা করিলেন। কিন্তু মনে ভয়ও আছে। বাবার যেমন ধরণ ধারণ, সহজে যে এ টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে তাহা বোধ হয়না। তাই তিনি এতক্ষণ উচ্চবাচ্য করেন নাই।

শেষবারের মত তিনি অনুরোধ জানাইলেন, "বাবা, এবার তবে কৃপা ক'রে আমায় ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দিন। একটু তাড়াতাড়িই করুন, আমার যে আজই বম্বেতে ফেরা চাই।"

"ওহে, সেই চেষ্টাই তো এতক্ষণ ধরে করছি। এখানে বসে থেকেই যাতে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে। বেটা তুমি কিছুটা এখনো কি উপলব্ধি করতে পারোনি?"

"না বাবা, তেমন কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"তা হ'লে জেনে রাখো, আমি পাঁচটি টাকাই চাই—আর এ পাঁচ টাকা তোমাদের রূপোর টাকা নয়, এ হচ্ছে আমার কাছে চিরতরে পাঁচটি বস্তুর সমর্পণ। আমার দাবী হচ্ছে পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আর মন, বুদ্ধি অহংবোধ ইত্যাদির ওপর। বেটা, ব্রহ্মলাভের পথ বড় দুর্গম, সকলের পক্ষে এ পথ অধিগম্য নয়। বিত্ত, মানসম্মান কোন কিছুর জন্য আকর্ষণ থাকলে চলবেনা। কায়মনপ্রাণ দিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা ক'রতে হবে, তবে আবির্ভাব হবে জ্যোতির্ম্ময় পরমতমের।"

লোকটি স্থান ত্যাগ করিল। এবার সাইবাবা স্মিতহাস্যে ভক্তদের বলিলেন, "ওর পকেটে কিন্তু আড়াইশ' টাকা রয়েছে। অথচ ত্যাখো, কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি! মুক্তপথের সন্ধান যিনি দেবেন তাঁর জন্য পাঁচ টাকা ব্যয় করতেও সম্মত নয়। আসল কথা কি জানো, আগে বড় বস্তু পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হও, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোল, তারপর তার দিকে হাত বাড়াও।"

ভক্ত, শিষ্য ও দর্শনার্থীদের মনের কোন গোপন কথাই সাইবাবার

অজ্ঞাত থাকিতনা। অন্তর্য্যামী মহাপুরুষের দূরসন্ধানী দৃষ্টি মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া প্রবেশ করিত।

সেদিন একটি কুষ্ঠরোগী সাইবাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। পরণে তাহার জীর্ণ ময়লা কাপড়, হাতে একটি পুঁটলি। লোকটির রোগের অবস্থা বড় গুরুতর। সারা অঙ্গে গলিত ঘা, দুর্গন্ধে কাছে কাহারো দাঁড়াইবার উপায় নাই।

মিসেস ম্যানেজার্স নামে একটি ভক্ত মহিলা বাবার ধুনীর পাশেই বসিয়া আছেন। বিকট দর্শন রোগীটিকে দেখিয়া তাহার মনে জাগিল অস্বস্তি ও ঘৃণা। তাড়াতাড়ি দুর্গন্ধের জন্য তখনি নাকে কাপড় গুঁজিয়া দিলেন। মনে মনে মহিলাটি ভাবিতেছিলেন, "না, আর সহ্য করা যায় না। শিগ্‌গীর এ আপদ বাবার কাছ থেকে বিদেয় হ'লে বাঁচি।" লোকটি স্থান ত্যাগ করিলে তিনি হাঁফ ছাড়িলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই সাইবাবার দিকে মুখ ফিরাইয়া মিসেস্ ম্যানেজার্স দেখিলেন, তাঁহারই দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। ক্ষোভ আর রোষ সে দৃষ্টিতে জড়ানো। মহিলার মনে ভয় হইল,—সর্ব্বনাশ, তাঁহার এ চিন্তা তো বাবার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

মিসেস ম্যানেজার্স এঘটনাটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দর্শনার্থীটি বেশী দূর যায় নাই' বাবা হঠাৎ বড় ত্রস্তব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য এক সেবককে পাঠাইয়া দিলেন। রোগীটি প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রোগের জ্বালায় সে ধুঁকিতেছে, গলিত কুষ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ। প্রণাম করা মাত্রই বাবা তাঁহার হাত হইতে পোঁটলাটি টানিয়া নিলেন এতে কি রয়েছে হে—ব'লে নিজেই উহা খুলিয়া ফেলিলেন। উহাতে জড়ানো রহিয়াছে কয়েকটি পেঁড়া, খাওয়ার জন্য সে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছে। একটি পেঁড়া তুলিয়া নিয়া বাবা আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন—এত লোক সেখানে উপস্থিত, কিন্তু দিলেন শুধু আমাকেই। বলিলেন, "ব্যস্, এবার এটা তুমি খেয়ে ফেল দেখি।"

মিসেস ম্যানেজ্জাস´ আরো লিখিয়াছেন, "আমার আজ একি অদ্ভুত পরীক্ষা? এই ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগীর পোঁটলায় জড়ানে খাবারই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে? কিন্তু অমান্য করারও যো নাই। এ যে সাইবাবার আদেশ। অগত্যা আমাকে ইহা গলাধঃকরণ করিতে হইল, বাবাও উহা হইতে এক টুকরা পেঁড়া উঠাইয়া নিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর বাকী পেঁড়াগুলো ঐ পোঁটলাতে ভরিয়া দিয়া লোকটিকে বিদায় দেওয়া হইল।

"কেনই বা সাইবাবা লোকটিকে ফিরাইয়া আনিলেন, কেনই বা তাহার পেঁড়া এভাবে আমাকে খাওয়ানো হইল—ইহার মর্ম্ম সেখানকার আর কেহই সেদিন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু আমি স্পষ্টরূপেই বুঝিলাম, বাবা আমার অন্তরের প্রতিক্রিয়া টের পাইয়াছেন, আর বিশেষ করিয়া আমাকেই তিনি শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। শিক্ষার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে উপলব্ধি করাইতে চাহিয়াছেন সমদর্শিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহনশীলতা। তাঁহার ঐ আচরণের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এক মহান তত্ত্ব। সীমিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষার যে চেষ্টা আমরা করি তা দুর্ব্বলেরই চেষ্টা, সাইবাবার মত মহাপুরুষের আশ্রয় ও দাক্ষিণ্য তাহা হইতে অনেক বেশী কার্যকরী, এই কথাই তিনি সেদিন আমায় বুঝাইয়া দিলেন।"

ভক্ত নানা সাহেব সেদিন শিরডিতে আসিয়াছেন। বেলা তখন প্রায় বারোটা, গ্রীষ্মের এই দুঃসহ সূর্য্যতাপে লোকে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

শান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর নানাসাহেব ভাবিলেন, বাবার চরণ দর্শনের পর কোন এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া ভোজন ও বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু সাইবাবা তাহা করিতে দিলেন কই?

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলার পর খেয়ালী মহাপুরুষ বলিয়া বসিলেন, "নানা তুমি আজ আমার জন্য কিছুটা পূরণ-পোলি তৈরী করাও।

এ বস্তু খাবার জন্য আমার বড় সাধ হয়েছে। হ্যাঁ, তুমি এক্ষুণি তৈরী করিয়ে নিয়ে এসো।"

কড়াই-ডাল,নারিকেল, গম আর চিনিতে তৈরী হয় এই পিঠা। হঠাৎ এই পোলির রসাস্বাদনের জন্য বাবা কেন এত উৎসাহী হইয়া উঠিলেন কে জানে ?

নানা সাহেব মৃদু আপত্তি উঠান, "বাবা, এবার যে আমার সঙ্গে রসুইকর বা ভৃত্য কেহ আসেনি। কে এসব তৈরী ক'রবে ?"

কিন্তু সাইবাবা ছাড়িবার পাত্র নন। কহিলেন, "না বাবা, এ বস্তু খাবার জন্য আজ আমার বড় তীব্র ইচ্ছে জেগেছে। যে ক'রেই হোক্, তুমি এটা তৈরী করাও।" অগত্যা একটি রসুইয়া ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া নানাসাহেব পবিত্রভাবে এক গাদা পুরণ-পোলি তৈরী করাইলেন। একটি হাঁড়িতে পুরিয়া এগুলি বাবার সম্মুখে রাখা হইল।

কিন্তু একি কাণ্ড ? ভোজন করা দূরে থাক্, বাবা এগুলি স্পর্শও করিলেন না। একবার মাত্র হাঁড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বাঃ বাঃ, বেশ সুস্বাদু হয়েছে এগুলো। এবার নিয়ে যাও, তোমরা সবাই আনন্দ ক'রে খাও।"

নানা সাহেব বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এত বেলা অবধি তাঁহার স্নানাহার হয় নাই, কষ্ট করিয়া এগুলি তৈরী করাইয়াছেন। আর তিনি কিনা একবার স্পর্শও করিলেন না।

ক্ষোভের সহিত কহিলেন, "বাবা এত হৈ-চৈ ক'রে পুরণপোলি তৈরী করিয়ে আপনি একটাও মুখে দিলেন না! আপনার যা অভিরুচি হয় করুন। কিন্তু আমরা এ বস্তু কেউ খেতে পারবো না।"

"সে কি কথা! আমি যে এগুলো এইমাত্র খেলাম। এখন তোমরা সবাই মিলে খাও।"

"আপনি খেয়েছেন! কখন ? সবই তো তেমনি পড়ে রয়েছে। একটাও তো আপনি স্পর্শ করেন নি। না—আমরা কিছুতেই এ পিঠে খাবোনা।"

ক্রোধে নানা সাহেব সাইবাবার কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি আজ কোন আহার্য্যই গ্রহণ করিবেন না।

মহাপুরুষ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। শান্তধীরস্বরে কহিলেন, "নানা, আমি ভাব্‌ছি, আঠারো বৎসর তুমি আমার সান্নিধ্যে রয়েছো। কিন্তু এতদিন তুমি আমায় কিছুই কি বুঝতে পারোনি?

"আমার এই স্থূল দেহ আর এই দেহের সীমাটাকেই তুমি বড় ক'রে দেখলে? 'বাবা' বল্‌তে কি এই সাড়ে-তিন-হাত মানুষটাকেই তুমি বোঝ? এ ছাড়া আর কোন বৃহত্তর সত্তা তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি? যে কোন আকারই যে আমি ধরতে পারি। যে কোন ভাবে আমি আমার আহার সমাধা ক'রতে পারি। এ সত্য কি তোমার উপলব্ধিতে এখনো আসেনি? বহুক্ষণ আগে পূরণ-পোলির স্বাদ আমি গ্রহণ ক'রেছি। এবার এগুলো সরিয়ে নাও, তোমরা ভোজনে ব'স।"

নানা সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের উদ্দেশ্যেই বাবার আজিকার এই পিঠা ভোজনের আগ্রহ। অতঃপর লজ্জিত হইয়া তিনি ভোজনে বসিলেন।

বি, ভি, দেব সাইবাবার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। শিরডি হইতে দূরে দাহানু নামক এক স্থানে তিনি তখন অবস্থান করিতেছেন। সেবার তিনি সাড়ম্বরে এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, সাইবাবাও এ উৎসবে উপস্থিত থাকেন। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া এজন্য কয়েকটি পত্রও তিনি বাবাকে এ সময়ে প্রেরণ করেন।

সাইবাবা উত্তর জানান, তিনি নিশ্চয়ই এ উৎসবে উপস্থিত হইবেন, সঙ্গে তাঁহার আরো দুইজন ভক্ত থাকিবে।

এ সংবাদ পাইয়া ভক্তটির আনন্দের আর সীমা নাই। উদ্যোগ আয়োজনের কোন ত্রুটিই তিনি রাখিলেন না।

উৎসবের দিন দেখা গেল, সাইবাবা আসেন নাই। কিন্তু একটি অপূর্ব্বদর্শন সন্ন্যাসী হঠাৎ সেখানে দুইটি সেবক সঙ্গে নিয়া উপস্থিত। শ্রীদেবকে তিনি কহিলেন, "আমরা এখানে শুধু ভোজন ক'রবো। টাকাকড়ি বা আর কিছুই আমাদের প্রয়োজন নেই।"

সন্ন্যাসীরা আহারান্তে চলিয়া গেলেন। সেদিনকার উৎসব-অনুষ্ঠানও ভালভাবে উদ্‌যাপিত হইল।

সাইবাবার ভক্তটির মনে খেদ কিন্তু যায় নাই। তিনি খুব দুঃখ করিয়া চিঠি দিলেন—কই, বাবা তো তাঁহার কথা রাখিলেন না। মহোৎসবে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তকে তিনি শুধু বঞ্চনাই করিলেন।

চিঠিটা পড়িয়া সাইবাবাকে শুনানো হইল। তিনি সেবককে কহিলেন, "দেবকে এর উত্তর লিখে দাও, আমি দুজন সঙ্গী নিয়ে সাধুর বেশে তার ওখানে ঠিকই গিয়েছিলাম। ভোজন ক'রেও এসেছি, কিন্তু সে আমায় চিনতে পারেনি। সে যেন মনে ক'রে ছাখে, আমি তাকে সেখানে বলেছিলাম—শুধু খেতেই আমি এসেছি, টাকাকড়ির জন্য নয়।"

ভক্ত চিদম্বর কেশব গ্যাড্‌গিল রেলওয়ের একজন কর্ম্মচারী। হঠাৎ একদিন উপর হইতে তাঁহার বদ্‌লির আদেশ আসিয়া পড়িল। বড় জরুরী কাজ, অবিলম্বে নূতন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হওয়া চাই।

গ্যাড্‌গিলের মনে কিন্তু বড় দুঃখ, নূতন জায়গায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাবার দর্শন লাভ তাঁহার ভাগ্যে হইল না।

বিষণ্ণ বদনে সেদিন তিনি তাঁহার বাসায় বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, শূন্য হইতে একটি ক্ষুদ্র কাগজের পোঁট্‌লা তাঁহার গায়ে-জড়ানো চাদরটির উপর আসিয়া পড়িল। কি ব্যাপার? কে এভাবে ঢিল ছুঁড়িতেছে? পোঁটলাটি তাড়াতাড়ি খুলিতেই চোখমুখ তাঁহার আনন্দের আভায় ঝলমল করিয়া উঠিল।

এ যে সাইবাবার সেই চির পরিচিত স্নেহচিহ্ন, উধি বা ধুনী-ভস্ম! সুদূর শিরডি হইতে মহাপুরুষ ইহা তাঁহার অলৌকিক শক্তি বলে প্রেরণ করিয়াছেন! গ্যাড্‌গিলের দুই নয়ন বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুদিন পরে অবসর পাইয়া তিনি শিরডিতে আসিয়াছেন। সাইবাবা স্নেহভরা কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, সেদিন আমায় দর্শন ক'রতে না পেরে মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলে! তাই তো ঐভাবে উধির পোঁটলাটা তোমার কাছে পাঠানো হ'ল।"

সঙ্গে সঙ্গেই পার্শ্বে উপবিষ্ট সেবক কুশভাব-এর দিকে ফিরিয়া বাবা বলিয়া উঠিলেন, "কুশভাব, সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে যদি তোমরা আমায় ভাবতে পারো, তবে যত দূর দেশেই আমি থাকিনে কেন, জান্‌বে—আমি তোমাদের অতি নিকটেই অবস্থান করছি।"

ইহার পর ভক্তপ্রবর কুশভাব-এর জীবনে সাইবাবার কৃপার বহু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। নানা সঙ্কটে পড়িয়া আন্তরিক ভাবে যখনি তিনি তাঁহার কথা চিন্তা করিয়াছেন তখনি তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ করপুটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মহাপুরুষের ধুনী-ভস্মের একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী। অন্তর তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ভক্তদের প্রতিটি কর্ম্ম, প্রতিটি আচরণ ও চিন্তার উপর সাইবাবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিতেন। কখনো ভৎসনায়, কখনো আশ্বাস ও প্রবোধ বাক্যে তাহাদের অধ্যাত্ম-জীবনের গতিপথে আনিয়া দিতেন অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!

সেদিন তিনি শায়িত রহিয়াছেন। একটি সেবক-ভক্ত আসিয়া সংবাদ দিল, দুইজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা তাঁহার দর্শন চান।

বাবাব পাশেই অন্তরঙ্গ ভক্ত নানা সাহেব উপবিষ্ট। তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পর্দ্দানসীন মহিলারা তাঁহার সম্মুখে হয়তো বিব্রত বোধ করিবেন।

সাইবাবা বলিয়া উঠিলেন, "না হে, নানা তুমি এখানেই ব'সে থাকো। আমার দর্শনে যারা আসবে, তারা আমার ভক্ত পরিবেষ্টিত রূপই দেখবে। নতুবা তারা চলে যেতে পারে।"

নানা সাহেব পাশেই বসিয়া আছেন। মহিলা দুইটি বাবার সম্মুখে আসিয়া শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিলেন। ইঁহাদের একজন তরুণী এবং পরমা সুন্দরী। মুখের অবগুণ্ঠনটি হঠাৎ তিনি তুলিয়া ধরিলেন। এক অদ্ভুত রূপের চমক এই নারীর মধ্যে। নানা সাহেব মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, মনে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়, শুধু আর একটিবার কি এই রূপসীর মুখখানা দেখা যায় না? আবার কি অবগুণ্ঠনটি উন্মোচিত হইবে?

হঠাৎ সাইবাবা তাঁহার দীর্ঘ হাতখানি প্রসারিত করিয়া নানা সাহেবের জানুতে একটি ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তের চিন্তায় ছেদ পড়িল। চকিতে তিনি সজাগ হইলেন। কি সর্ব্বনাশ! অন্তর্য্যামী পুরুষ সাইবাবার সম্মুখে বসিয়া তিনি একি সব বাজে চিন্তা করিতেছেন!

দর্শনের পর মহিলাদ্বয় চলিয়া গেলেবাবা কহিলেন, "নানা, তুমি কি বুঝতে পেরেছ, কেন তখন আমি তোমায় চপেটাঘাত করেছি?"

"বাবা আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনার কাছে কোন কিছু গোপন করা বৃথা। কিন্তু বাবা, সত্যই এ ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে যে, আপনার মত মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ব'সে থেকেও আমার মনে এরকম সব চিন্তা জেগে ওঠে।"

বেটা, এরকম মাঝে মাঝে হবে এতে এমন আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তুমি মানুষ, রক্তে মাংসে গড়া মানুষই তুমি। দেহে ও মনে কত কামনা বাসনা জড়িত রয়েছে—লোভের বস্তু দেখলেই তা উচ্চকিত হয়ে ওঠে, লুব্ধ হয় "

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মহাপুরুষ আবার বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা বেটা, পৃথিবীতে তো কারুকার্য্য খচিত, মনোরম কত মন্দিরই

রয়েছে, কিন্তু আমরা তা দেখতে যাই বাইরের সৌন্দর্য্য দেখতে, না, ভেতরকার পবিত্র বিগ্রহ দেখতে? আরো ছাখো, ভগবান তো কেবল ঐ সব মন্দিরেই অবস্থান করেন না, বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে তিনি রয়েছেন ওতপ্রোত। বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না ক'রে এই অন্তরচারী পরম সত্তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে, ভগবানকে খুঁজে বার ক'রতে হবে।"

"অবশ্য ঈশ্বরের রচিত যে কোন বস্তুর বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাবার অধিকার তোমার ঠিকই রয়েছে। কিন্তু রূপ ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় ভাবতে হবে—কি বিস্ময়কর শক্তি কি অপরূপ শিল্পচাতুর্য্য তাঁর, যিনি এ সব বস্তু সৃষ্টি ক'রেছেন। এমন সৌন্দর্য্যের আধার যিনি তৈরী ক'রেছেন, না জানি তিনি নিজে কত সুন্দর, কত মহিমময়। আধেয় রূপে কত না মনোহরণ বেশে সেই রমণীয় আধারে তিনি বিরাজ ক'রছেন।

"শোন নানা, তোমার রূপদর্শনের ইচ্ছেকে তুমি যদি এভাবে চালিত ক'র্‌তে শিখ্‌তে, তা'হলে ঐ দর্শনার্থিনী রূপসীর মুখখানা আর একবার দেখবার জন্য তুমি এতো লুব্ধ হ'তে না। আমার আজ্‌কের কথাগুলো ভাল ক'রে স্মরণ রেখো।"

ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে ধনাভিমান কখনো যাহাতে জাগ্রত না হয় সেজন্য সাইবাবার সতর্কতার অন্ত ছিলনা।

নানা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে একবার তিনি উপদেশ দেন, "ছাখো, কোন দুঃখী লোক্ যদি কখনো কিছু ভিক্ষা চায়, সাধ্যমত তা দেবার চেষ্টা ক'রবে। আর দেবার শক্তি যদি তোমার না থাকে তবে প্রার্থীকে সে কথা অকপটে মধুরভাবে বুঝিয়ে ব'লবে। গরীব ব'লে কখনো ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রানো, অথবা চটে যেয়োনা।"

স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিলেন, বাবার কথা তাঁহারা অবশ্য স্মরণ রাখিবেন।

কিন্তু নানা সাহেব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। শিরডির কাছাকাছি রহিয়াছে কোপারগাঁয়ের দত্তাজীর মন্দির। এক বিশিষ্ট সাধু এই মন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন। ইঁহাকে নানা সাহেব সে-বার কথা দেন, মন্দিরের সিঁড়ি নির্ম্মাণের জন্য কয়েক শত টাকা তিনি দিবেন। ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত থাকায় সে অর্থ আজ অবধি দেওয়া হয় নাই।

সেদিন নানা সাহেব বাবার দর্শনের জন্য শিরডিতে আসিতেছেন। পথেই পড়ে দত্তাজীর মন্দির। বরাবরের অভ্যাস, বিগ্রহের পূজা দিয়া তবে তিনি এপথে অগ্রসর হন। কিন্তু এবার মনে সঙ্কোচ হইল, কারণ, মন্দিরের সাধুটিকে কথা দিয়া তাহা রাখিতে পারেন নাই। তাঁহাকে এড়ানোর জন্য মন্দিরের পথে না গিয়ে অপর এক ঘুর্-পথে তিনি শিরডিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সাইবাবাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া নানা সাহেব তাঁহার পদ প্রান্তে বসিয়াছেন। কিন্তু আজ মহাপুরুষের একি অদ্ভুত ব্যবহার? চিরাচরিত হাসটি তাঁহার মুখে নাই। দেখা হইলেই সোল্লাসে যরূপ স্বাগত সম্ভাষণ করেন তাহাও এবার দেখা যাইতেছেনা। বাবা বড় গম্ভীর ও রুষ্ট।

নানা সাহেব বিষণ্ণ মনে কহিলেন, "বাবা, আজ আমার এমন দুর্ভাগ্য কেন? কোন কথাই আপনি বল্ছেন না।"

উত্তর হইল, "যারা কথা দিয়ে তা রক্ষা করেনা, তাদের সঙ্গে আমি কোন বাক্যালাপ ক'রতে চাইনে।"

"সে কি বাবা, আমি তো নিজ সামর্থ্যমত প্রতিশ্রুতি রাখ্বার চেষ্টা সর্ব্বদাই করি।"

"তবে তুমি আজ ভগবান দত্তজীর মন্দির এড়িয়ে দূরের পথ দিয়ে এখানে এলে কেন? কোপারগাঁয়ের সাধুর কাছে কথা দিয়েছেলে, মন্দিরের সোপান তৈরীর জন্য তিনশ' টাকা তুমি দেবে। এভাবে বুঝি তা রাখতে চেষ্টা ক'রছো? সামান্য ক'টা টাকার জন্য দেববিগ্রহও

দর্শন ক'রলে না? এমন নীচমনা লোক যারা তাদের সঙ্গে কথা বলতে সত্যই আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

বহু অনুনয় বিনয়ের পর সেযাত্রা নানা সাহেব তাঁহার ক্ষমা লাভ করিলেন।

দীন-দরিদ্র ভিখারীদের সহিত ভক্তেরা যাহাতে সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করে সে জন্য সাইবাবার সতর্কতার অন্ত ছিল না। নানা সাহেবকে একদিন তিনি বলিলেন, "ছাখো নানা, কোন ভিক্ষুক যদি তোমার কাছে খাবার বা অর্থ চায়, তোমার সাধ্যমত তাকে দেবার চেষ্টা ক'রো। কোন সময়েই তার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করবেনা, কখনো ক্রুদ্ধও হবেনা।"

সাইবাবার এ উপদেশ বিস্মৃত হইয়া নানা সাহেব আর একদিনও এমনি এক বিপদে পড়েন। সেদিন এক ভিখারী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত। নানা সাহেবের স্ত্রী তাঁহার ঝুলিতে অনেকটা পরিমান খাদ্যশস্য ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু লোকটি বড় নাছোড়বান্দা, তাঁহাকে একেবারে সে পাইয়া বসিয়াছে। আরও অনেক বেশী ভিক্ষার জন্য বারবার সে দাবী জানাইতে থাকে। না পাইলে একপাও এখান হইতে সে নড়িবে না।

নানা সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। নিজের পিওনকে দিয়া তখনি ভিখারীটিকে বাড়ীর বাহিরে করিয়া দিলেন।

অন্তর্য্যামী সাইবাবার কাছে ভক্তের গৃহের এই ঘটনাটি অজ্ঞাত রহে নাই। নানা সাহেব আসিবামাত্র তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "ছাখো, আমার উপদেশ যদি না শোন, তবে তা আমার কাছে আসবার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। দরিদ্র ভিখারী সেদিন দায়ে পড়েই তোমার কাছে গিয়ে শরণ নিয়েছিল! পিওন ডেকে কেন তাকে এভাবে অপমান ক'রে তাড়ালে। তোমার সরকারী চাকুরীর আস্ফালন এমন ক'রে না দেখালেই কি চলতো না! তুমি ভদ্রভাবে

চুপ ক'রে থাকলেই তো পারতে। প্রার্থী কিছুক্ষণ বাদে নিজেই সেখান থেকে চলে যেতো।"

নিজের ত্রুটির কথা মনে করিয়া ভক্তপ্রবর লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তারপর বাবার করুণাঘন মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া চোখে তাঁহার জলও আসিল। তাঁহার মত নগণ্যতম ব্যক্তির দৈনন্দিন আচরণের দিকেও বাবার দূরসন্ধানী দৃষ্টিটি নিবদ্ধ রহিয়াছে, এ যে সত্যই তাঁহার এক পরম সৌভাগ্য!

সাইবাবার মতে, আত্মসমর্পণ যোগ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাধনা। যোগশক্তির নানা বিস্ময়কর পরিচয় তিনি নিজের জীবন ভরিয়া দিয়া গিয়াছেন, যোগসাধনপ্রার্থী ভক্ত ও শিষ্যদের বহু জটিল সমস্যার সমাধানও তাঁহার কৃপায় কম হয় নাই। কিন্তু সাধনার দুর্গম, ক্ষুরধার পথে সাধারণ ভক্ত ও মুমুক্ষুদের তিনি চালিত করিতে চাহিতেন না। তাহাদের কাছে শুধু তুলিয়া ধরিতেন আত্মসমর্পণ যোগের কথাটি। বারবার করিয়া কহিতেন, "সদ্‌গুরুর বাক্যে ও তাঁর সত্তায় শুদ্ধ বিশ্বাস রাখতে শেখো, আর একৈকনিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যাও।"

সাধনজীবনে নিজের গুরুকে সাইবাবা অপরিসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, সে সব কাহিনী মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে শোনা যাইত।

নিজের গুরুর নাম কখনো কাহারো নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার উল্লেখ করিতেন ভেন্‌কুশ, এই ছদ্ম নামে।

অপরিমেয় যোগবিভূতি ছিল তাঁহার এই গুরুদেবের করতলগত। এই মহাত্মার করুণালীলার কথা বলিতে গিয়া সাইবাবার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত।

—তখন অল্পদিনের পরিচয়, গুরুজী ভেন্‌কুশ হঠাৎ একদিন এই তরুণ ভক্তের ধৈর্য্য গুরুনিষ্ঠার পরীক্ষা শুরু করিলেন। আশ্রমের

অনতিদূরে রহিয়াছে একটি পুরাতন কূপ। মোটা রজ্জুদ্বারা তাঁহার পা'দুটি গুরুজী বাঁধিয়া দিলেন। মস্তক রহিল নিম্নাভিমুখী। এভাবে তাঁহার দেহটি কূপের মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইল। রজ্জুর একাংশ রহিয়াছে নিকটস্থ এক বৃক্ষের ডালে বাঁধা, আর নীচে বালকভক্ত সাই-বাবার দেহটি কূপের অভ্যন্তরে ঝুলিতেছে। এ অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়া দিয়া গুরুজী কোথায় চলিয়া যান। তারপর চার পাঁচ ঘণ্টার পর তাঁহাকে ফিরিতে দেখা যায়। এবার কূপের উপরিভাগ হইতে প্রশ্ন করেন, বালকশিষ্য কেমন আছে? কিভাবে তাহার সময় কাটিতেছে?

সাইবাবা অবলীলাক্রমে উত্তর দিলেন, "গুরুজী, আপনার কৃপায় পরম আনন্দ সাগরে আমি নিমজ্জিত রয়েছি, কোন দুঃখ কষ্টই এখানে আমার নেই।"

এবার গুরুজী তাঁহাকে কূপ হইতে টানিয়া তুলিলেন। প্রসন্নতার দীপ্তিতে আননখানি তাঁহার উজ্জ্বল, পরমস্নেহে শিষ্যকে জড়াইয়া ধরিয়া বারবার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সাইবাবা তাঁহার গুরুদেবের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "একাদিক্রমে বারো বছর আমি গুরুজীর চরণতলে পড়েছিলাম। তিনি ধ্যানাবস্থায় বসে থাকলে, চোখে মুখে ফুটে উঠতো দিব্য জ্যোতির আভা। আমি এই মহিমময় পুরুষের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতাম, আনন্দরসে জীবনপাত্র ভরে উঠতো কানায় কানায়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি আমার ঈশ্বরপ্রতিম এই গুরুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম, ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ থাকতোনা, এমনি ছিল তখন ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাস। গুরুই ছিলেন আমার ধ্যান জ্ঞান, আমার জীবনের ধ্রুবতারা। একদিনের তরেও তাঁর অদর্শন আমি সইতে পারতুম না। সমগ্র দেহমনপ্রাণ একাগ্র হয়ে গুরুদেবের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকতো।

"আর আমার গুরুজীরও প্রেম ও করুণার সীমা ছিল না। আমিও যেমন তাঁর দিকে জীবনকে উন্মুখ ক'রে রেখেছিলাম, তিনিও তেমনি

অপার স্নেহে, অপার কৃপাবলে আমার ভেতর থেকে উৎসারিত ক'রে তুলতেন শ্রদ্ধা ভক্তি আর ভাগবত প্রেমের স্রোতধারা। গুরুজী প্রায়ই থাকতেন মৌনী, নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমার জীবনে ঘটতো নব নব রূপান্তর। গুরুকেই পরমার্থ ও অভীষ্ট বলে আমি জেনেছিলাম। পরম সত্য যে আমি তাঁর কৃপায়ই উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ হই। তোমরা সবাই জেনে রেখো—অধ্যাত্মসাধনার দুর্গম পথে গুরু শক্তিই ভরসা—কোন সাধনা, কোন শাস্ত্রই এর তুল্য নয়। সদ্‌গুরুতে বিশ্বাস, তাঁর পদে শরণ, গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ হচ্ছে সিদ্ধিলাভের প্রধান পথ।"

ভক্তদের ভাবাবেগ ও আতিশয্য দেখিলে সাইবাবা গোড়ার দিকে খুব তিরস্কার করিতেন। শেষের দিকে ইহা নিয়া আর তিনি তেমন মাথা ঘামইতেন না। একদল ভক্ত তাঁহার কপালে শ্বেত চন্দন লেপন করিয়া দিত। রোজ তাঁহাকে পূজা না করিয়াও কেহ কেহ স্বস্তি পাইত না। মহাপুরুষ নীরবে এসব সহ্য করিয়া যাইতেন।

দাদা-কেল্‌কার নামক এক ভক্ত সাইবাবাকে সে-বার প্রশ্ন করেন, "বাবা আপনি আগে আপনার কপালে চন্দন লেপন ক'রলে প্রতিবাদ ক'রতেন। এখন দেখছি, এসবে আপনার আপত্তি নেই। আমি এর মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারছিনে।"

"কি আর করবো বল? ডাক্তার পণ্ডিতের ধারণা, তার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-গুরু ঢোপেশ্বর কাকা-মহারাজ আর আমি নাকি একই ব্যক্তি। তাই পরম শ্রদ্ধায় রোজ সে চন্দন লেপন ক'রে দেয়, প্রতিবাদ ক'রে তাকে দুঃখ দিতে পারিনে।"

আবদুল রঙ্গরী নামে এক মুসসমান ভক্ত সাইবাবাকে বলিয়া বসিল, "বাবা বলুন তো আপনি কেন এমন ক'রে কপালে চন্দন মাখাবার অনুমতি দেন? আমাদের মুসলমানদের মধ্যে তো এই প্রথা নেই।"

মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "জানো, যেমন দেশ তেমন বেশ। হিন্দু

ভক্তেরা এ ভাবেই তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে চায়, তাদের তো আমি নিরানন্দ বা নিরুৎসাহ ক'রতে পারিনে। ভক্ত তার প্রাণের আবেগে, শ্রদ্ধায় প্রেমে অনেক কিছু অনুষ্ঠান ক'রতে চায়। তাকে বাধা দিই কি ক'রে? তা ছাড়া, আমি নিজেই যে এক ভক্ত, অপর ভক্তকে আমি যে ব্যথা দিতে পারিনে।"

হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন সাইবাবা। বহু লোক তাঁহাকে জানে দেবকল্প মহাসাধকরূপে, তাহাকে নিয়া সকলেরই মাতামাতি ও সাড়ম্বর অনুষ্ঠানেরও অন্ত নাই।

পরম শ্রদ্ধার বেদীতে স্থাপিত এই সর্ব্বজনপূজ্য মহাপুরুষের মধ্যেই আবার ফুটিতে দেখা যায় এক সর্ব্বজনপ্রিয় প্রেমঘন রূপ। সাইবাবার চরিত সঙ্কলয়িতা বি, ভি নরসিংহ স্বামী ইহার এক মনোরম কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

—১৯১৪ সাল। রামনবমীর উৎসব উপলক্ষে শিরডিতে সেদিন জড়ো হইয়াছে এক বিরাট জনসঙ্ঘ। দূর গ্রাম হইতে এক গরীব বৃদ্ধা রমণীও সেদিন সাইবাবার দর্শন লাভ করিতে আসিয়াছেন। নিকটে আসিতে না পারায় সে চেঁচাইতেছে, "ওগো, আমি অশক্ত বুড়ো মানুষ। তোমরা আমায় একটু সাহার্য্য কর। বাবা! বাবা! তুমি কোথায়? আমায় কৃপা ক'রে একবার দর্শন দাও।"

সাইবাবার ইঙ্গিতে এক সেবক তখনি ভীড় ঠেলিয়া বৃদ্ধাকে তাঁহার কাছে উপস্থিত করিল। মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। আবেগকম্পিত দেহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধা কেবলি কাঁদিতে লাগিল।

সাইবাবার নয়ন দুইটিও তখন অশ্রুতে ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যগ্র স্বরে তিনি কহিলেন, "মা, তুমি তা'হলে এসে পড়েছো? কতদিন ধরে তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি, ব্যাকুল হয়ে কাঁদছি। দাও, দাও আমার জন্য কি খাবার এনেছ, এবার তা সব বের কর।"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাহার ছিন্ন ময়লা পুঁটলীটি খুলিয়া ফেলিল। কহিল, "এই দ্যাখো বাবা, এতে রয়েছে এক টুকরো বাসি রুটি। অনেক দূর থেকে তোমার দর্শনের জন্য আসছি। পথে ক্ষিদে পেয়েছিলো, একটা নদীর ধারে বসে আধ খানা রুটি তাই আমি খেয়ে ফেলেছি। বাকীটা রয়েছে—ধর তুমি খাও।"

এ যে পরমাত্মীয়ের দেওয়া বস্তু—স্বতোৎসারিত স্নেহের উপহার! সাইবাবা তখনি মহা উৎসাহে উহা গ্রহণ করিলেন। চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন, "সত্যিই মা, কি চমৎকার রুটি তুমি এনেছ! খেয়ে কি তৃপ্তিই আমার হলো!"

ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তপুরুষ সাইবাবাকে নিয়া নানা কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। এক এক সময়ে এসব নিয়া তাঁহার ভক্তদের কম ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত না।

সেবার ধুলিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার আদালতে হাজির হইবার জন্য সাইবাবাকে এক শমন দিয়াছেন। স্বর্ণলঙ্কার চুরীর দায়ে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে অভিযুক্ত, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাইবাবাকে সে তাহার সাফাই সাক্ষী মানিয়াছে।

শমনটি হাতে দিবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁইবাবা উহা তাঁহার ধুনীর আগুনে ভস্মসাৎ করিলেন।

পেয়াদা ফিরিয়া গিয়া তাহার বিবৃতি দিল। এবার আসিল বাবার নামে এক ওয়ারেন্ট

মহাত্মা সাইবাবাকে সেদিন যেন এক দুষ্ট বালকের খেয়ালখুসীতে পাইয়া বসিয়াছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ বাজে কাগজ এখনি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

ফকীর সদাই থাকেন শত শত ভক্তে পরিবৃত, প্রভাব প্রতিপত্তির তাঁহার সীমা নাই। পুলিশ তাই সহসা একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করিতে চাহে না, ওয়ারেন্ট নিয়া তাহারা ধুলিয়ায় ফিরিয়া আসে।

এবার গ্রামের লোকেরা সমবেতভাবে এক যুক্ত আবেদন প্রেরণ

করে। জানায়, সাইবাবা একজন সংসারবিরাগী মুক্তপুরুষ, এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। বাবাকে আদালতে টানিয়া না নিয়া সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন নিয়োগ করা হোক।

এই আবেদন গৃহীত হইল। কমিশনার আসিয়া সাইবাবাকে প্রশ্ন করা শুরু করিলেন। এ প্রশ্নোত্তর শুধু কৌতূহলোদ্দীপকই নয়, সাইবাবার জীবনদর্শনের ইঙ্গিতও ইহাতে মিলে।

প্রশ্ন করা হইল, "আপনার নাম কি ?"

সাইবাবা উত্তরে কহিলেন, "এখানকার এরা আমায় সাইবাবা বলেই ডাকে।"

"আপনার পিতার নাম।"

"তাও সাইবাবা"

"আপনার গুরুর নাম কি ?"

"ভেন-কুশ"

"আপনি কোন্ ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তী ?"

"কবীর-পন্থী"

"আপনার জাতি ?"

"বলা যায় ঐশ্বরীয়"

"বয়স কত বলুন তো ?"

"লক্ষ লক্ষ বৎসর।"

"সতর্ক হয়ে কথা বলুন—এ আদালতের ব্যাপার! আপনি কি হলফ ক'রে বল্‌তে পারেন, বয়স সম্বন্ধে যা ব'লছেন তা সত্যি ?"

"সত্যি।"

"আপনি কি অভিযুক্ত লোকটিকে জানেন ?"

"আমি তাকে জানি। শুধু তাই নয়—সবাইকেই আমি জানি।"

"লোকটি বল্‌ছে, সে নাকি আপনার একজন ভক্ত এবং আপনার সঙ্গে সে বাস ক'রেছে।"

"আমি বিশ্বের সবাইর সঙ্গেই বাস করি। সকলেই যে আমার।"

"অভিযুক্ত লোকটি আরো বলছে, আপনি তাকে অলঙ্কারগুলো দিয়েছেন-একথা কি সত্যি ?"

"হাঁ, আমিই দিয়েছি, একথা ধরে নিতে বাধা নেই। তাছাড়া, কে-ই বা কাকে কি দেয় ?"

আচ্ছা, আপনিই যদি অলঙ্কারগুলো দিয়ে থাকেন, তবে ওগুলো আপনি পেলেন কি ক'রে ?"

"বলেছি তো, সব বস্তুই আমার।"

"সাইবাবা! মনে রাখবেন, এটা একটা গুরুতর মামলা। অভিযুক্ত লোকটি বলছে, আপনি নিজে নাকি তাকে ঐ চোরাই অলঙ্কারগুলো দিয়েছেন।"

বাবা এবার ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমাদের এসব কি হচ্ছে, বলতো। এসব বাজে ব্যাপারে আমাকে জড়ানো কেন ?"

কমিশনার প্রমাদ গণিলেন। বুঝিলেন, লৌকিক কোন ব্যাপারেই এই অলৌকিক মহাপুরুষকে দিয়া কোন সাহায্য হইবে না। এবার তাই গ্রামের প্রধানকে ডাকিয়া তাহার দিনপঞ্জী তলব করা হইল। দেখা গেল, অভিযুক্ত ব্যক্তি সেদিন শিরডি গ্রামে মোটেই বাস করে নাই। অতএব সাইবাবা তাহাকে কি করিয়া ঐ রাত্রে অলঙ্কারগুলি দিবেন? বিশেষতঃ তিনি নিজে গ্রাম ছাড়িয়া কখনো কোথাও যান না।

সাইবাবাকে এ তথ্যগুলি জানানো হইলে তিনি ইহার সত্যতা স্বীকার করিলেন। আদালতের হাঙ্গামা কোনমতে সেদিন এভাবে মিটিয়া গেল।

মহামুক্ত স্বতন্ত্র পুরুষকে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে টানিয়া আনা যে কত নিরর্থক, কত অবাঞ্ছিত সকলেই সেদিন তাহা উপলব্ধি করিল।

সমবেত দর্শনার্থীদের কাছে সাইবাবা প্রায়ই ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব ও

তাঁহার সৃষ্টিলীলার স্বরূপটি তুলিয়া ধরিতেন। তিনি বলিতেন, "তিনি সর্ব্ব সৃষ্টির মূলে, তিনি বিভু, আল্লাহ্ মালেক। এ সৃষ্টি তিনি ক'রেছেন পালন কার্য্য তাঁর কৃপায়ই চলেছে। ধ্বংস করবেন আবার তিনিই। তাঁর লীলা বড় দুর্জ্ঞেয়, তা বোঝবার শক্তি আছে কার? তিনি যেমন ক'রে আমাদের গড়েছেন তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, তাঁর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করা উচিত। ভাগ্যে যা আসে তা নিয়েই আনন্দে থাকো। কারণ, তাঁরই ইচ্ছায় যে সব কিছু ঘটছে। সর্ব্বদা স্মরণে রাখতে চেষ্টা ক'রো, তাঁর অনুমতি বা ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না।

"আমাদের দিক থেকে, সৎপথে পুণ্যপথে থেকে কর্ত্তব্য ক'রে যেতে হবে। কিন্তু স্মরণে সদাই রাখবে এই কথা যে, নিজস্ব সত্তা বা স্বাধীন সত্তা বলে আমাদের কিছুই নেই। সব কিছুর নিয়ামক ঈশ্বর, রঙ্গমঞ্চের পরিচালক ও নট, দুই-ই তিনি। এভাবে সব কিছু দৃশ্য ও ঘটনার মধ্যে তাঁর লীলা অনুভব ক'রতে হবে। ধীরে ধীরে আসবে নিস্পৃহতা, কর্ম্মের বন্ধন থেকে পাবে মুক্তি, হবে ভগবৎ দর্শন!"

শুধু ত্রিতাপক্লিষ্ট সাধারণ জনগণই নয়—উন্নত শ্রেণীর সাধক, সাধু ও ফকীরেরাও সাইবাবাকে দর্শন করিতে আসিতেন। শক্তিধর মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্চতর অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রত হইত। আবার প্রত্যাখ্যানের নৈরাশ্য নিয়াও কেহ কেহ ফিরিয়া যাইতেন।

সোমদেব স্বামী নামক এক সাধু সাইবাবার খ্যাতি শুনিয়া সেদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, যে মসজিদে তিনি অবস্থান করিতেছেন তাহার শীর্ষে একটি বৃহৎ পতাকা উড্ডীয়মান। ভক্তেরা বাবার জয়ধ্বনি দিয়া এটি মীনারের উপর উড়াইয়া দিয়াছে, তিনিও তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা দূর হইতেই এই পতাকা দেখিয়া ভক্তি–আপ্লুত হয়, নত হইয়া প্রণাম

নিবেদন করে। সোমদেব স্বামী ভাবিলেন, এ আবার কি ব্যাপার। গর্ব্বভরে এমন করিয়া পতাকা উড়ালো, এ তো সাধুজনোচিত নয় —সাধুদের বিনয় বা নম্রতারও পরিচয় নয়।

অতঃপর সাইবাবা কাছে যাওয়ার উৎসাহ আর তাঁহার রহিল না। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের চাপে পড়িয়া অগ্রসর হইতেই হইল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহাপুরুষের চোখ দুইটির দিকে তাকাইতেই সোমদেব স্বামী কেমন যেন ভাববিহ্বল হইয়া গেলেন। দেহ তাঁহার ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, কণ্ঠে স্বর নির্গত হইতেছে না। কপোল বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

সাইবাবার দেখা গেল এক বজ্রকঠোর মূর্ত্তি। স্বামীজী কাছে গিয়া দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইয়া তিরস্কার শুরু করিলেন। কহিলেন, "সাবধান! আর কখনো এ মসজেদের চৌকাঠ তুমি মাড়াবে না। কেন? পতাকা যে উড়ায়, অহঙ্কারে ধ্বজা যে বহন ক'রে চলে সে সাধুকে দর্শনের জন্য আবার আসা কেন? সত্যিই তো, আসল সাধুর লক্ষণ তো তাতে নেই! যাও এখনি বেরিয়ে।"

সোমদেব স্বামীকে সেদিন বিষণ্ণ অন্তরে বিদায় নিতে হয়।

মূলে শাস্ত্রী নাসিকের এক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ। জাত্যভিমান তাঁহার বড় প্রবল। সাইবাবার এত নাম, এত প্রতিষ্ঠা, কিন্তু শাস্ত্রীজী তাঁহাকে দেখিতে আসেন নাই। তাই সেবার শিরডিতে আসিয়াছেন।

সেদিন ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়াই সাইবাবা তাঁহার সেবকদের বলিতে লাগিলেন, "ওরে, তোরা শীগ্‌গীর আমার কৌপীন আর বহির্ব্বাসে গেরুয়া রঙের ছোপ লাগিয়ে দে।"

সকলে তো মহা বিস্মিত। কই, বাবা তো কোনোকালেই গেরুয়া বসন পরিধান করেন নাই? তবে আজ আবার এ কি খেয়াল?

নির্দ্দেশমত পরিধেয় বস্ত্র গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করা হইল।

উহা পরিধানের পর বলিয়া বসিলেন, "ওরে যা, নাসিক থেকে যে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি এসেছে, তাঁর কাছ থেকে আমার দক্ষিণা আদায় ক'রে আন্।"

মূলে শাস্ত্রীজী সাইবাবার আহ্বান শুনিয়া তখনই সেখানে উপস্থিত হইলেন।

সতর্ক পদক্ষেপে তিনি ঢুকিতেছেন, মসজিদের কোন কিছুর ছোঁয়া লাগিয়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের জাত না যায়। হিসাব করিয়া কয়েক গজ ব্যবধানেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল। "জয় গুরু! জয় ধোলাপ মহারাজ্জী!"—বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া তিনি মহাপুরুষের চরণতলে পড়িয়া গেলেন।

সাইবাবা সহাস্যে ভূতলে পতিত পণ্ডিতকে কেবলি বলিতেছেন, "দাও, এবার আমার দক্ষিণা দাও।"

পরে মূলে শাস্ত্রীজীর নিকটে জানা গেল, গৈরিক বেশধারী সাই-বাবাকে আজ তিনি তাঁহার গুরুজী ধোলাপ মহারাজরূপেই দর্শন করিতেছিলেন। তাছাড়া, উভয় মহাত্মার মধ্যে সত্যকার কোন পার্থক্য যে নাই, এ সত্যও আজ তিনি এখানে উপলব্ধি করিয়াছেন।

শাস্ত্রীজী মহা আগ্রহের সহিত বাবার চরণতলে প্রণামী রাখিয়া বারবার সেখানে মাথা ঠেকাইতে লাগিলেন।

বামন মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীনারায়ণ আশ্রমের জীবনে বাবার কৃপারশ্মি নিপতিত হয়, ধীরে ধীরে উচ্চতর অনুভূতি ও উপলব্ধির দিকে তাঁহাকে টানিয়া নেয়। শ্রীনারায়ণ স্বামী বলিতেন, সাইবাবার অধ্যাত্মশক্তির প্রভাব প্রায়ই ক্রিয়া করিত গোপনে, নিঃশব্দে! ভক্ত ও আশ্রয়প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব ও সাধনসত্তাকে ইহা ধীরে অথচ অনিবার্য্য-রূপে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।

বাবার হস্তের স্পর্শটি ছিল কল্যাণময়। নিকটে আগত ভক্তের শিরে তিনি হাতটি ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেন, আর এই দিব্য

স্পর্শের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইত এক ভাব শিহরণ ও অধ্যাত্মস্রোত। কত অধিকারী সাধকের সম্মুখে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এক নূতন দুয়ার উন্মুক্ত হইত।

শুধু তাঁহার এ স্পর্শ দ্বারাই নয়, কখনো কখনো দৃষ্টিসম্পাত ও কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়াও এই শক্তিধর মহাপুরুষ মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে এক মহত্তর চেতনার ধারা বহাইয়া দিতে পারিতেন। চৈতন্যময় জীবনের উদ্বোধন করার জন্য জাগতিক ঘনিষ্ঠতা বা সান্নিধ্য সাইবাবার কাছে বড় কথা ছিল না। অনেক সময় ইহার প্রয়োজনও হইত না।

উপাসনী মহারাজ পশ্চিম ভারতের এক স্বনামখ্যাত সাধক। একবার হঠযোগের একটি বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে গিয়া তিনি ভুল পথে চলিয়া যান, ফলে শ্বাসযন্ত্রটি তাঁহার অবশ হইয়া পড়িতে থাকে। রোগমুক্তির জন্য বহু চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোন সুফলই ফলিল না।

জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এমন সময় শিরডির সাই–বাবার কথা তাঁহার মনে পড়িল। শেষ আশ্রয় জ্ঞানে শ্রদ্ধাভরে মনে মনে তিনি এ মহাত্মার স্মরণ নিলেন।

শিরডি হইতে ত্রিশ মাইল দূরে রাহুর গ্রামে উপাসনী মহারাজ রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, এমন সময় বাবা অলৌকিক মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। সামান্য দু'একটি কথায় রোগমুক্তির উপায়টি বলিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া যান।

আরোগ্য লাভের পর উপাসনী মহারাজ ভক্তিভরে সাইবাবাকে দর্শন করিতে আসেন। এই তাঁহার প্রথম চাক্ষুষ দর্শন। বাবাও তাঁহাকে কিছুদিন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখেন, উচ্চতর সাধনার কতকগুলি গূঢ় প্রণালী শিক্ষা দেন।

উপাসনী মহারাজের সাধন জীবন ইহার ফলে নূতনতর খাতে প্রবাহিত হয়। সাধক সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অন্তরঙ্গ জীবনে সাধকদের রূপান্তর সাধনে যেমন সাইবাবা অগ্রসর হইতেন, তেমনি বহিরঙ্গ ক্ষেত্রেও বহু দর্শনার্থীর জীবনে কল্যাণ ধারা তিনি ছড়াইয়া দিতেন। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকল ভক্তেরই তিনি ছিলেন পিতা ও অভিভাবক। সমভাবেই সকলের মধ্যে তিনি প্রচার করিতেন অমৃতময় জীবনের বার্ত্তা। ভেদবৈষম্যের উর্দ্ধে এক মহত্তর জীবন আস্বাদনের জন্য ভক্তেরা উদ্বুদ্ধ হইত।

জনগণের দৃষ্টিতে মহাপুরুষ সাইবাবা ছিলেন প্রেম, শান্তি ও ঐক্যবোধের উৎসস্বরূপ। তাই দেখা যাইত, চারিদিকের সাম্প্রদায়িক কলহ ও অবিশ্বাসের বিষবাষ্পের মধ্যেও তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান ভক্তরা শান্তিতে শিরডিতে দিন কাটাইতেছে।

সাইবাবার অলৌকিক আচরণ ছিল বড় অদ্ভুত। শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে এ আচরণের মিল খাওয়ানো সব সময় সম্ভব হইত না। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারিক কর্ম্ম ও উপদেশের ফলে সদাই উৎসারিত হইত জনকল্যাণ।

সাইবাবার বাসস্থান একটি মসজিদে, ইহা স্থানীয় মুসলমানদের। কিন্তু তিনি এটিকে অভিহিত করেন দ্বারকামাঈ নামে। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে রহিয়াছে কাবা মসজিদের এক প্রতীক, আর তাহার কাছেই দেখা যায় বিশেষ একটি আধারে রক্ষিত অগ্নি—অনবরত তাহা প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

কক্ষের এক কোণের বেদীতে রাখা আছে পবিত্র তুলসীর ঝাড়। ভক্তিভরে উহা প্রদক্ষিণ না করিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীদের উপায় নাই। বাবার সম্মুখে পর্য্যায়ক্রমে সদাই পাঠ করা হয় হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ ও মুসলমানদের কোরাণ হাদিস্।

এই মসজিদটি বড় পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই এক হিন্দু ভক্তের অভিলাষ জাগে, তিনি এটির পুনর্গঠন করাইবেন। বহুসংখ্যক মূল্যবান পাথর এজন্য তিনি সংগ্রহ করিয়াও আনেন।

বাবা কিন্তু এগুলি তখনই অন্য কাজে লাগাইয়া দেন। শিরডির

একটি হিন্দু মন্দির সে সময় ভগ্ন দশায় রহিয়াছে, উহারই সংস্কার কার্য্যে এ পাথরগুলি তিনি দান করেন।

সাইবাবার সর্ব্ব শ্রেণীর শিষ্যরা ইহার পর উদ্যোগী হইয়া উঠেন। কয়েক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ঐ মসজিদটি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলেন। বাবার বহিরঙ্গ আচার আচরণ এমনিভাবে সমাজের সর্ব্বস্তরের কল্যাণবোধ জাগাইয়া তুলিতে থাকে।

জিজ্ঞাসুরূপে যে কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়েরই লোক আসুক না কেন, বাবা তাহাকে উদার ও মৌলিক ধর্ম্মাদর্শের উপদেশই দিতেন। উচ্চ বা নীচ, সংসারী বা সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন পার্থক্যই কখনো তাঁহাকে করিতে দেখা যায় নাই।

সাধারণ মানুষ যাহাতে গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া ধীরে ধীরে মায়ার বন্ধন কাটাইতে শিখে তাহাই তিনি চাহিতেন।

তিনি বলিতেন, "অধ্যাত্মজীবনের মূল কথাই হচ্ছে অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করার সাধনা। জীব মূলতঃ জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞানের পর্দ্দা রেখেছে তার জ্ঞানসত্তাকে আড়াল ক'রে—জলে যেমন জমে শেওলার আস্তরণ। ঐ শেওলা অপসারণ ক'রে দাও, অমনি স্বচ্ছ জলের দেখা পাওয়া যাবে। জলরাশি তো আগে থেকেই রয়ে গিয়েছে, তা আর তোমাকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করতে হবে না। সূর্য্য আর চাঁদও এমনি আকাশের গায়ে রয়েছে চির বিরাজমান। রাহুর কবলিত হওয়ায় সাময়িকভাবে আমরা এদের দেখতে পাইনে—গ্রহণ চলে গেলেই আবার জ্যোতির্ম্ময় রূপ চোখে পড়ে। জীবের চিরন্তন সত্তাও এমনিভাবে ঢাকা পড়ে থাকে মাত্র।

"আরো একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যে চোখ দিয়ে মানুষ সব দেখছে, একদিন তা ঢেকে যায় ছানির পর্দ্দায়। দৃষ্টি হয় আবরিত। কিন্তু ঐ ছানি একবার অপসারণ কর, অমনি চোখের সামনে ধরা দেবে এই বিপুল দৃশ্যমান জগৎ। সংসারে বাস ক'রতে থেকেই ভেতর

থেকে অজ্ঞানকে দূরীভূত কর—তোমার আত্মস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে!”

ভক্তপ্রবর এন, সি চন্দোরকর সেদিন বড় ম্রিয়মাণ হইয়া বাবার কাছে আসিয়া উপস্থিত। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “বাবা, এ সংসারে আর এক মুহূর্ত্তের জন্য থাকতে কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই। সংসার তো নয় এ হচ্ছে নিঃসার—কোন সারবত্তাই আজ অবধি এতে খুঁজে পেলাম না। তাই এর সংস্পর্শ এড়িয়ে দূরে চ’লে যাবো, ঠিক ক’রেছি।”

চন্দোরকরকে উপলক্ষ করিয়া সাইবাবা তাঁহার ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, “শোন বেটা, যতক্ষণ অবধি জীবের দেহ থাকে, সংসারও থাকে—স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে কিছুটা থেকেই যায়। কেউ তা থেকে নিষ্কৃতি পায়না। সংসার জালের ছোঁয়া এড়িয়ে চলা যে অনেক সময় আমার পক্ষেও সম্ভব নয়।

“সংসারের নানা দিকে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে! কাম,ক্রোধ প্রভৃতি বিকারের মিশ্রণ নিয়ে আমাদের এই সংসার! আবার সব কিছু স্থূল ও সূক্ষ্ম, দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া এরই অন্তর্ভুক্ত। বনে চলে গেলেই বা সংসারকে তুমি এড়াবে কি ক’রে?

“দ্যাখো, একটা কথা সব সময় মনে রেখো। তোমার আজকের এ অবস্থা তোমার নিজেরই পূর্ব্বকৃত বহুতর কর্ম্মের সঞ্চিত ফল ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু শুধু তবে মনের ভেতর উষ্মা অথবা বিরক্তি রেখে লাভ কি? এই-দেহ তোমার প্রারব্ধ, অর্থাৎ, অন্যান্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। জীব তার এই দেহ পরিগ্রহ করে তার আগেকার কর্ম্মকেই পরিণতি দেবার জন্য। প্রারব্ধের ফল, তার দুঃখ ও পাপ-পুণ্যময় জীবন, ভোগ না ক’রে তো তোমার মুক্তি কখনো আসবেনা! লক্ষ্য ক’রে দ্যাখো, বহিরঙ্গ দিক দিয়ে প্রত্যেকটি বস্তু অপরটি থেকে পৃথক কেন? পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মফলই সৃষ্টি করেছে প্রত্যেকের এই

পৃথক রূপ। দেখতে পাচ্ছোনা, ধনীর প্রাসাদে তার সখের কুকুরটা নিশ্চিন্ত আরামে সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে থাকে, আর দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষকে পথের কুকুরের মত এক টুকরো রুটির জন্য ছুটাছুটি ক'রে মরতে হয়? বেটা, এ সবই হচ্ছে প্রারব্ধ। সংসারকে জোর ক'রে ফেলে গেলেই তো এ প্রারব্ধের ফল অকেজো হয়ে যাবে না!"

বাবার কথা নূতন কিছু নয়, আর অলৌকিকত্বও তাহাতে কিছু নাই। কিন্তু এ কথাগুলিতে যেন রহিয়াছে মন্ত্রচৈতন্য। মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণী প্রবিষ্ট হয় ভক্ত শ্রোতাদের অন্তরের অন্তস্তলে—হইয়া উঠে জীবন্ত! নূতনতর আলোকের সন্ধান এ বাণীর মধ্য দিয়া তাহারা খুঁজিয়া পায়।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাস। প্রায় চৌদ্দদিন যাবৎ সাইবাবা রোগ-শয্যায় শায়িত। তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিকটে বসিয়া সুর করিয়া রামবিজয়-চম্পূ পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। বাবা বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন, "এ পাঠে মহাকল্যাণ হবে, মৃত্যুঞ্জয় শিব এতে প্রসন্ন হবেন।"

মুখে এই কথা বলিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু দেখা যাইতেছে তাঁহার ভিন্ন আচরণ। শিরডির নিকটেই অবস্থান করেন এক শক্তিমান ফকির সাহেব। সাইবাবার তিনি ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। এ সময়ে হঠাৎ একদিন ঐ ফকীরের কাছে তাঁহার শেষ বার্ত্তা তিনি পাঠাইয়া দেন। সেবকের মাধ্যমে জানান, "এ দেহের আধারে যে আলো আল্লাহ্ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবার তা নেবেন ফিরিয়ে।"

ফকীর সাহেবের গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুরাশি।

এ সংবাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে নামিয়া আসে এক বিষাদের ছায়া!

১৮ই অক্টোবর। সেদিন শারদীয়া দশমীর পুণ্যদিন। অপরাহ্ণে বাবা হঠাৎ ভাইয়াজী নামক এক ভক্তকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে,

এবার আমার ডাক এসেছে। আমি বিদায় নিচ্ছি, তোরা শুনে রাখ্। ভক্ত বুটি উৎসাহভরে যে মন্দির তৈরী ক'রেছে, তাতে যেন আমার এই দেহ সমাধি দেওয়া হয়।"

বেলা প্রায় তিনটার সময় পুণ্যচরিত সাইবাবা তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। পশ্চিম ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সেদিন স্খলিত হইয়া যায়।

এ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড সম্বন্ধে অভিমত

উদ্বোধন—লেখক একজন কুশলী চরিতশিল্পী। আতিশয্যের ঘূর্ণাবর্তে তিনি পড়েন নাই, সুস্থির বস্তুনিষ্ঠায়—আপস্য ফল্গু, যাহা কিছু সার, যাহা কিছু গ্রাহ্য, তাহাই প্রশংসনীয় বিন্যাস-কৌশলে আমাদের উপহার দিয়াছেন। ...সত্যই এই গ্রন্থ অবদান—লেখকের শ্রদ্ধাবদান।

শনিবারের চিঠি—এ গ্রন্থ পাঠকমাত্রেরই আধ্যাত্মিক জীবনকে পুষ্ট করিবে সন্দেহ নাই।

মাসিক বসুমতী—সাধক-জীবনের অন্তর্গূঢ় তথ্যাদির নির্ণয়ে লেখক যে মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিচার ও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে মিলেছে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও—'ভারতের সাধক' এককথায় মহাপুরুষদের দূর উচ্চগ্রাম থেকে একেবারে সাধারণের মাঝখানে এনে দিয়েছে। ...পাঠক সাধারণ এ বই পড়ে মুগ্ধ হবেন।